মুক্তি সংগ্রাম

মাখন গুপ্ত

ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স
৩০/১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
ভট্টাচার্য ব্রাদাস
৩০/১, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

পুনর্মুদ্রণ :
আষাঢ় ১৩৬৭

প্রচ্ছদ শিল্পী :
বিন্দুভূষণ পাল
অলঙ্করণ ও প্রুফ
শ্রীব্যোমকেশ বসু

বাঁধাই :
বলরাম ভদ্র
বাইণ্ডিং কর্ণার
৪২, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ :
শ্রীমতী শ্যামলী ঘোষ
সুকল্যাণী প্রেস
১৫ বি, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

অগ্নিযুগের বিপ্লবী ও পরবর্তী যুগের দেশহিতৈষী
নিষ্কাম সর্বোদয় কর্মী
৺গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে।

মাখন গুপ্ত

॥ লেখকের অন্যান্য বই ॥

- বেদনবীণা
- হে বীর পূর্ণ করো
- সারথি
- মহাজীবন
- শ্রীরামকৃষ্ণায়ন
- মেঘনানদীর চর (যন্ত্রস্থ)

গ্রন্থকারের নিবেদন

১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হতে 'মুক্তি সংগ্রাম' বই খানির কাহিনী "অগ্নিযুগের ইতি-গাথা" নামে বিপ্লবী-বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। এ সময় বিপ্লবী বাংলার প্রধান সম্পাদক শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে, বিপ্লবীদের লেখা নানা প্রবন্ধ থেকে বহু তথ্য সংগ্রহ করার সুযোগ পাই। এই কাজে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য তৎকালীন সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম ৺মদন ধর মহাশয়ের কথা চিরদিন আমার স্মরণ থাকবে। এছাড়াও প্রামাণ্য বহু তথ্য সম্বলিত বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা সংগ্রহ করে দিয়েছেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স এবং সুভাষবাদী জনতার সমাজসেবী কর্মী শ্রীসমীরণ ঘোষ।

অগ্নিযুগের প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীপঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয় বয়সের ভার উপেক্ষা করে অতি যত্ন সহকারে বইখানির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। বইএর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ভুল-ত্রুটি না থাকে এ বিষয়ে আমার চেয়েও তাঁর ছিল অধিক সতর্ক দৃষ্টি।

বইখানি ছাপা হওয়ার সাথে সাথে পশ্চিমবঙ্গের বিদগ্ধ সমালোচক সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় সেটি অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করেন। পাঠক সমাজের অবগতির জন্য বই সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমতও প্রকাশিত হলো। এই পুস্তক প্রণয়নের জন্য সংগৃহীত পুস্তক-পুস্তিকার প্রণেতাগণসহ উপরোক্ত শ্রদ্ধেয় দেশহিতৈষী বন্ধুদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

সাবধানতা-সত্ত্বেও বইখানির কয়েকটি স্থানে কিছু ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ায় আমি দুঃখিত ও পাঠক সমাজের নিকট এজন্য ক্ষমা প্রার্থী।

মাখন গুপ্ত

প্রাক্ আভাসন

'মুক্তি সংগ্রাম' দুটি ছোট্ট শব্দ। অর্থে কিন্তু ইহা ব্যাপক। কেবল 'মহাভারত' বলিয়া মুক্তি নাই। কারণ, ইহা ইতিহাস। দেশের, জাতির, ধর্মের ও সভ্যতার ইতিবৃত্ত ধারণ করিয়া আছে ইতিহাস। ইতিহাসের দুইটি অধ্যায়—আবরণ ও মোক্ষ—যেন অবক্ষয়ে অমাবস্যা আর মোক্ষে পূর্ণমাসী। আমাদের আলোচ্য 'মুক্তি সংগ্রাম' কিন্তু সামগ্রিক ইতিহাস নয়। ইহার পরিধি ইংরেজ বণিকের নিঃশেষে শোষণ আর নিষ্ঠুর শাসনের কবল হইতে মুক্তির অংশটুকু মাত্র। তাছাড়া, ইহাকে ইতিহাসই বা বলিব কেন? ইতিহাস বলিতে আজ যাহা বুঝি তাহাতে কেবল ঘটনার যথার্থ বর্ণনা। রাগদ্বেষ, আনন্দ উৎসাহ, আশানিরাশা শূন্য এক নির্বিকার কথন ইতিহাস। না।—'মুক্তি সংগ্রাম' তেমন ইতিহাস নয়। তবে ইহা কি? উত্তর একটু উপমায় বলি—মানব সভ্যতার আদি সংগ্রাম দেবাসুর যুদ্ধ। তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস চণ্ডী। এই চণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া মেধস মুনির আশ্রমে রাজা সুরথ এবং বণিক সমাধির দুর্গাপূজা। ইহা লৌকিক ও অলৌকিকতায় মিশ্রিত ঘটনা। ইহার প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা নাই। থাকার কথাও নয়। দেশকাল পাত্রের প্রবাহে কবে হারাইয়া গিয়াছে। আছে ইতিবৃত্ত অংশটুকু। আর তাহাই অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর সমাজ জীবনে ভাবভক্তির প্লাবন বহিয়া যায়। বর্ষে বর্ষে বিরামহীন এই আনন্দ উৎসবের দিকে চাহিয়া কোন দরবিগলিত-অশ্রু ভাবুক ঐ মহিমার প্রতি যে প্রণতি জানায় মুক্তি সংগ্রাম তেমনই একটি আভূমি লুণ্ঠিত প্রণিপাত। উদ্দিষ্ট দেবী চণ্ডিকা বা দুর্গাই দেশমাতৃকা। 'বন্দে মাতরম্'। ইহাই 'মুক্তি সংগ্রাম'। 'মুক্তি সংগ্রাম' কাহিনী নয়। কাহিনীর সর্বাঙ্গ জুড়িয়া শক্তির আবির্ভাবের অর্চ্চনা। কাহিনী নাই তাও নয়। গদ্যে কাহিনীর অবতারণা, পদ্যে সেই কাহিনীর অন্তরাল সঞ্চারিণী শক্তির প্রশস্তি বন্দনা। কাব্য বাক্যাঞ্জলী 'মুক্তি সংগ্রামের' প্রাণ-স্পন্দন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে ইতিহাস ত ইতিহাসই। তাহাকে ইতিহাস হইয়া একক জাগ্রত থাকিতে দিলে ক্ষতি কি? কোমল পেলব বাক্য-লতা পল্লবে তাহাকে আবছা করিয়া তুলিতে হইবে কেন? কবিতার কলকাকলী

কূজনের স্থান ত বিস্তৃত বিশ্বে ছড়ানই রহিয়াছে। প্রশ্নটা সহজ কিন্তু উত্তরটা তত সরল নয়। চাষের জমির আইল পাট্টার অধিকারে সীমাবদ্ধ। তবুও অধিকারের হানাহানি আছে। নিছক বাস্তব ক্ষেত্রেই যদি অধিকার জটিলতায় অনিশ্চিত তবে ভাবের ভূমিতে ভাগাভাগীর আইল একেবারেই অচল। তাছাড়া, প্রতিভা এমনই এক আবেগ যাকে রোখা যায় না। সে যখন আসে তখন আসেই। প্রতিভা যদি বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া আসে তবে সে তর্কযুক্তি, বিচার বিশ্লেষণ, নিরাকরণ নিরূপণ লইয়া ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। আবার সেই প্রতিভা যদি হৃদয় আশ্রয় করিয়া প্রবাহিত হয় তবে সে শোকে দুঃখে, আনন্দে আহলাদে, মিলনে বিরহে প্লাবন বহাইয়া দেয়। সেই প্লাবনে কে ডুবিল আর কে ভাসিল তাহার কি হিসাব থাকে! 'মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থের গ্রন্থকারের জীবনযমুনায় তেমনই প্রতিভার জোয়ার জাগিয়াছে। তিনি হৃদয় মেলিয়া ধরিয়াছেন। তাহার বাক্যকুসুমাঞ্জলী উৎসৃজিত হইতেছে —আমরা পাইতেছি তাহার দান শ্রেষ্ঠ ও বরিষ্ঠ জাতীয় পুরুষদের জীবন অবলম্বন করিয়া গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, কবিতা ও গান।

রাজনৈতিক আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার নপুংসকী সমাধানে দেশবিভাগের নিষ্ঠুর ও নির্বোধ মীমাংসায় মানবিকতার যে বিপর্যয় ঘটিয়া গেল তাহার বেদনা আজও মূক হইয়া আছে, বধির হইয়া রহিয়াছে। সেই বেদনার কিছু আভাস ফুটিয়াছে এই গ্রন্থকারের রচনায়। কথা দিয়াছে কাহিনী, ভাব দিয়াছে অশ্রু। সুতরাং প্রতিভা অপ্রতিরোধ্য। সীমারেখা দিয়া তাহাকে ঠেকান যায় না। এ ক্ষেত্রেও তাহা আরোপ করা অপপ্রয়াস।

গ্রন্থ এবং গ্রন্থকার অচিন্ত্য ভেদাভেদের মতই যুক্ত এবং ভিন্ন। গ্রন্থ সম্বন্ধে যদি প্রতিপাদন করা হইয়া থাকে তবে গ্রন্থকার সম্বন্ধেও ত সূত্র পাতন চাই। শ্রীযুক্ত মাখন গুপ্ত প্রতিভারঞ্জিত স্বভাব কবি। পূর্ববঙ্গের বরিশাল জিলার প্রসিদ্ধ গৈলা গ্রামে তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসন। সুখ ও সমৃদ্ধির কোলেই তিনি ছিলেন সেখানে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধ শেষে আপোষ রফার যূপকাষ্ঠে পূর্ববঙ্গ বলি হইয়া গেলে মাখন বাবু নিজ বাসভূমি, জমি, জিরাৎ এক মুসলমান রাইয়তের হাতে গচ্ছিত রাখিয়া বিগলিত হৃদয়ে আশ্রয় প্রার্থী হইয়া আসিলেন সদ্যমুক্ত পশ্চিমবঙ্গের কণ্টকাশ্রয়ে। তাহার অভ্যন্তরের ক্রন্দন ভাষা হইয়া বাহির হইল কাব্য গাথায়। কবিতা ও গান মানুষ পড়িল ও শুনিল কিন্তু মাখন গুপ্ত গুপ্তই

রহিয়া গেলেন। এই আড়ালে পড়িয়া থাকা একেবারেই অকারণ নয়। কারণগুলি প্রাঞ্জল—এযুগে জন্মিয়াও মাখন বাবু অতীত কালের শালীনতার সংস্কারে প্রচার বিমুখ। তিনি সত্যসত্যই নাম যশের কাঙ্গাল নহেন। অর্থই যে আজ পরমার্থ সেই অর্থও তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে অক্ষম। আধুনিক সভ্যতার উৎকট রঙ্গমঞ্চ কলিকাতায় আজও তিনি সেই নিরালা গ্রামের স্নিগ্ধছায়ার সরল মানুষ। বাক্যে ব্যবহারে, সরলতায় নিজেকে ঢালিয়া দিয়া তাহার তৃপ্তি। প্রতিদান? হয়ত লজ্জিত মনে চান একটু স্বীকৃতি, তাহা না পাইলেও নালিশ নাই। গ্রামের এই নিরীহ মানুষ কলিকাতায় কল্কে পাইবেন কেন? 'আমি মরলে চিতায় দিবি মঠ' বলিয়া মাখন বাবু কখনও অভিমান করিবেন না। গ্রন্থকার মাখন গুপ্ত, কবি মাখন গুপ্ত, মানুষ মাখন গুপ্তের এই চেহারাই আমি চিনি।

এবার গ্রন্থ প্রশস্তি। আরম্ভ এই রকম - "১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন। সূর্যাস্তের সাথে সাথে পলাশীর যুদ্ধের অবসান। নিরুপায় নবাব পলায়নের পথে ধৃত হয়ে বন্দীদশায় ২রা জুলাই (১৭৫৭) মীরজাফরের পুত্র মীরণ কর্তৃক অতি নির্মমভাবে নিহত।" অর্থাৎ মুক্তি সংগ্রামের অবতারণা করিতে গিয়া বন্ধনের শৃঙ্খল আঙ্গুল দিয়া দেখান হইতেছে। এই বাংলা দেশের মাটিতে একটা দেশ, একটা জাতি ও একটা সংস্কৃতির ভাগ্য লইয়া মুসলমান নবাব ও ইংরেজ বণিক যে কদর্য ষড়যন্ত্র, নীচ উৎকোচ, ও ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার অন্ধকার সৃষ্টি করিল সেই আড়ালের মধ্যেই মুসলিম মসনদ তলাইয়া গেল। নতুন পত্তন হইল ইংরেজ বণিকের শোষণ আর শাসনের। এটা একেবারেই উপর তলার পরগাছা। যেখানে জাতি, সেই কৃষক সম্বন্ধে বলিতেছেন—হায়রে দেশের চাষী/মিটায়েছ খেটে সকলের ক্ষুধা/সমভাবে ভালবাসি। সকলের তরে বুকভরা স্নেহ লয়ে/বিনিময়ে তার চিরঅবহেলা সয়ে/বিতরিছ হেসে শ্রমের অন্ন/নিজে থেকে উপবাসী। /বাংলা মায়ের নিরলস শিশু/সরল উদার প্রাণ/সহ অবমান তবু কর দান/হাসি নহে কভু ম্লান/যত যায় দিন/দীন হতে দীন/চলিছ অকূলে ভাসি।

দর্পিত এবং বর্বর এই ইংরেজদের অত্যাচার অসহায় সরল সেই চাষীদের বুকে আগুন জ্বালাইয়া দিল।—জাগে বিদ্রোহ চাষীদের মাঝে বিদ্রোহী অগণন/ঘোর বিপ্লবে দেখা দিল তিতুমীরের আন্দোলন। /বাঁশের কেল্লা রচি তার মাঝে বর্শা ও ঢাল হাতে/কামানের মুখে বীর তিতুমীর জান দিল বুক

তে। / শাসকের পরিবর্ত্তন ও শাসিতের সম্পর্কের পরিবর্ত্তন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে এক নতুন অধ্যায় খুলিয়া দিল। দেশ জনতার, জাতি জনতার। যুদ্ধ হইল জনযুদ্ধ, হইল জাতীয় যুদ্ধ। এখান হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লবী আন্দোলন, কংগ্রেস আন্দোলন, নেতাজীর সামরিক আক্রমণ বর্ণনা করিয়া স্বাধীনতার নতুন সূর্য বন্দনা করিতে পূর্ব বঙ্গের হিন্দু অধিবাসীর ছিন্নমস্তা হইয়া আপন রক্তপান পর্যন্ত দীর্ঘ দুই শত বৎসরের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে এই গ্রন্থে। বলিয়াছি ইহার গদ্য-অংশ ইতিহাস আর পদ্য-অংশ প্রশস্তি। গ্রন্থের পূর্ণ আলোচনা করিব না, আবশ্যকও নাই। কেবল বলিতে চেষ্টা করিব কাব্যাংশের কিছু কিছু কথা।

স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ যা সিপাহী বিদ্রোহ নামে অখ্যাত তার অবসান অন্তে কবি বলিতেছেন

অনশনে রহি, তিলে তিলে দহি বলি হয় অগণন
উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোলে কেঁপে ওঠে ত্রিভুবন।
ঘোর অবিচার, নিপীড়ন সয়ে সিপাহীরা দলে দলে
বাঙ্গালী, বিহারী, পাঠান, মোগল একসাথে ওঠে জ্বলে।

* * * *

ঝান্সীর রাণী করালিনী বেশে খর অসি করবালে
সমরাঙ্গনে রণতুরঙ্গে দোলে তরঙ্গ তালে।

* * * *

ঝান্সীর রাণী রণ তাণ্ডবে লুটাল ধরণী তলে
মারাঠার ভাল রক্ত তিলক লুকাল অস্তাচলে।
নানা সাহেবের ফকিরের বেশে দেশত্যাগ, তার পরে
ইতিহাস তার খবর রাখে না কবে কোথা গেল মরে।

অপূর্ব্ব বর্ণনা। বঞ্চিত জাতির নতুন সমাবেশ, সমরায়োজন, যুদ্ধ, জয়পরাজয় বুকের রক্তে আশানিরাশা, আনন্দভয়, উত্তেজনা অবসাদ একই সাথে তরঙ্গায়িত করিয়া তোলে। যা সুদূর অতীত তাহাই কাব্য-ব্যঞ্জনায় বর্তমান হইয়া ওঠে, বাস্তব হইয়া ওঠে। ইতিহাস এখানে কথা বলে, রূপময় হয়।

বাংলায় ইংরেজ বণিকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ জয় ও রাজ্যস্থাপন আর বাংলার ব্যারাকপুরেই ইংরেজ রাজ্য পতনের প্রথম গুলি নিক্ষেপ। সংঘর্ষের ঘাত-

প্রতিঘাতে জাতি আত্মশক্তি, আত্মসম্মান অর্জন করিতে সুরু করিল। নীচের তলার প্রভাব পড়িল উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মহলে। ১৮৫৭ সন হইতে জাতির প্রস্তুতি পর্ব। ১৯০৮ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ঘোষণা। সহীদ ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয় ১১ই জুলাই ১৯০৮ সনে। কবি কহিলেন—

মরদেহ যে মাটিতে হল ভস্মীভূত
পুণ্যভূমি ভারতের মহাতীর্থধাম।
স্মরি তারে অসংখ্য পথিক
ভক্তি ভরে জানায় প্রণাম—ক্ষুদিরাম!
বৈরাগীর একতারায়, বাউলের গানে
গাঁথা হয়ে আছে পুণ্য নাম—
ক্ষুদিরাম, ক্ষুদিরাম, ক্ষুদিরাম।

বঙ্গভঙ্গের প্রকাশ্য আন্দোলন দলিত হইয়া অন্তরালের আগুন জ্বালাইয়া তুলিল। শ্রীঅরবিন্দের বৈপ্লবিক সংঘর্ষ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে রাসবিহারী বসুর গদর পার্টির সহায়তায় সর্বভারতীয় সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভারত-জার্ম্মেনী চুক্তির ভিত্তিতে গণ-অভ্যুত্থানের বর্ণনা গ্রন্থের এক আবেগময় অবদান।

অগ্নিযুগের অন্তর ভেদি বাহিরি অগ্নিশিখা
তরুণের প্রাণে আগুন জ্বালাল
পাহাড় টলাল, সাগর দোলাল
মরণ ভোলায়ে ফাঁসীর মঞ্চে পরাল জয়ের টীকা।

১৯১৫ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর, সময় অপরাহ্ন। বালেশ্বর শহরের অদূরে চষাখণ্ডের মুখোমুখী যুদ্ধের শেষ দৃশ্য। কবি বলিতেছেন—

গম্ভীর অম্বরতলে হোমানল জ্বালি—
যেন শিব ধ্যানমগ্ন মহা মৃত্যুঞ্জয়—
কোলে তার চিত্তপ্রিয় কালঘুম ঘোরে
মহাশান্তি লভিয়াছে অনন্ত শয্যায়

মহাবলী যতীন্দ্রনাথের এ চিত্রাঙ্কন কবির গভীর অনুভূতির সাক্ষ্য বহন করে।

যতীন্দ্রনাথ কেবল বীর নহেন, তিনি আরও অধিক ছিলেন তাহা কি ইতিহাসের চোখে পড়ে।

ইতিহাসের ঘটনা—লাহোর জেলে বন্দীগণ অনশন করিয়াছেন অত্যাচার ও অমর্য্যাদার প্রতিকারকল্পে। মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন দাস তেষট্টি দিন তিলে তিলে মৃত্যুকে পরাভূত করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন ঐ লাহোর জেলেই। তাঁহার পরিত্যক্ত দেহ কলিকাতায় আনয়ন করিয়া বিশাল জনস্রোতের শোভাযাত্রায় অভিনন্দিত করা হয়। কবি বলিতেছেন—

অস্থি তোমার বজ্রের তেজে উজলিল দশদিশি
চমকি উঠিল আকাশে বাতাসে বিজলি অট্টহাসি

তাহাইত। বিজলী চমকে আকাশ যেমন আচম্‌কা আলোকিত হয় যতীনদাসের মৃত্যুও তেমনি জাতিকে সহসা উত্তাল করিয়া তুলিল। দুইটি বাক্যের স্তবকে কবি যে উদ্ভাবনের আভাস দিলেন তাহা যে হৃদয়ের আস্বাদন।

না। বিস্তৃতির পথে আর না। সমাপ্তির শেষ কথাই বলিতেছি। গ্রন্থখানি আমার ভাল লাগিয়াছে, বন্ধুদের ভাল লাগিয়াছে আর ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই প্রকাশক উৎসাহের সঙ্গে গ্রন্থখানি পাঠক মহলে মেলিয়া ধরিতেছেন। কেন? কারণ ইহা ইতিহাসের কঙ্কাল নয়। কারণ ইহা কল্পনার অলীক কাহিনী নয়, কারণ ইহা জাতির জীবনসত্ত্বার সগৌরব চলন্ত চেহারার অভিনন্দন বাণী। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সহৃদয় পাঠকবৃন্দের সমাদর লাভ করুক ইহাই প্রত্যাশা॥

অভিমত

সুকবি শ্রীমাখন গুপ্ত-প্রণীত 'মুক্তি সংগ্রাম' বইখানা পড়ে অতীব প্রীত হয়েছি। বইটিতে বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় স্বদেশপ্রেমী যোদ্ধাদের মৃত্যুঞ্জয়ী শৌর্যবীর্য ও ত্যাগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ইতিহাসের ক্রম অনুসরণ করে। মৃত্যুঞ্জয়ী বীরদের অনেকেই মৃত্যূত্তীর্ণ হয়েছেন শহীদ হয়ে — তাঁদের সেই অবিস্মরণীয় আত্মদানের বিবরণ এ বইয়ের পাতায় পাতায় জ্বলন্ত অক্ষরে উৎকীর্ণ হয়েছে। শ্রীগুপ্তকে আমি কবি বলেই জানতুম; তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবের উজ্জীবক কবিতা ও গান, গান্ধী-সুভাষ ও রামকৃষ্ণ-গাথা, সর্বোপরি খাঁটী লোকসঙ্গীতের ধারায় অনুপম সব লোকগীতি তাঁকে ইতোমধ্যেই একজন অকৃত্রিম অনুভব ও আন্তরিকতা-গুণসম্পন্ন কাব্যরচয়িতা হিসাবে বাংলার কবি সমাজে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। স্বতঃস্ফূর্ত তাঁর ভাব ও ভাষা: ছন্দ-মিলের উপর দখলও যথেষ্ট। সেই তিনিই যে আবার এমন চমৎকার গদ্য লিখতে পারেন—প্রাণস্পর্শী গদ্য—এই বইখানা না পড়া পর্যন্ত সে বিষয়ে ধারণা করা কঠিন ছিল। মুক্তিসংগ্রাম বইখানা বাস্তবিকই সুলিখিত রচনা—বইটি আমাদের নবীন প্রজন্মের পাঠক সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা জাগাবে। প্রবীণ পাঠকেরা এতে ইতিহাসের স্বাদ অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ স্মৃতিচারণেরও সুযোগ পাবেন, কেন না বর্ণিত ঘটনাগুলির সব না হলেও অনেক কটিই এঁদের জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছিল, কোন কোন বিপ্লবী শহীদকে এঁরা চাক্ষুষ করবারও সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

বইয়ের কবিতাংশগুলি এক অসামান্য সম্পদ। যেমন তাদের ভাবের সৌন্দর্য, তেমনি তাদের ছন্দ ও ধ্বনির মাধুর্য। মোটকথা, গদ্যে পদ্যে মিলিয়ে বইখানা তুলনারহিত হয়েছে বললেও চলে। আমি এটির বহুল প্রচার ও ব্যাপক জনসমাদর কামনা করি।

নারায়ণ চৌধুরী

এক

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন। সূর্যাস্তের সাথে সাথে পলাশীর যুদ্ধের অবসান। নিরুপায় নবাব পলায়নের পথে ধৃত হয়ে বন্দিদশায় ২রা জুলাই (১৭৫৭) মীরজাফরের পুত্র মীরণ কর্তৃক অতি নির্মমভাবে নিহত। নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের পর ক্লাইভের হাতের ক্রীড়নক মীরজাফর বাংলার নবাব—ও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় দ্বৈত শাসনের প্রবর্তন। ফলে সারা রাজ্য জুড়ে নেমে এল নৈরাজ্যের ঘোর অন্ধকার। ঐ অন্ধকারে ক্লাইভের চাতুরীতে মীরজাফরের নবাবী চলে এল তার জামাতা মীরকাশিমের হাতে। তারপর ঘটনার কুটিল প্রবাহের সর্বশেষ পরিণতিতে, বক্সারের যুদ্ধে ইংরাজ বণিকের হাতে নবাব মীরকাশিমের পরাজয়। তখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতি ইংরাজ।

মুঘল শক্তি আঘাতে আঘাতে সেদিন সঙ্কুচিত,
মারাঠা শক্তি বিভেদ বিবাদে স্তিমিত অস্তমিত।
কেহ পদ দেহি, কেহ পদ-লেহী—হিম্মত গেছে টুটে,
দেউলিয়া পথে ভারতলক্ষ্মী বণিক নিয়েছে লুটে।

ভাগ্যান্বেষী বিদেশী বণিক সমুদ্র পথে এসে,
রাহুর মতন করে বিচরণ পৃথিবীর দেশে দেশে,
শনির মতন ছিদ্রান্বেষী সুযোগ কোথাও হ'লে—
ছুঁচ হয়ে যায় প্রবেশি সেথায়, ফাল হয়ে আসে চলে।

বাঙালী সেদিন চেতনা হারায়ে ধ্বংসের কোলাহলে,
মেতেছিল, দেশ রাহু কবলিত বিষময় তার ফলে।
পদাহত হয়ে হ'ল বিতাড়িত বাধা হ'ল যারা পথে,
নফর গোলামে হোল পরিণত ক্লীব যারা সাথে সাথে।

রচি বেড়াজাল বাণিজ্য পথে, সাথে সাথে দিয়ে হানা,
ধ্বংস করেছে রেশমশিল্প মেহনতী কারখানা।

বাংলার খুনে জাহাজ বোঝাই হন্দরে হন্দরে—
পাচার করেছে বণিক সেদিন পৃথিবীর বন্দরে।

বাংলার চাষী ধরে দিল নীল দানবের হাতে তুলে,
যমের দুয়ার চারদিক হতে সাথে সাথে গেল খুলে।
অজন্মা সন, মিলেছে ফসল যার যাহা ক্ষেত ঝেড়ে,
নবাবের চর খাজনার নামে সবলে নিয়েছে কেড়ে।
বাংলায় সেইদিন—

জনকজননী সন্তান বেচে অথবা কোথাও ফেলে,
কাড়াকাড়ি করে লুটিয়া খেয়েছে একমুঠো ভাত পেলে।
বাংলায় সেইদিন —

কান্নার রোল আর হাহাকার সকলের ঘরে ঘরে!
অনাচার অবিচারে—
মন্বন্তরে অনাহারে গেল কোটি কোটি লোক মরে।

পরের বছর প্রচুর বৃষ্টিপাতে মাটি হয়ে উঠলো আবার শস্যশ্যামল। কিন্তু মানুষের দুর্দশার বিন্দুমাত্র উপশম হল না। কালচক্রের করাল আবর্তে তখনও ভাসমান বাংলার হিন্দু মুসলমান। চারদিক হতে কানে ভেসে আসে ক্ষুধিত ও উৎপীড়িত মানুষের আর্তনাদ। যেদিকে তাকানো যায়, সর্বত্র চোখে পড়ে ধ্বংসের পদচিহ্ন। এর উপরেও কর আদায়ের জন্য মাঝে মাঝে আমলাদের নৃশংস হামলা। দেশের এইরূপ পরিস্থিতিতে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকর্তা হয়ে এলেন ওয়ারেন হেস্টিংস্। তিনি এসে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যের সকল ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। রাজস্ব সংগ্রহ ও ভূমি বণ্টনের জন্য গড়ে তুললেন নূতন ভ্রাম্যমাণ সংগঠন। নীলামের ডাকের মত সর্বোচ্চ সেলামী দেওয়ার চুক্তিতে, পাঁচ বছরের জন্য বহু জমির মধ্যস্বত্ব তুলে দেওয়া হল স্থানীয় বিত্তবানদের হাতে। নূতন এই মধ্যস্বত্বভোগীদের বিভিন্ন রকম পাওনার দাবী মেটাতে বহু চাষীর ভিটামাটি নীলামে উঠলো। দলে দলে তারা পরিণত হল শেষে দিনমজুরে। অনেকে শেষপর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এ সময় হেস্টিংস্ সাহেবের দুর্দমনীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রলোভন, প্রতিদ্বন্দ্বী বিভিন্নশক্তির সাথে ক্রমাগত যুদ্ধ হাঙ্গামায় তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। আর তার ফলে, বহু অর্থব্যয়ে রাজকোষ হয়ে ওঠে শূন্যপ্রায়। নানা বিপর্যয়ের মুখে পড়ে বণিক সরকার শেষ পর্যন্ত হয় দেউলিয়া। অধীনস্থ রাজা, জমিদারদের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহের জন্য তখন চলে নানাবিধ অপকৌশল ও বল প্রয়োগ। এই জালে পড়ে একে একে তার শিকার হয় বারানসীর রাজা চৈৎ সিং, রোহিলা সর্দার রহমত্ খাঁ, অযোধ্যার বেগমগণ, রাজশাহীর রাণী ভবানী ও মীরজাফরের বিধবা পত্নী মণিবেগম। মণিবেগমের নিকট হতে উৎকোচ গ্রহণ করা হয় তিন লক্ষ চুয়ান্ন হাজার টাকা। এতবড় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর ও উত্তেজিত হয়ে, তখন কোম্পানীর কাউন্সিলে প্রতিবিধানের জন্য নালিশ জানায় নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ—নাম মহারাজা নন্দকুমার। কিন্তু চতুর হেস্টিংস্ এই নালিশের তদ্বিরে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করে। আর ষড়যন্ত্র ক'রে, মিথ্যা ঘুষের মামলায় নন্দকুমারকে জড়িয়ে, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে সুপ্রীম কোর্টে। বিচারের প্রহসনে নন্দকুমারের হল ফাঁসীর হুকুম। ইংরাজ শাসনে অন্যায় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মুক্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে ইতিহাসের প্রথম শহীদ হলেন মহারাজা নন্দকুমার। শেষ পর্যন্ত হেস্টিংসের ছলে বলে কৌশলে সারাভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের দুর্দমনীয় প্রলোভন, আর তার পরবর্তীকালে লর্ড কর্ণওয়ালিসের দেশীয় রাজা জমিদারদের সাথে ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বাংলার কৃষক সমাজকে নিপীড়ন ও চির-দারিদ্র্যের পথে দ্রুততালে এগিয়ে নিয়ে যায়।

হায়রে দেশের চাষী!
মিটাইছো খেটে সকলের ক্ষুধা
সমভাবে ভালবাসি।

সকলের তরে বুকভরা স্নেহ লয়ে,
বিনিময়ে তার চির অবহেলা সয়ে,

বিতরিছ হেসে শ্রমের অন্ন—
নিজে থাকি উপবাসী।
বাঙ্‌লামায়ের নিরলস শিশু
সরল উদার প্রাণ,
সহ অপমান তবু কর দান
হাসি নহে কভু ম্লান।
যত যায় দিন, দীন হতে দীন
চলেছো অকূলে ভাসি।

প্রত্যহের অনাহার ও অর্ধাহারে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখী হয়ে বাঁচার তাগিদে ইংরাজের বিরুদ্ধে তখন অস্ত্রধারণ করে কোল, ভীল ও সাঁওতাল জাতি। ইতিহাসে ইহা আদিবাসী-বিদ্রোহ বলে বর্ণিত। সবচেয়ে চমকপ্রদ এসময় ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াহবি আন্দোলন, নিজ অধিকার রক্ষার দুর্বার প্রতিজ্ঞায় এই আন্দোলনের নেতা বীর তিতুমীরের বীরত্বের অপূর্ব কাহিনী।

জাগে বিদ্রোহ চাষীদের মাঝে বিদ্রোহী অগনন,
ঘোর বিপ্লবে দেখা দিল তিতুমীরের আন্দোলন।
বাঁশের কেল্লা রচি তার মাঝে বর্শা ও ঢাল হাতে,
কামানের মুখে বীর তিতুমীর জান দিল বুক পেতে।

সবচেয়ে দুঃখ ও বেদনাময়, পল্লীর সহজ, সরল অশিক্ষিত নীল চাষীদের উপর নীল কুঠিয়াল সাহেবদের নৃশংস উৎপীড়নের কাহিনী। বাংলার মাঠে ঘাটে এই কুঠিয়াল ফিরিঙ্গির দল বছরের পর বছর সরলপ্রাণ এই চাষীদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে।

যমদূত তার করালদংষ্ট্রা লুকায়েছে অবশেষে,
দেখাদিল এসে সাক্ষাৎ যম নীলদানবের বেশে।
তাহার হুকুম না মেনে যে চাষী ক্ষেতে বুনিয়াছে ধান,
চাবুকে পিঠের ছাল খুলে দিয়ে তবু পায় নাই ত্রাণ।
হৃদয় বিদারী চিৎকার শুনি কেহ আসি বাধা দিলে
আরও রেগে উঠে লাথি ও লাঠিতে ফাটিয়ে দিয়েছে পিলে।

নালিশ ছিলনা, সালিস ছিলনা, নাহি ছিল প্রতিকার,
অর্থের লোভে রাষ্ট্রে, সমাজে ক্ষমতার ব্যাভিচার।
নীল বিষধর দংশন তার বিষময় পরিণামে,
বাংলার চাষী অকূলে ভেসেছে গিয়েছে জাহান্নামে।

নিরুপায় চাষীর দল অর্ধশতাব্দী ধরে সহ্য করেছে নীল কুঠিয়ালদের এই অত্যাচার উৎপীড়ন। তারপর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজার চাষী একসাথে নীলকরদের এই পাশবিকতার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ। পলাশীর যুদ্ধের ঠিক দেড় দশক পরে শোষণ নিপীড়নে জর্জর, তার উপর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তখনকার বাংলাদেশের হুগলী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন রাজা রামমোহন রায়। তার আবির্ভাব যুগান্তের অন্ধ-কুসংস্কারের আবর্তে সূর্যের তেজে স্বচ্ছ আলোক বিকিরণে, বাংলার পরবর্তী-কালের তরুণ ছাত্রদের চিন্তার জগতে এক নবদিগন্তের দুয়ার খুলে দিল। রামমোহন বদ্ধ জলাশয়ের সাথে ঘটালেন বিশ্বস্রোতের সংমিশ্রণ। প্রাচ্যের সংস্কৃত, ফার্সী ও পাশ্চাত্যের ফরাসী ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত রামমোহনের ধর্মীয় বিশ্লেষণ, হিন্দুসমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন নীতি পদ্ধতির বিরুদ্ধে করলো বিদ্রোহ ঘোষণা। তাঁর যুক্তির প্রাধান্যে ও তৎকালীন শাসনকর্তা লর্ড বেন্টিঙ্ক-এর হস্তক্ষেপে সতীদাহের মত পাপ প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল। ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হল হিন্দু কলেজ। পাঠ্যপুস্তকের অভাব মোচনের জন্য ইংরেজী কিছু পাঠ্যপুস্তক তিনি নিজেই রচনা করলেন। শাসক সম্প্রদায়ের নীতিভ্রষ্ট, কলুষিত শাসনতন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রতিবাদ। তার অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেশে দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। রামমোহনের তিরোধানের পর তাঁর ধর্মমত ও কর্মপথের বহুমুখী ধারা স্তব্ধ হয় নাই, বরং সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার পথে ত্রিবেণীর ধারার উদ্দামগতিতে এগিয়ে চলেছে।

তাঁর বেদান্তসত্য-প্রসূত উদার ধর্মমতের উত্তরসাধক হন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন।

ইংরাজী শিক্ষা প্রচারে হেয়ার সাহেবের অবদান বাংলার সেদিনের শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক ডিরোজিও-র শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রসমাজে সেদিন জাগিয়ে তুলেছে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। আর তা বিচারধর্মী হয়ে দান করেছে প্রকৃত বিবেকসম্মত সত্যকে গ্রহণ করার সৎসাহস।

শিক্ষার আলো জ্বেলে সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শতবাধা অতিক্রম করে রামমোহন রায়ের পরে ঘোর সংগ্রামী হয়ে উঠেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সুধীসমাজে তিনি বিদ্যাসাগর আর হতভাগ্য দরিদ্র সমাজে দয়ার সাগর বলে পরিচিত ছিলেন।

এ সময় দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবমূর্তি আর তাঁর উদার পরিশীলিত ধর্মমত বাংলার শিক্ষিত তরুণ সমাজের বৃহৎ এক অংশকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ এই মহাপুরুষের ঈশ্বর তত্ত্বের অতি সরল ব্যঞ্জনায় ও মহাভাবে অভিভূত হয়ে, জগতের ধর্মপ্রাণ সুধীসমাজের দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরেন তাঁর পবিত্র জীবনের সুন্দর আলেখ্য।

রামমোহন রায়ের তিরোধানের পর দুই দশক আগে পরে বাংলায় জন্মগ্রহণ করেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী ও আনন্দমোহন বসু। এই মহামনীষীবৃন্দ শিক্ষায়, সাহিত্যে, সমাজসেবায়, ধর্মে ও দেশাত্মবোধে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলেন। আর অন্যদিকে চতুর ইংরাজ একশতাব্দী ধরে 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্' কৌটিল্যশাস্ত্রের অতি সুপরিচিত এই কূটনীতির সুনিপুণ প্রয়োগে, ছলে বলে কৌশলে প্রায় তামাম হিন্দুস্থান জয় করে ফেলে।

আসে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ—এসময় ইংরাজ শাসকশ্রেণীর বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে দানা বেঁধে ওঠে গুরুতর অসন্তোষ।

চারদিক থেকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে সেপাইদের কানে কানে—বন্দুকের টোটা শূকর ও গরুর চর্বিতে প্রস্তুত।

বিদ্রোহের প্রধান কারণ সাম্রাজ্যের অধীনস্থ রাজ্যগুলির অপুত্রক রাজাদের মৃত্যুর পর তাদের দত্তক পুত্রদের উত্তরাধিকার স্বত্ব অগ্রাহ্য করে, লর্ড ডালহৌসীর একের পর এক রাজ্যগুলি কেড়ে নেওয়া। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বত্ববিলোপ আইন নামে বিলেতে বসে এই মারণাস্ত্র তৈরী হয়। তার বিশ বছর পরে লর্ড ডালহৌসীর রাজত্বে সে এই মারণাস্ত্র ও বন্দুকের বলে একে একে উদরস্থ করে সাতারা, সম্বলপুর, উদয়পুর, নাগপুর, ঝাঁসী প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে। পুঞ্জীভূত অসন্তোষ নিয়ে উপযুক্ত সুযোগের প্রতীক্ষায় দিন গোনে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেব, মারাঠা বীর তাঁতিয়া তোপী, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, জগদীশপুরের কুনওয়ার সিং আর দিল্লীর মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ। এই বিদ্রোহের পটভূমিকায় সর্বভারতীয় কোন নেতৃত্ব অথবা একযোগে ব্যাপক সামরিক আক্রমণের কোন পরিকল্পনা ছিল না। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে একমাত্র পূর্বোক্ত রাজন্যবর্গই এতে যোগ দিয়েছে, চতুর ইংরেজের চোরা প্যাঁচে ধরাশায়ী হয়ে যারা পথে বসেছিল। আগুন প্রথম জ্বলে ওঠে ব্যারাকপুর ও বহরমপুরে। ব্যারাকপুর বিদ্রোহের প্রধান পাণ্ডা মঙ্গল পাণ্ডের হয় এজন্য মৃত্যুদণ্ড। তারপর বিদ্রোহের আগুন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে আম্বালা ও মীরাটে। সেখান হতে বিদ্রোহীরা জয়োল্লাসে দিল্লী গিয়ে অধিকার করে রাজধানী। তারা বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে দিল্লীর সম্রাট বলে ঘোষণা করে। ছড়িয়ে পড়ে এ আগুন পর পর লক্ষ্ণৌ, কানপুর, অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশের ঝাঁসী ও বিহারের জগদীশপুরে। বুদ্ধি, তৎপরতা, ক্ষিপ্রতা, মনোবল ও অপূর্ব রণ কৌশলে সারা ভারতের বুকে জ্বলন্ত এই বিদ্রোহের আগুন নিবিয়ে ফেলে নিকলসন্, ক্যাম্বেল, হিউরোজ প্রভৃতি সেনানায়কগণ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিকলসন্‌কে দিল্লীর যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

* * *

ছিদ্রের পথে প্রবেশি নিয়ত ছলে বলে কৌশলে,
সারা ভারতের ঝুঁটি ধরি আনি টেনে ফেলে পদতলে।

যারে ধরে তার গ্রাস করে সব, কেড়ে লয় নিঃশেষে,
সন্ত্রাসবাদ ছড়াইয়া পড়ে প্রতিদিন সারা দেশে।

অনশনে রহি, তিলে তিলে দহি বলি হয় অগণন,
উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোলে কেঁপে ওঠে ত্রিভুবন।
ঘোর অবিচার নিপীড়ন সয়ে সেপাইরা দলে দলে
বাঙালী, বিহারী, পাঠান মোঘল একসাথে ওঠে জ্বলে।

প্রতিশোধ নিতে সঞ্চিত ক্রোধ ফুলে ওঠে আক্রোশে,
চোখের পলকে শাসকের বুকে ভেঙ্গে পড়ে নির্ঘোষে।
বাংলা হইতে আম্বালা, পরে মীরাটের পথে ছুটি,
ইংরাজ পেলে খুন করি ফেলে, সব লয় তার লুটি।

আগুনের শিখা প্রলয় বাতাসে আকাশের গায়ে উড়ে
ছড়াইয়া পড়ে ঝান্সী বিহারে লক্ষ্ণৌ কানপুরে।
তাঁতিয়া তোপি ও নানাসাহেবের প্রবল আক্রমণ,
পলায়ন পথে ইংরাজ সেনা হত হয় অগণন।

ঝান্সীর রাণী—করালিনী বেশ খর অসি করবালে,
সমরাঙ্গনে রণতুরঙ্গে দোলে তরঙ্গ তালে।
দিল্লী শহরে ঢেউ উত্তাল, উন্মাদ বেগবান
যুক্ত সেনানী মুক্ত কৃপাণ বাদশার জয়গান।

শুনি ধেয়ে আসে ইংরাজ সেনা বাহিরের শত শত
ছেয়ে ফেলে শেষে দিল্লী শহর পঙ্গপালের মত।
কাশ্মীরদ্বার ভেঙ্গে চুরমার গুড়ো হয়ে যায় উড়ে
শুরু হয় খেলা রক্তের হোলি রাজপথে ঘুরে ঘুরে।

ইংরেজ সেনা হাজার হাজার, হানা দেয় বারবার,
আগে প্রতিরোধ, পরে প্রতিশোধ নিষ্ঠুর সংহার।
দিল্লী আবার শৃঙ্খলগত মহাকাল পরিহাস,
মুঘল বাদশা বাহাদুরশাহ ইংরাজ ক্রীতদাস!

ঝান্সীর রাণী রণতাণ্ডবে লুটালো ধরণীতলে,
মারাঠার ভাল রক্ততিলক লুকালো অস্তাচলে,
নানা সাহেবের ফকিরের বেশে দেশত্যাগ তার পরে,
ইতিহাস তার খবর রাখে না কবে কোথা গেল মরে।

এইরূপে পুরো একশতাব্দী কাল—
চাষীদের বুকে চাবুক লাগায়ে পিঠের তুলিয়া ছাল,
তাঁতীর কাটিয়া বুড়ো আঙ্গুল,
কুটীর শিল্প করি নির্মূল,
অক্‌টোপাশের শক্ত বাঁধনে রুদ্ধ করিয়া শ্বাস,
যখন হয়েছে মাতাল মত্ত
চক্ষুগোলক করি আরক্ত
ভক্তকুকুর লেলিয়ে দিয়েছে প্রত্যহ বারমাস।
বাংলার মাঠে হাটে বন্দরে শতাব্দী-ইতিহাস।

দুই

রণনিপুণ ইংরাজ সেনানায়কদের বুদ্ধি ও রণকৌশলে শেষপর্যন্ত বিদ্রোহ দমিত হল। সিন্ধুপারের হিন্দুস্থান পাগলা ঘোড়ার লাগাম, আবার ফিরে এলো হাতের মুঠোয়। তারপর এই বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ জানার পরে বিতর্কের তুমুল ঝড় উঠলো বিলাতের মহামান্য মন্ত্রীসভায়। শেষে কোম্পানীর সর্বগ্রাসী-নীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে, কোম্পানীর হাত থেকে শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব মহারাণী ভিক্টোরিয়া গ্রহণ করলেন স্বহস্তে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, সকল প্রজাদের উপর উদার সমদৃষ্টি ও নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারের। কিন্তু এর পরেও সাহেবদের হাতে নীল চাষীরা বেত খেয়ে ন্যায় বিচারের দোহাই দিয়ে বিচারের শেষে জেল খেটেছে। প্রবল ক্ষমতাশালীর বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের নানা অভিযোগের একটিও কোনদিন সাগর পার হয়ে মহারাণীর দরবারে পৌঁছায়নি। পরাক্রান্ত উৎপীড়কের বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের আইনসম্মত নালিশ কদাচিৎ উচিত বিচার লাভ করে। মহারাণীর রাজত্বে দুবছর প্রবল আন্দোলনের পর বাধ্যতামূলক নীলচাষের হাত থেকে কৃষকেরা রেহাই পায়। এ আন্দোলন জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালী সমর্থন করে। পরিকল্পিত পথে বাংলাদেশে এই সর্বপ্রথম গণ-আন্দোলন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ক্রমে ইংরাজী শিক্ষার ক্ষেত্র সহর অতিক্রম করে গ্রামের দিকে বিস্তৃত হয়। বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে উঠে। ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে তখন সারা পৃথিবীর স্বাধীন ও পরাধীন জাতির ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের শিক্ষিত সমাজের পরিচয় ঘটে। পরাধীনতার গ্লানি তখন অনেক শিক্ষিত তরুণের মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কাল। সেকালের একজন দেশহিতৈষী জননায়ক ছিলেন মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজনারায়ণ বসু। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার অদম্য উৎসাহে তিনি গড়ে তোলেন 'গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী' নামে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান।

প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল, বুনিয়াদি শিক্ষার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে কুটীর শিল্পের সম্প্রসারণ। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নবগোপাল মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতার হিন্দুমেলা। প্রতি বৎসর এই মেলা স্বদেশী সঙ্গীত, বক্তৃতা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় স্বদেশী দ্রব্যসম্ভারে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক পবিত্র ভাবময় মূর্তিতে আবির্ভূত হত। উক্ত মেলার প্রভাব ক্রমে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ মেলা প্রতিবৎসর জনসাধারণকে উৎসাহ দিয়েছে বিলিতি দ্রব্য বর্জন করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য কুটীর শিল্প স্থাপন করতে।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী চাকুরি করে স্বাধীন মত ব্যক্ত করার অপরাধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গলী' নামক সংবাদপত্র ও 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন' এর মাধ্যমে পক্ষপাতদুষ্ট বৃটিশ শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন, গঠন করেন জাতীয় সম্মেলন। আর সেই অপরাধে ভোগ করেন কারাদণ্ড।

এ সময় বাংলার একদল তরুণ অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শিবনাথ শাস্ত্রী আর দীক্ষিত হন বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরীমোহন দাস ও তারাকিশোর রায়। অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে বুকের রক্তের স্বাক্ষরে তাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য আজীবন সংগ্রামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন'-এ 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত সহ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় 'আনন্দমঠ'। উহা পুস্তকাকারে প্রকাশের সাথে সাথে বাংলার বিদগ্ধ তরুণ সমাজে নূতন এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সারমর্মবাণী হচ্ছে, অন্যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের আহ্বান। আর 'বন্দেমাতরম্' হচ্ছে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য শক্তি সংগ্রহের অভিমন্ত্র। পরবর্তীকালে কত শহীদ দীপ্ত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' এই অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ফাঁসিমঞ্চে ও রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। এ সময়ের আর একখানি পুস্তক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। এতে সরল, গ্রাম্য ও সুখসমৃদ্ধ এক চাষী পরিবারের নীল দানবের পাশবিক নখদন্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার যে চিত্র প্রতিবিম্বিত, তাতে পৃথিবীর সভ্য সমাজ আতঙ্কিত। আর এই পরাধীন দেশের মানুষের ঠাণ্ডা রক্তও এ আগুনে টগবগ করে ফুটে ওঠে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হয় কংগ্রেসের জন্ম। বোম্বাই সহরে উমেশচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে হয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। সেদিনের কংগ্রেস সংগঠনে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কোনও পরিকল্পনা ছিল না। নীতি ছিল বক্তৃত্ব ও আলোচনার মাধ্যমে, চেয়ে-চিন্তে সুখসুবিধা যৎকিঞ্চিৎ আদায় করা। এর আরও প্রায় এক দশক পরে, সমাজের উচ্চস্তরের স্বার্থান্ধ সম্প্রদায়ের পরিচালনাধীনে জরাজীর্ণ ক্লেদাক্ত সমাজকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে, শিক্ষার আলোকে পথের অন্ধকার দূরে সরিয়ে, সকল সম্পদের সমবণ্টনের মাধ্যমে একসাথে সকলে মিলেমিশে সমাজ ও রাষ্ট্রের বনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের বজ্রকণ্ঠের উদাত্ত আহ্বান সারা ভারতের যুবসমাজের অন্তরে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। এখানে তাঁর মর্মস্পর্শী বাণীর যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি :—

“ভারতের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু তোমরা শূন্যে বিলীন হও। আর নূতন ভারত বেরোক। বেরোক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, মালো মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য থেকে। বেরোক মুদীর দোকান থেকে, ভুনোওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরোক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরোক ঝাড়, জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে। এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে—তাতে পেয়েছে অপূর্ব সহিষ্ণুতা। অপরিসীম দুঃখ ভোগ করেছে—তাতে পেয়েছে অটল জীবনী শক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে, আধখানা রুটি খেয়ে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবেনা। এরা রক্তবীজের প্রাণসম্পন্ন, আর পেয়েছে অদ্ভুত সদাচারের বল যা ত্রৈলোক্যেও নাই। ঐ যে কলের কুলি-মজুর, কোল, ভীল, সাঁওতাল, মুচি, মেথর—ওরা তোমারই ভাই।”

অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী নির্ভীক এই বীর সন্ন্যাসীর সভাসমিতির বিভিন্ন ভাষণ ও গ্রন্থাবলী পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণের প্রাণে বিপ্লবের বীজ বপন করে।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এই মহামানবের মহাপ্রয়াণের সাথে সাথে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের নেতৃত্বে ও সভাপতিত্বে কলিকাতার মদনমিত্র লেনে গড়ে ওঠে এক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান—নাম অনুশীলন সমিতি। সমিতির প্রতিষ্ঠা দিবস ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ। জন্ম থেকেই এর সক্রিয় সহযোগী যতীন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী), ভগ্নী নিবেদিতা, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস। এছাড়া তৎকালীন বহু দেশহিতৈষী সুধীবৃন্দ। অল্পদিনের মধ্যেই বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিস্তৃত হয় এর শাখা প্রশাখা।

অনুশীলনের নীতি ছিল নিয়মিত ব্যায়াম ও খেলাধূলার মাধ্যমে দেহমন বজ্রের মত দৃঢ় করে দেশের তরুণদের সংগ্রামী করে গড়ে তোলা। বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ তখন অসম্ভব শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সংগ্রামী এই মনোবলকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে বড়লাট লর্ড কার্জন ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত করেন। এর আর একটি উদ্দেশ্য ছিল পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতি অনুকম্পা দেখিয়ে, তাদের হাতের পুতুল করে রাখা। কিন্তু ফল ফলল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। মিলিত হিন্দু-মুসলমানের প্রতিবাদ ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো সারা বাংলার আকাশ বাতাস, এতবড় সর্বনাশের প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধাচরণে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে নেতৃবৃন্দের ওজস্বিনী বক্তৃতা, বন্দেমাতরম্ ও রবীন্দ্রনাথ রচিত বিশেষ বিশেষ কয়েকটি সঙ্গীত— 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,' 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা,' 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'—রুখে দাঁড়াবার আরও সৎসাহস ও শক্তি যোগায়। এ সময় 'সন্ধ্যা' ও 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবের আগুন ছড়ায়। উক্ত সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও কৃষ্ণ কুমার মিত্র।

বাংলাদেশে যখন এ রকম পরিস্থিতি তার পূর্বে মহারাষ্ট্রেও শিবাজী উৎসবের মাধ্যমে জ্বলে উঠেছে বিপ্লবের আগুন। উক্ত বিপ্লবযজ্ঞের হোতা ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। দামোদর চাপেকার ও তাঁর ভাই পরপর দুইজন অত্যাচারী ইংরেজকে খতম করে এসময় ফাঁসির মঞ্চে জীবন আহুতি দিলেন। বরোদার রাজ কলেজে সহকারী অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত তখন শ্রীঅরবিন্দ। বিলেতে থাকা কালেই শ্রীঅরবিন্দ 'আনন্দমঠ' ও বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের সহিত পরিচিত। বরোদায় ঠাকুরসাহেব নামে এক বিপ্লবীর সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে, ইহার ফলে শ্রীঅরবিন্দ সাংগঠনিক প্রস্তুতির প্রতি আকৃষ্ট হন। এ সময় সিস্টার নিবেদিতার সঙ্গে বরোদায় শ্রীঅরবিন্দের সাক্ষাৎ ঘটে। বাংলাদেশের

বৈপ্লবিক পরিস্থিতির ব্যাপক আলোচনার পর সিস্টার নিবেদিতা অনুরোধ জানান অরবিন্দকে বাংলাদেশে ফিরে যেতে। তিনি বলেন, "বাংলায় সংগ্রামের উপযুক্ত ক্ষেত্র এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত, বাংলার বিপ্লববাদ এখন উপযুক্ত নেতৃত্বের অপেক্ষায়। বৈপ্লবিক দলগুলিকে সংহত করে আপনি গিয়ে সেখানকার নেতৃত্ব গ্রহণ করুন।" অরবিন্দ এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। এ কাজে তাঁর সহচর হলেন সহোদর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও বন্ধু যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স। কিন্তু এই কন্‌ফারেন্সকে পুলিস শেষ পর্যন্ত দক্ষযজ্ঞে পরিণত করে। গ্রেফ্‌তার করে দেশবরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বরিশালের প্রাণপুরুষ অশ্বিনী কুমার দত্তকে। এর ফলে সারা জেলা উদ্বেল হয়ে ওঠে বিলাতীদ্রব্য বয়কট আন্দোলনে।

অরবিন্দের সুচিন্তিত বৈপ্লবিক পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিতে বারীন্দ্রকুমার ও যতীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চলে এলেন কলকাতায়। অরবিন্দ এলেন আরও কিছুদিন পরে। মধ্যকলিকাতার চাঁপাতলায় প্রতিষ্ঠিত হল, বৈপ্লবিক গুপ্ত ঘাঁটি ও প্রচারের উদ্দেশ্যে যুগান্তর নামক সংবাদপত্র। সংগঠন ক্রমে প্রসারিত হওয়ার পর গোপনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে চলে আসে শেষে মুরারিপুকুরে। অরবিন্দের সম্পাদনায় পরিচালিত হয় 'বন্দেমাতরম্' নামক তৎকালীন প্রসিদ্ধ ইংরেজী পত্রিকা। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জীবন বিপন্ন করেও বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য বৈপ্লবিক প্রবন্ধগুলি লিখতেন তখন শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, সিস্টার নিবেদিতা, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ। তাদের লেখনীর মর্মস্পর্শী আবেদনে সাড়া দিয়ে, তরুণ একদল যুবক মুক্তির জন্য উন্মাদ হয়ে কলিকাতার মুরারীপুকুরে ছুটে আসেন। আসেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, নরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, মেদিনীপুর থেকে সত্যেন্দ্র নাথ বসু ও চন্দননগর থেকে কলেজের ছাত্র কানাইলাল দত্ত। সত্যেন বসুর সহচর হয়ে এর পরে আসেন ক্ষুদিরাম। প্রফুল্ল চাকী আসেন রাজশাহী থেকে স্বয়ং বারীন্দ্রের সহকর্মী হয়ে। এ সময় জার্মানী থেকে বোমা তৈরীর কলাকৌশল শিখে এসেছিলেন

মচন্দ্র কানুনগো। বোমা তৈরী শিখাবার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় তিনি রারীপুকুরের বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। এর কিছুদিন পরে ন্দেমাতরম্'-এ প্রবন্ধ লেখার অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন স্বামী বেকানন্দের সহোদর ভূপেন দত্ত। আর ঐ একই অপরাধে বিপিন পালের যদিন বিচার, আদালত সেদিন লোকে লোকারণ্য। শুরু হয়ে যায় তখন নতার উপর পুলিসের নির্মম লাঠি চালনা। কিন্তু একটি উদ্ধত কিশোর াম সুশীল সেন—মার খেয়েও সে অটল, কিছুতেই সে ঐ স্থান ত্যাগ করে া। চীৎকার করে বার বার সে বলতে থাকে, "আমি আমার প্রিয় নেতাকে অন্যায়, অবৈধ বিচারের মুখে একলা রেখে কিছুতেই যাবো না।" তাকে রে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হল। তারপর কিংস্‌ফোর্ডের বিচারে তার াস্তিবিধান হল বেত্র দণ্ড। দণ্ডভোগের পর সর্বদেহে তাঁর দরবিগলিত রক্তের ধারা। এ অবস্থায় সটান উন্মাদের মত ছুটে গেল সে মুরারীপুকুরের বাগান বাড়িতে। সারাদেহ তখন তার রক্তাক্ত আর চোখে জ্বলন্ত আগুন। বারীন্দ্র কুমারকে উদ্দেশ করে চীৎকার করে বলে উঠলো, "বারীন দা, আমার এই রক্তে স্বাক্ষরিত হউক আজ ঐ অত্যাচারী কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞাপত্র।" কিংস্‌ফোর্ডের বিচারে বিপিনপালের হল কারাদণ্ড, আর বিপ্লবীদের বিচারের রায় হল—কিংস্‌ফোর্ডের মৃত্যুদণ্ড। বাংলাদেশের বৈপ্লবিক রুদ্রমূর্তির অগ্নিউদ্‌গীরণে তখন ভীত ও বিচলিত হল কলিকাতার সাহেব সম্প্রদায়। কিংস্‌ফোর্ডের নিরাপত্তার জন্য তাকে বদলী করে পাঠিয়ে দেওয়া হল মজঃফরপুরে। মজঃফরপুর গিয়ে কিংস্‌ফোর্ডকে হত্যা করে ফিরে আসবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। আর এ কাজের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে তাঁরা যাত্রা করলেন যথাস্থানে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল কিংস্‌ফোর্ড সাহেবের গাড়ী ভেবে বোমা ছুঁড়ে ভুলক্রমে দুই ইংরাজ রমণীকে তাঁরা হত্যা করলেন। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় বিশ মাইল পথ অতিক্রম করার পর ধরাপড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রিভলবারের গুলিতে নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দিলেন প্রফুল্ল চাকী, আর ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে গেলেন মজঃফরপুর থেকে ২৫ মাইল দূরে ওয়াইনী স্টেশনের গায়ে। ধরা পড়ার সাথে সাথে বারংবার তাঁর মুখের বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে

Public Library

উৎকর্ণ হয়ে জনতা চারদিক থেকে ছুটে এলো। একটু পরে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে জেলাশাসকের ডাকবাংলোয়। সেখানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উডম্যান সাহেবের জেরার উত্তরে নির্ভীক ক্ষুদিরাম বলে চললেন, "আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু; নিবাস মেদিনীপুর জেলায়; এসেছিলাম কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে হত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এইমাত্র জানতে পারলাম সে শয়তান অক্ষত দেহে এখনও বেঁচে আছে। আর তার বদলে নিহত হয়েছে দুইজন নির্দোষ পথচারিণী। আমার ভুলের জন্য আমি অনুতপ্ত।" তাঁর এই জবানবন্দী লিখিত হওয়ার পর নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে মজঃফরপুরে। বিচারালয়ে বিচারের পর হল তাঁর ফাঁসির হুকুম। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

ফাঁসী মঞ্চে হাসি যার, সারা দেশে আগুন ঝরালো—
অগ্নিযুগ ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা তার নাম—**ক্ষুদিরাম**।
বঙ্গ ভঙ্গ রোধে, বাঙ্গালীর নব জাগরণ, শিকল ভাঙ্গার গান
অরবিন্দ বারীন্দ্রের উদাত্ত আহ্বান—
গোপন সুরঙ্গ পথে গ্রাম হতে গ্রামে তোলে তরঙ্গের দোল।
এ কল্লোল অবিরাম, কান পেতে শোনে ক্ষুদিরাম।
বিপ্লবী সত্যেন বোস শিক্ষকের ছদ্মবেশ ধারী,
সারাদিন গ্রাম ঘুরে গড়ে তোলে ছাত্র-সংগঠন।
ক্ষুদিরাম, রাত্রিদিন ছায়ার মতন তাঁর হয় অনুগামী।
সত্যেনের সাহচর্য মাতায়ে তুলেছে তাঁর প্রাণ।
গ্রাম ছেড়ে দূরে এক ছায়াঘন অরণ্য নিবিড়,
তার মাঝে ভগ্নপ্রায় পুরাতন কালীর মন্দির
বিপ্লবীর গোপন মিলন ঘাঁটি।
অধিষ্ঠাত্রী সেথা—দনুজ-দলনী কালী করাল বদনা।
মুক্তকেশী বিকট দশনা,
লোল জিহ্বা করে অসি, গলে মুণ্ডমালা।

তারি পদতলে আসি বসি পদ্মাসনে—
ক্ষুদিরাম অগ্নিমন্ত্রে অভিষিক্ত করে আপনারে।
রক্তাম্বর পরিধানে শুচি শুদ্ধ মন—
বুকের রুধির সিক্ত সচন্দন রক্তজবা সমর্পিয়া দেবীর চরণে।
"মাগো—পরাধীন আবদ্ধ শৃঙ্খলে
লাঞ্ছিত ও বঞ্চিতের মুক্তি সাধনায়
তেয়াগিতে পারি যেন ক্ষুদ্র এ জীবন।"
ভক্তিভাবে বিগলিত অশ্রুজলে আত্মনিবেদন।

শুরু হয় আন্দোলন গ্রামে গ্রামে বিলাতী বর্জন।
প্রচার পুস্তিকা সাথে গোয়েন্দার হাতে, ধরা পড়ে গেল ক্ষুদিরাম।
নাবালক বলে তারে আদালত দিল অব্যাহতি।
কিন্তু, পরিত্রাণ মিলিল না গোয়েন্দার হাতে।
যখন যেখানে যায়, রক্তচক্ষু পুলিসের পিছু ধায় ছায়ার মতন।
ভয়ত্রাসে সশঙ্কিত সদা, বিড়ম্বিত হয়ে ওঠে দিদির জীবন।
তাঁরি লাগি দিদি তার অকারণে প্রতিদিন সহে নির্যাতন।
অসহ্য বেদনা বোধে, তারপর ক্ষুদিরাম গৃহছাড়ি' করে পলায়ন।

লুকাইয়া আপনারে অতি সঙ্গোপনে,
কোথা যায় কোথা থাকে কেউ নাহি জানে।
কভুবা আহার জোটে, কভু দিন কাটে অনাহারে।
নীড় হারা পাখী অন্ধকারে উড়ি পথ করে বিচরণ
এড়াইয়া কিরাতের অব্যর্থ সন্ধান।
তারপর, ঝড় ঝঞ্ঝা করি অতিক্রম—
সত্যেনের সাহচর্যে চলে আসে মুরারীপুকুর।
অদম্য উৎসাহে শিখে লয় অতর্কিত গুপ্ত আক্রমণ;
প্রয়োজন বোধে প্রাণ নিতে প্রাণ দিতে সহাস্য বদনে।
বিচারক কিংসফোর্ড অপরাধ প্রমাণ না করি
কারাগারে পাঠায়েছে বহু বিপ্লবীরে,

বিপ্লবীর আদালতে এ কারণে প্রাণদণ্ড বিধান তাহার।
অমনি শাসনযন্ত্র পাঠায়েছে সাহেবেরে মজঃফরপুরে,
ভীত হয়ে এ'কাজের ভাবি পরিণাম।
দিন দুই পরে, উপনীত গিয়ে সেথা প্রফুল্লচাকী ও ক্ষুদীরাম।
লুকাইয়া সাবধানে থাকি, চিনে লয় যেই পথে সাহেবের বাড়ি।
প্রতিদিন গাড়ি চড়ে' নিয়মিত যেই পথে আসা-যাওয়া করে।
সুযোগ সন্ধানে আর তাকে তাকে থাকি,
অকস্মাৎ একদিন ধূমকেতু সম, ঝাঁপাইয়া পড়ে বেগে
অবরুদ্ধ করি তার গতি।
কিন্তু, ভুল করে চেয়ে দেখিল না,
অভ্যন্তরে কারা ছিল বসে।
সহসা তড়িত খেলে অব্যর্থ সন্ধানে
বোমা ছুঁড়ি দুইজন দুই পথে করে পলায়ন।
আকাশ কাঁপায়ে ঝড়ে, প্রলয়ের বজ্রসম ঘটে বিস্ফোরণ।
ছিন্ন ভিন্ন দেহ, ধূমায়িত অগ্নিকুণ্ডে রক্তে ভাসে
দুইজন ইংরাজ রমণী।
আর্তনাদে তাহাদের ছুটে আসে আতঙ্কিত পথিকের দল।
ছুটে আসে রাজপুরুষেরা, কর্মব্যস্ত যে যেখানে ছিল।
এ আঘাত সাম্রাজ্যের শিরে, বিনা মেঘে যেন বজ্রপাত।
পথে পথে প্রচারিত হয় এ কাহিনী।
ধেয়ে আসে পুলিসের সশস্ত্র বাহিনী।
মার মার ধর ধর ঘোর কোলাহলে,
কিছু দূরে পিছু লয় প্রফুল্ল চাকীর—
মোকামার পথ ধরি অতি দ্রুত পলায়ন রত।
পুলিশের পদধ্বনি বাঁশির আওয়াজ
বার বার কানে পশে বাতাসের ভরে।
যেদিকে তাকায় হেরে তরঙ্গ উত্তাল
ধেয়ে আসে উর্দ্ধশ্বাসে গ্রাসিতে তাহারে।

চেয়ে দেখে খেয়া পারে শ্বেতকায় শতশত প্রহরায় রত
'পলায়ন অসম্ভব'—অমনি গর্জিয়া উঠি হাতের পিস্তল
উড়ালো মাথার খুলি চোখের নিমেষে।
মহাবীর ঢলে পড়ে গেল দেশমাতৃকার ক্রোড়ে অন্তিম শয্যায়,
রক্তে তার ছড়াইয়া বিপ্লব আগুন।
ডাক দিয়া সকলেরে—
আগামী দিনের ঘোর সংগ্রামের তরে।
আর ক্ষুদিরাম, মরিবার অবসর মিলিলনা তার।
ওয়াইনী স্টেশনের গায়, কুচক্রীর বেড়াজালে ধরা পড়ে গেল।
বেদনায় হল ম্রিয়মাণ, যখন শুনেছে কানে
ভুল করে হরিয়াছে নির্দোষের প্রাণ।
বিচারের শেষে হল মৃত্যুদণ্ড তার।
দেশের মুক্তির পথে ভয় বিনাশিতে,
আসমুদ্র হিমাচলে তুলি' আলোড়ন,
ফাঁসী কাঠে ক্ষুদিরাম প্রাণ দিল হাসিতে হাসিতে!
মরদেহ যে মাটিতে হল ভস্মীভূত,
পুণ্যভূমি ভারতের মহাতীর্থ ধাম।
স্মরি তাঁরে অসংখ্য পথিক
ভক্তিভরে জানায় প্রণাম—**ক্ষুদিরাম**।
বৈরাগীর একতারায়, বাউলের গানে,
গাঁথা হয়ে আছে পুণ্য নাম—
ক্ষুদিরাম, ক্ষুদিরাম, ক্ষুদিরাম।

মুহূর্তে এ সংবাদ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কলিকাতায় এ সংবাদ পৌঁছানো মাত্র, লালবাজারের পুলিশ বাহিনী মুরারীপুকুরের বাগান বাড়ি ঘিরে ফেলে। উদ্ধার করে ডিনামাইট সহ বহু পিস্তল ও বোমা। সেখানে গ্রেফ্‌তার হন বারীন ঘোষ সহ চৌত্রিশজন বিপ্লবী। নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে হানা দিয়ে, গ্রেফ্‌তার করা হয় শ্রীঅরবিন্দকে। চারিদিকে আরও ব্যাপক ধর-

পাকড়ের পর শুরু হয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলা। মামলার শুরুতেই নরেন গোস্বামী প্রাণ ভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে হয় রাজসাক্ষী। এ অপরাধে কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু প্রেসিডেন্সী জেলের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে অতি নির্মম ভাবে তাকে হত্যা করে। সেদিনটি ছিল ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর। বিচারের পর কানাইলালের ফাঁসির দিন ধার্য্য হয় ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর আর ২১শে নভেম্বর সত্যেন্দ্র নাথ বসুর। সংসারে মায়ামমতা ও সুখ দুঃখের সাধারণ অনুভূতির বহু উর্দ্ধে থাকে বিপ্লবীর মন। এদের ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ছিল না। তবুও ফাঁসির পূর্বে মর্মোত্থিত শেষ ইচ্ছা আকুল উচ্ছ্বাসে ভগবানের উদ্দেশে বেজে উঠেছে—হে ঈশ্বর, মুক্তিযজ্ঞের এই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা কভু যেন নিভে না যায়– সে যেন শত সহস্র শহীদের আহুতি ও রক্তধারায় লক্ষ লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে বিদেশের এই স্বার্থসর্ব্বস্ব সাম্রাজ্যবাদকে গ্রাস করে। মুক্ত হউক ভারতবর্ষ, যুক্ত হউক আবার খণ্ডিত বঙ্গভূমি, পূর্ণ হউক কবির আন্তরিক শুভেচ্ছা— "বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।"

* * *

রাজার সাক্ষী নরেন গোঁসাই আলিপুর মামলায়,
দেশবাসী শুনে শংকিত চিত, বন্দীরা ভাবনায়।
রাজার পক্ষে সাক্ষ্য কবুলে পুলিসের হয়ে সাথী
দোতালার পরে রোগীদের ঘরে, পালায়েছে রাতারাতি।
সত্যেন আর কানাই-এতে মিলি, দিনরাত কানাকানি,
কি যে কথা হয় মিলি দুজনায়, নাই তার জানাজানি।
অসাধ্য সাধি, বাহিরের সাথে যোগাযোগ পথে শেষে—
হাতিয়ার হাতে হাজির হয়েছে দিনকত পরে এসে।
কানাইয়ের প্রাণে আগুনের দাহ, চপলতা দিয়ে ঢাকা।
ভাবে মনে মনে নাই ক্ষমা নাই, পাই যদি তোর দেখা।
সত্যেন ভাবে শাস্তির ভয়ে হলি শেষে ক্রীতদাস ;
ক্ষমা তোরে কভু করিবে না দেশ, ক্ষমিবে না ইতিহাস।

বহুদিন ধরে হাঁপানীর রোগী, তার উপরে ভুগি জ্বরে—
'সাক্ষ্য কবুল' ছল করে গেল নরেন গোঁসাইর ঘরে।
রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত নিভৃত চারিধার—
কারার রুদ্ধ প্রাচীর আড়ালে জমাট অন্ধকার।
কোটরে কোটরে কয়েদীরা সব নিদ্রায় নিমগন,
জেগে থাকি দেখি, কালের ভ্রূকুটি কেঁপে ওঠে কোন জন।
বদ্ধ বাতাসে কানে ভেসে আসে কার চাপা নিশ্বাস,
নির্মম কাল কুটিল করাল, নিষ্ঠুর পরিহাস।
রাত্রি আঁধার, ধীরে পর পারে গুটায়েছে তার পাখা।
উদয় তোরণে তরুণ তপন আগুনের রঙ মাখা।
দ্রুম্ দ্রুম্ দ্রুম্, শব্দ নিনাদে কেঁপে ওঠে কারাগার,
আর্তনাদের বন্যা প্রবাহ, ওঠে রোল হাহাকার।
নর্দমা পাঁকে নরেন গোঁসাই রক্তে যেতেছে ভাসি
সত্যেন আর কানাইএর মুখে করাল অট্টহাসি।
দংশনাহত বিহঙ্গ ভয়ে যাতনায় ঢলে পড়ে—
দংশনরত ভুজঙ্গ তবু দংশিছে অকাতরে॥
'মরণেরে ভয়, এই পথে তবে কেন এসেছিলি সাথে?
অবিশ্বাসের বিষদাঁত, তোরে তুলে গেনু নিজহাতে।'

তার পর—
বিচারের শেষে, বিচার আদেশে গলায় পরিয়া ফাঁস—
সাগরের দোলে পলকে লুকালো প্রলয় জলোচ্ছ্বাস।

তিন

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে শুরু হয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ আলিপুর বোমার মামলা। মামলার বিচারে ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন (পরবর্তীকালে দেশের কল্যাণে সর্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) দাসের আইনের অকাট্য যুক্তিতে শ্রীঅরবিন্দ নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তিলাভ করেন। এর পূর্বেই তিনি কারার অন্তরালে বসে যোগ সাধনার বলে ব্রহ্মজ্ঞানী; অন্তরে তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যময় আনন্দলোকের বিভূতি ও স্থিতি।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট কলিকাতায় ঋষি অরবিন্দের জন্ম। পূর্বোক্ত রাজনারায়ণ বসু ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ। দার্জ্জিলিং-এর কনভেণ্টে দু'বছর মাত্র পড়ার পর তার পিতা তাকে নিয়ে গেলেন লণ্ডন। ভর্তি হলেন সেখানে সেণ্টপল্‌স স্কুলে। তখন তার বয়স মাত্র সাত বৎসর। ১৭ বছর বয়সে ভর্তি হলেন কেম্ব্রিজের কিংস্‌ কলেজে। ১৮ বছর বয়সে দিলেন আই, সি, এস, পরীক্ষা; অধিকার করলেন দ্বিতীয় স্থান। কিন্তু শেষপর্যন্ত পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ রয়ে গেলেন ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় উপস্থিত না হয়ে। এ সময় কেম্ব্রিজের ভারতীয় ছাত্রদের একটি সমিতি ছিল। সমিতিতে অরবিন্দও ভর্ত্তি হলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ক্ল্যাসিকাল ট্রাইপোজে প্রথম হয়ে অরবিন্দ কেম্ব্রিজের গ্রাজুয়েট হলেন। এ সময় ভারতীয় নানাবিধ পত্র পত্রিকায় বৃটিশ সরকারের অত্যাচার উৎপীড়নের কাহিনী পড়ে পড়ে মন তাঁর ক্রমে ক্রমে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে একটি বৈপ্লবিক সংগঠন, নাম লোটাছ্‌ অ্যাণ্ড ড্যাগার। এর পরে 'আনন্দমঠ'-এর ইংরাজী অনুবাদ পড়ার পর বন্দিনী মায়ের ডাকে সাড়া দিতে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ভারতে ফিরে আসার পর বরোদার রাজকলেজে সহ-অধ্যক্ষের পদে তিনি নিযুক্ত হন। ২১ বছর বয়স অবধি শ্রীঅরবিন্দের ছাত্রজীবন বিলাতে অতিবাহিত হয়েছে। ইউরোপের নানা ভাষা, দর্শন ও সাহিত্যে এই অল্প বয়সেই ছিল তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। অথচ বিলাতী সভ্যতার পোষাকের পারিপাট্য আর নানা চাকচিক্যের কুৎসিত আবিলতা চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে, তাঁর অন্তরকে কোনদিনও স্পর্শ করতে

পারেনি। ভারতে ফিরে আসার পূর্বেই অনন্ত বেদ প্রসূত ঐশীতত্ত্বে তাঁর অন্তর ছিল সমৃদ্ধ। হয়ত ইহা তাঁর জন্মান্তরের যোগসাধনার অমৃতফল।

বরোদায় অবস্থানকালে ভগবদ্গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদের পরিবেশে, তাঁর ঐ মহাভাব আরও জাগ্রত হয়ে ক্রমে পূর্ণতা লাভ করে। অন্তরের উৎস হতে উৎসারিত হয় তখন তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ অনন্ত ঈশ্বর প্রেমের পরিশ্রুত ভক্তিধারা। পরে মন্ত্রশিষ্য হন তিনি বিষ্ণু ভাস্কর লেলে নামক এক পরম যোগীর। তাঁরই সাহচর্য ও উপদেশে শ্রীঅরবিন্দ যোগসাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মানসপটে ফুটে উঠত কেবলই দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ দরিদ্র পীড়িত কোটী কোটী সন্তান সহ কঙ্কালসার দেশমাতৃকার মূর্তি। মাতৃভাবের উন্মাদনায় মুক্তি যজ্ঞের হোতা হয়ে বিপ্লবের রক্তাক্ত পথে তখন চলে তাঁর অভিযান। এ যেন ভাবের মহাসমুদ্র হতে সহসা উত্থিত বিক্ষুব্ধ প্রলয়ের বজ্রবিদ্যুৎ সহ অগ্নি উদ্গিরণ। অথবা এক মহানদীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস, কিছু পথ বয়ে এসে শাখা বিস্তার করে—আবার শেষে মিলে মিশে এক হয়ে যাওয়া।

মুক্তির পর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগর হয়ে চলে গেলেন তিনি পণ্ডিচেরী। ও পথে তখনকার মত তাঁর সঙ্গী হলেন, সুরেশ চক্রবর্তী, বিজয় নাগ, নলিনী গুপ্ত ও সৌরেন বসু। পরবর্তীকালে পণ্ডিচেরীতে আশ্রম ঋষি হয়ে—তখন তিনি আর শুধু ভারতের নন—বিশ্বনিখিলের পরম সম্পদ।

বারীন্দ্রকুমার সহ উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, উল্লাসকর দত্ত প্রভৃতি ষোল জনের হয় দ্বীপান্তর। সাগর আবেষ্টনীর অভ্যন্তরে জঙ্গলাকীর্ণ পরিবেশে বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হয়েও, হাতে পায়ে বেড়ী পরে অসহ্য নির্যাতন ভোগ করা, পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জীবন যাপন। দল বেঁধে এর প্রতিবাদ জানালে আরও ভয়ঙ্কর শাস্তি। কত কয়েদী যায় উন্মাদ পাগল হয়ে, কেউ সুযোগ পেলে করে আত্মহত্যা। বিপ্লবী দলেরও উল্লাসকর দত্ত হয়েছিল বদ্ধ পাগল আর বিপ্লবী ইন্দুভূষণ করেছিল আত্মহত্যা। মৃত্যুদণ্ডের চেয়েও এ আরও নির্মম, আরও কঠোর। তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে অত্যাচারী শাসকের হাতে এই জীবন্ত মৃত্যু—যে ভোগ করেছে, একমাত্র সেই জানে। জল্লাদের চেয়েও নির্মম ছিল তখন আন্দামানের জেলখানার আমলাসম্প্রদায়।

আলিপুর মামলার পূর্বে ব্যাপক ধরপাকড়—বিচারের পর ফাঁসী, দ্বীপান্তর

ও সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ—কিন্তু বিপ্লবীরা এতে একটুও দমল না। কয়েকটা দিনমাত্র লুকিয়ে থেকে আবার ক্রমে সক্রিয় হয়ে উঠল। প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠে প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে, অনুসরণ করল তারা ইংরেজ প্রভুর ভক্ত দেশদ্রোহী সেই সব রাজ কর্ম্মচারীদের, যারা তাদের পথ চলায় প্রতিনিয়ত হল কণ্টকিত বাধা। গ্রেফ্‌তারের জন্য প্রফুল্ল চাকীকে ধাওয়া করার অপরাধে বৌবাজার অঞ্চলে একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে পিস্তলের গুলিতে খতম হল নন্দলাল বন্দোপাধ্যায়। হত্যাকারী মুহূর্তে অদৃশ্য হল আর তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারী, আলিপুর মামলায় সরকার পক্ষের ওকালতি করার অপরাধে পুলিস কোর্টের মধ্যে আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করে অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার পরমানন্দে হাসি মুখে ফাঁসি বরণ করে চারুচন্দ্র বোস নামে দুর্ধর্ষ এক বিপ্লবী। এই ঘটনার ঠিক একবছর পরে ডেপুটি পুলিস-সুপার সামসুল আলামকে হত্যা করে বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তাঁর অপরাধ ছিল বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করা। সামসুল হত্যার ষড়যন্ত্রে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রেফ্‌তার হন। পরবর্তী কালের বালেশ্বর সংগ্রামের তিনি ছিলেন অধিনায়ক। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মিলিত হিন্দু-মুসলমানের দাবী, ঐক্য ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের চাপে ভাঙ্গা বাংলা আবার জোড়া লাগে। কিন্তু প্রজ্বলিত আগুন আর নেবেনা। কিছুদিন চাপা থেকে, সময় বুঝে সহস্র শিখা বিস্তার ক'রে বাসুকীর ক্রুদ্ধ ফণার মত দংশনোদ্যত হয়।

সেদিন হয়েছে মুক্তির তরে মাতৃমন্ত্র লিখা।
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকের বাণী
সুরেন, বিপিন, কত জ্ঞানী গুণী,
প্রাণের আকাশে রবির প্রকাশ, দূর করি কুহেলিকা॥
বাঙ্গালী সেদিন শক্তিমন্ত্রে রক্তকমল করে,
বাঙ্গালী সেদিন ভায়েরে বেঁধেছে বাহু বন্ধন ডোরে।
বনের আড়ালে, পাহাড়ে নগরে,

আহুতি হয়েছে মুক্তি সমরে,
চিতার ভস্মে জাতির ললাটে পরাল জয়ের টীকা ॥
শ্রীঅরবিন্দ বারীন্দ্র আর
রুদ্র বীণার তোলে ঝঙ্কার,
মরণের ডাকে তরুণ অরুণ দলে দলে দিল দেখা।
ফাঁসির মঞ্চে জ্বলে নিভে গেল কত জীবনের শিখা ॥

একবছর দণ্ডভোগের পর মুক্তি পেলেন যতীন্দ্রনাথ (বাঘা যতীন)। বাইরে এসে পূর্ণোদ্যমে আবার তাঁর পূর্বপথে চলার শুরু। কয়েকজন অনুগত বন্ধুর সাহচর্যে ভাঙ্গা দলের যে যেখানে ছিল, সকলকে একত্রিত করে শক্ত মুঠোয় গ্রহণ করলেন বিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রে তাদের পরিচালনার দায়ভার। চাকরী জীবনে তিনি ছিলেন বাংলা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী হুইলার সাহেবের অতি প্রিয়পাত্র। কিন্তু চাকরীসহ সাহেবের এই বিশ্বাস, ভালবাসা, একদিন এক মুহূর্তে ঘুচে গেল। এর একমাত্র কারণ, সরকারী কর্ম্মচারী হয়েও সরকার উচ্ছেদের গুপ্ত প্রচেষ্টা, তাছাড়া সামসুল হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার তিনি ছিলেন আদালতে অপ্রমাণিত প্রথম সারির আসামী।

যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমায় বিষখালি গ্রাম ছিল যতীন্দ্রনাথের পৈতৃক বাসভূমি। শৈশবে মাত্র পাঁচবছর বয়সে হয় তার পিতৃবিয়োগ, সেই থেকে কুষ্টিয়ার কয়া গ্রামে দিদি ও মায়ের সাথে মামাবাড়িতে প্রতিপালিত। পিতার নাম ছিল উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ছাত্রজীবন প্রথম অতিবাহিত হয় কৃষ্ণনগরে, ও পরে শোভাবাজারে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর এফ্. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন, কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বেই তার সরকারী অফিসে চাকুরী হয়ে যায়। পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন বিবাহিত ও সন্তানের পিতা। নিয়মিত যোগাভ্যাস ও ব্যায়াম চর্চার জন্য ইস্পাতের মত দৃঢ় হয়ে গড়ে উঠেছিল তার দেহ ও মন। শিকার করতে গিয়ে, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া গুলিবিদ্ধ ক্রুদ্ধ এক ব্যাঘ্রকে দৈহিক বলে নিধন করে 'বাঘা যতীন' নামে সর্বত্র হন পরিচিত। চাকরী যাওয়ার পর জীবিকা অর্জনের জন্য তিনি ঠিকাদারী ব্যবসা আরম্ভ করেন।

ঠিকাদারী কাজের ফাঁকে, এ সময়ে তাঁর বৈপ্লবিক প্রচারভূমি ছিল নদীয়া, যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুর। সুযোগমত দেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য বাংলার অগ্নিযুগের আকাশে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন অপেক্ষমাণ প্রলয়ঙ্কর-মহাকাল ধূমকেতুর মত।

এই সময় পূর্ণদাসের নেতৃত্বে ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর মহকুমায় লোকচক্ষুর অগোচরে বিরাট এক বৈপ্লবিক দল গড়ে ওঠে। ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল ও অতুলনীয় ছিল ঐ দলের ছেলেদের চরিত্রবল। উক্তদলের একক পরিচালনায় ও অনুশীলনের সহযোগিতায়, ঢাকা, ফরিদপুর অঞ্চলে ধারাবাহিক একের পর এক অনেকগুলি ডাকাতি তৎপরতার সঙ্গে সংঘটিত হয়। কিন্তু বহুমূল্য সোনার গহনা ছিনিয়ে নিতে, বলপ্রয়োগে কোন দিন ভুলেও তারা কোন নারীর অঙ্গ স্পর্শ করেনি। চরিত্রের অসাধারণ নিষ্ঠা ও বলের তারা ছিল মূর্ত প্রতীক। ঐ দলের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কর্মী পরবর্তী জীবনে, কেউবা সর্ব্বত্যাগী সেবক সন্ন্যাসী, কেউ বা মুক্তিযজ্ঞের প্রজলিত অনলে বলিপ্রদত্ত শহীদ। পূর্ণদাস স্বয়ং বিপ্লব যজ্ঞের একনিষ্ঠ পুরোহিত। বিনোদ দাস, ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। সন্ন্যাস জীবনে শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ। কল্যাণ নাগ, হিন্দু মিশনের প্রতিষ্ঠাতা। চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত পরবর্তী কালে বালেশ্বর খণ্ডযুদ্ধে যতীন মুখার্জীর পার্শ্বচর ও শহীদ। আর রাধাচরণ প্রামাণিক, লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অগোচরে তিলে তিলে আত্মত্যাগের এক জলন্ত দৃষ্টান্ত। এদের আদর্শ চরিত্রের কথা, কর্তব্যনিষ্ঠার নানা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—মহানায়ক যতীন মুখার্জীর কিছুই অজানা ছিলনা।

বিপ্লবী পুলিনদাসের নেতৃত্বে ঢাকা অনুশীলন সমিতি এ সময়ে বহু শাখা প্রশাখায় পূর্ববাংলা অতিক্রম করে আসাম ও উত্তর বিহারে প্রসারিত হয়। তাঁর সাথে পূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করে বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলে মতি রায়ের নেতৃত্বে চন্দননগরের প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ। এ সময়ে অনুশীলনের নানা দলগুলির খবর আদান প্রদানের সর্বপ্রধান ঘাঁটি হয়ে ওঠে বাদুড় বাগানের এক বস্তি বাড়ি। ঐ বাড়িতেই তৈরী হত বিপ্লবীদের নানা আলোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্ম্মসূচী। বিপ্লবীদের সকলেরই ছিল ঐ বাড়িতে নিয়মিত যাওয়া আসা।

উক্ত বস্তির গোপন ঘাঁটিতে বসেই একদিন রাসবিহারী বসু, প্রতুল গাঙ্গুলী, শচীন সান্ন্যাল ও শ্রীশচন্দ্র আমেরিকার গদর পার্টির সহযোগিতায়, ভারতব্যাপী বিপ্লবের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। রাসবিহারীর হার্ডিঞ্জ ও গর্ডন হত্যার উদ্যোগপর্বেও ছিল বাদুড় বাগান ও ঢাকা অনুশীলন সমিতির সহযোগিতা। উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার ছিল বাংলাদেশের বোমা এবং বাংলার এক ছেলে—ইস্পাতের মত শক্ত, বজ্রের মত কঠোর, তড়িতের মত ক্ষিপ্র—নাম বসন্ত বিশ্বাস।

এ সময়ে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক হত্যাকাণ্ড ও ডাকাতিগুলির অধিকাংশই সংঘটিত হত পুলিন দাস, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও নরেন সেনের নেতৃত্বে। এ সময়ে ভারতের মাটিতে বসে সর্ব ভারতীয় বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে প্রধান অগ্রণী হলেন রাসবিহারী বসু। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বিপ্লবী মহানায়কের জন্ম। জন্মস্থান হুগলী জেলায়। পৈতৃক নিবাস ছিল বর্দ্ধমানে। চন্দননগরের বৈপ্লবিক আবহাওয়ায় গড়ে ওঠে তার কৈশোরের ছাত্রজীবন। শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে পরে চলে আসেন কলিকাতায়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে দেরাদুনের বনবিভাগে সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন। কিন্তু তার পূর্বে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিরালম্ব স্বামী) সংস্পর্শে আসেন। তাঁর বৈপ্লবিক সংসর্গ ও উপদেশ দেশের মুক্তির জন্য নিষ্কাম সেবক ও আদর্শ সৈনিক হতে তাকে অনুপ্রাণিত করে। চাকুরী জীবনে ১৯০৭ ও ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গোপনে ছদ্মভাবে তিনি বাংলার বিপ্লববাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা রক্ষা করে চলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়ায় তারকনাথ দাসের নেতৃত্বে প্রবাসী ভারতীয়দের এক রাজনৈতিক সঙ্ঘ গড়ে ওঠে। সঙ্ঘের নাম দেওয়া হয়—'ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেণ্ডেন্স লীগ'—উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা। তারকনাথ দাসের পরে, লালা হরদয়াল নামে এক পাঞ্জাবী ঐ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। হরদয়ালের নেতৃত্বে ভারতীয় শ্রমিক ও ছাত্রদের নিয়ে ইনডিয়ান ইনডিপেণ্ডেন্স লীগ এক বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সম্পূর্ণ বৈপ্লবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান 'গদর' দল নামে পরিচিতি লাভ করে। 'গদর' দলের ভাবমূর্ত্তির পরিপূর্ণ

বিকাশে রাসবিহারীর মন মুগ্ধ হয়। এই দলের সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরাজ শাসনের মূলোচ্ছেদ করা। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে বসেই রাসবিহারী 'গদর' দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করেন।

পৃথিবীর আর এক প্রান্তের ভেরির নির্ঘোষ, বাতাসের ভরে মহাসমুদ্র অতিক্রম করে গুরু গম্ভীর আওয়াজে রাসবিহারীর বুকের মাঝে সাড়া দেয়। শুরু হয় অন্ধকার বন্ধুর পথে ভারত পরিক্রমা। উদ্দেশ্য সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান, দলগুলির পরস্পর যোগাযোগ স্থাপন, অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ, গুপ্ত আক্রমণ, নানা কৌশলে ও অস্ত্র বলে ভারতের মাটি থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন। বিপদসংকুল এই পথে রাসবিহারীর সহযাত্রী ও সক্রিয় সহযোগী হলেন শচীন সান্যাল, অমর চাঁদ, আবেদ বিহারী, বাল মুকুন্দ প্রভৃতি বিপ্লবীগণ। প্রচারের উদ্দেশ্যে মুখপত্র হল 'লিবার্টি' নামক ইংরেজী পত্রিকা। পাহাড়ের বাঁধ ভাঙ্গা নদী তরঙ্গের মত প্রবল উচ্ছ্বাসে উন্মাদ, উত্তাল হয়ে ওঠে তাঁর মনের গতি। হেলায় সকল বাধা অতিক্রম করে আজীবন তাঁর মরণ পণে সংকটের এই পথ চলার কখনও বিরাম ছিল না।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ ২৩শে ডিসেম্বর। স্থান দিল্লীর চাঁদনীচক। সপরিষদ বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ধীর মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে। দুধারে মোটাদড়ির শক্ত বেড়াজাল। তার ভিতর দিকে সেপাই বেষ্টনী। আর বাইরে সারিবদ্ধ উৎসাহী লক্ষ জনতার ভীড়। ভীড় বাড়ীর চত্বরে, বারান্দায় ও গাছের শাখায় শাখায়। একপাশে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের বারান্দা, সম্ভ্রান্ত মহিলা ও মেয়েদের জন্য সুরক্ষিত। প্রথম সারিতে সেখানে বসে আছে অপরূপ রূপলাবণ্য ছড়ায়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাত্র পনেরো ষোল বছরের এক কিশোরী। অনুসন্ধিৎসু মহিলাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য নাম বললে লীলাবতী। মিছিল এগিয়ে ব্যাঙ্কবাড়ীর একটুখানি মাত্র দূরে। দর্শকদলের লক্ষ চক্ষু এক লক্ষ্যে গাড়ীর প্রতি অপলক নিবদ্ধ। আর লীলাবতীর শিরায় তখন বিদ্যুৎবহ্নি। উত্তেজনায় দ্রুততালে প্রবাহিত ধমনীর রক্তধারা। সবার অলক্ষ্যে ডান হাতখানি একবার মাত্র র‍্যাপারের বাইরে এলো। বজ্রনিনাদে মুহূর্তে ঘটল বোমার বিস্ফোরণ। গাড়ীতে গেল আগুন ধরে, আহত হলেন বড়লাট। লীলাবতী

অতি সহজ হয়ে আতঙ্কিত মেয়েদের মাঝে মিশে রইলো। তারপর উত্তেজনায় ভোলপাড় দিল্লী শহর অতিক্রম করে সুযোগমত পৌঁছে গেলো তার যথাস্থানে।

দিল্লীর দুঃসাহসিক ঘটনার মাত্র ছ'মাস পরে, অনুরূপ আর এক ঘটনার স্থল লাহোরের লরেন্স উদ্যান। দিন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের সতেরই মে। বাংলার বিপ্লবীদের সন্ধান ব্যর্থ করে, লাহোরে বদলী হয়ে এসেছে গর্ডন সাহেব। সকাল বিকাল সাহেবের বেড়াবার অভ্যাস। অভ্যাসমত ঐ দিনও দেহরক্ষী সহ সাহেব ভ্রমণরত। একটু পরে সেখানে দেখা দিল সাইকেল আরোহী অতি সুন্দর এক তরুণ কিশোর। অপরূপ সুঠাম মজবুত তার দেহের গঠন। পথ সম্পূর্ণ জনমানবহীন—চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। ছেলেটির স্থিরলক্ষ্য সাহেবের মুখের দিকে। সুযোগ বুঝে একটু পরে অল্পদূর থেকে ছুঁড়ে মারল বোমা। বিকট আওয়াজে ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠলো চারদিকের লোকালয়, কিন্তু সন্ধান হল এবারেও ব্যর্থ। সাহেব রইল অক্ষত দেহে, আর তাঁর হতভাগ্য দেহরক্ষী অগ্নিদগ্ধ হয়ে, আর্তনাদে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকিশোর সাইকেল চেপে মুহূর্তে পথের ওপারে হাওয়ায় অদৃশ্য। আর তার সন্ধান পাওয়া গেলনা। তল্লাসী শুরু হয়ে গেলো শহরের ঘরে ঘরে। গোয়েন্দার দাপটে লাহোর, দিল্লী, বাংলা আর একবার তোলপাড় হল। কোনরূপ সূত্রের সন্ধান না পেয়ে, গোয়েন্দা ও পুলিশ বাহিনী কিছুদিনের মত রইল চুপমেরে। এ ঘটনা তখন তলিয়ে রইল নিঝুম অন্ধকারের অতল রহস্য গভীরে।

তারপর ১৯ ৩ খ্রীষ্টাব্দে 'লিবার্টি' পত্রিকায় রাসবিহারীর প্রবন্ধের বিশেষ এক অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘোষণা, কেবলমাত্র মানুষের চেষ্টায় কখনও সম্ভব হয়না,—যদি ঐশী প্রেরণা মহাশক্তি রূপে হৃদয়ে তাঁর আবির্ভূত না হয়। মানুষ কাজ করে একমাত্র অন্তরস্থিত অনন্ত মহাশক্তির নির্দেশে; তিনিই কর্মের সুনির্দিষ্ট পথে হাত ধরে তাকে পথ দেখান। তাঁর নির্দেশে তারই পরিচালিত মানুষ আমরা সাময়িক অধীনস্থ যন্ত্র মাত্র। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল ও সত্যেন বসু, দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন তাহা অনন্ত মহাশক্তির

কণামাত্রের অনুপ্রবেশের ফল। দিল্লীতে হার্ডিঞ্জ সাহেবের উপর যে দুঃসাহসিক বোমা নিক্ষেপ, তাও ঐশী বিধানের বহির্ভূত কোন ঘটনা নয়। মহাশক্তির আধার এই সব শহীদদের প্রতি তখনই হবে প্রকৃত সম্মান দেখানো, যখন মহাচেতনা ও প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, দেশের মুক্তির জন্য, লক্ষ লক্ষ যুবক স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে হোমানলে একের পর এক আহুতি হবে। সারা ভারতের বিক্ষিপ্ত তরুণ সমাজ, তোমরা একত্রিত হও। মুক্তির উদ্দেশ্যে পূর্ববর্তী শহীদদের বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলো। আগ্নেয় গিরি, অথবা মেঘের অন্তরস্থিত বিদ্যুৎ বহ্নির মত একসাথে জ্বলে ওঠো। বিচ্ছিন্ন এক আধটা দিল্লীর ঘটনায় ভারতবর্ষ ইংরেজ দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে না। সামগ্রিক ভাবে সামরিক দল বেঁধে মুক্তির দুর্বার পণে এগিয়ে এসো। ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে, মুক্তির পথে, বীরের রথের সারথি হন যুগে যুগে ভগবান স্বয়ং। ঐশী শক্তি তোমাদের পথ-প্রদর্শক হউক—বন্দেমাতরম্।

রাসবিহারীর এই ব্যাকুল আহ্বান, প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে রাজশক্তির দৃষ্টি-সীমা অতিক্রম করে, সারা ভারতে বিপ্লবীদের অন্তরে চেতনা জাগিয়েছে।

আমেরিকা থেকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'গদর' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রতিবেদন : তোমার নাম কি ?—বিপ্লবী। তোমার কাজ কি ?—বিপ্লব। কোথায় তুমি জ্বলে উঠবে ?—ভারতবর্ষে। তোমার জ্বলে ওঠার কারণ ? কারণ ইংরাজ প্রভুদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ আমরা চল্লিশ কোটী ভারতবাসী। তার মধ্যে ত্রিশ কোটী মানুষ হয়েও অশিক্ষার অন্ধকারে, অনাহারে তাচ্ছিল্যের লাথি খেয়ে পশু অপেক্ষাও ঘৃণ্য জীবন যাপন করে। আমি এর আমূল পরিবর্তন চাই। যদি প্রবল ফুৎকারে নিভে যাও ? আবার প্রলয়ের দ্বিগুণ তেজে জ্বলে উঠবো,—আমার অভীষ্ট যতদিনে সিদ্ধ না হয়। একাজে তোমার চাই কি ? চাই উৎসাহী সৈনিক ; চাই তেমন ছেলে, মায়ের ডাকে মুক্তি যজ্ঞে হেলায় যে জীবন উৎসর্গ করতে পারে। তার প্রাপ্য জীবন আহুতির বিনিময়ে অখণ্ড হিন্দুস্থানের চিরদাসত্ব মোচন। সকলের ঐক্য ও প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে শোষণহীন সমাজের দ্বার উন্মোচন।

হিন্দী, উর্দু, গুরুমুখী ও বাংলা ভাষায় একই সময়ে গুপ্তপথে প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা। প্রচারিত হয় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ও প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে

চীন, জাপান সহ দক্ষিণ পূর্ব এসিয়ার প্রায় সর্বত্র। তার এই আন্তরিক আহ্বানে সেদিন প্রবাসী ভারতীয়রাও দল বেঁধে সাড়া দেয়। তার বিশেষ বশেষ স্থানগুলি হচ্ছে বাটাভিয়া, হং কং, সাংহাই, সিঙ্গাপুর, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ, বার্ম্মা, সিঙ্গাপুর থেকে কাবুল,—আর একদিকে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো থেকে জার্ম্মানী অবধি, গোপন বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র সুযোগের অপেক্ষায় তখন দিন গোনে। ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে সারাভারত জুড়ে যেন গুপ্ত ষড়যন্ত্র অদৃশ্য পাখা মেলে বিচরণ করে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সারা আকাশ জুড়ে যেন এক মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বাভাষ। সন্দেহের বশে শুরু হয় তখন বেপরোয়া খানাতল্লাসী ও গ্রেফ্‌তার। আচমকা খানাতল্লাসী হয় একদিন রাজাবাজারের অমৃত হাজরার বাসগৃহ। অস্ত্রশস্ত্র কিছুই পাওয়া গেলোনা; পাওয়া গেল শুধু অতি অল্প কথায় গোপন তত্ত্বের এক সাংকেতিক চিঠি। তার পাঠোদ্ধারের পর দেরাদুনের গোপন স্থানে হানা দিয়ে গ্রেফ্‌তার করা হল আবেদ বিহারী, বলরাজ, বাল মুকুন্দ, দীননাথ ও বসন্ত বিশ্বাসকে। কিন্তু পলাতক রাসবিহারীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলনা। কিছুদিন পরে দীননাথ হল রাজসাক্ষী। তার কাছ থেকে দিল্লীতে হার্ডিঞ্জ ও লাহোরে গর্ডন হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া গেল। আবিষ্কৃত হল দিল্লীর লীলাবতী ও লাহোরের সাইকেল আরোহী অগ্নি কিশোর অভিন্ন, নাম বসন্ত বিশ্বাস। মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষুদিরামের মত বাংলার আর এক তরুণ কিশোর। আবিষ্কৃত হল সুদূর আমেরিকায় লালা হরদয়াল প্রতিষ্ঠিত 'গদর' পার্টির সাথে—বাংলার 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলের মিলন ঘটিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সমূলে ধ্বংসের প্রচেষ্টা। বিচারের পর বলরাজের দ্বীপান্তর, আর বসন্ত বিশ্বাস সহ বাল মুকুন্দ ও আবেদ বিহারীর হলো ফাঁসির হুকুম। কিন্তু রহস্যময় রাসবিহারীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলনা। ভারতের সর্বত্র জালবিস্তার করে, ধরা-পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে পুলিশের চোখে ধুলো দেয়। হয় সে তখন দুর্গন্ধময় ক্লেদাক্ত শরীর মলমূত্র বহনকারী মেথর, নয়তো বা অতি কুৎসিত বীভৎস রোগক্লিষ্ট এক ব্যক্তি, যাকে দেখলে মানুষ ভয়ে, আতঙ্কে শিউরে ওঠে। সাক্ষাৎ যমদূত গোয়েন্দা ও পুলিশের সাথে বহুরূপী রাসবিহারীর বহুদিন চলে এই ভাবে লুকোচুরির খেলা।

রাসবিহারীর চলার গতিবিধি অনুমান করে পথে পথে ফাঁদ পাতা হল। চতুর ও অতি সতর্ক রাসবিহারী ভুল করেও সে পথে পা দিলেন না। তাঁকে ধরার জন্য সর্বত্র মোটা টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হল। পুরস্কার ও পদোন্নতির আশায় পুলিশ গোয়েন্দা যখন দিল্লী, লাহোর ও কলকাতার জনারণ্যে, হন্যে হয়ে রাসবিহারীকে খুঁজে বেড়ায়,—বারানসীতে গড়ে ওঠে তখন তাঁর সর্বাপেক্ষা-বৃহৎ বৈপ্লবিক ঘাঁটি; সর্বক্ষণের সাথী ও সহকর্মী সেখানে শচীন সান্ন্যাল। তাঁর আন্তরিক ডাকে সাড়া দিয়ে বাইরে থেকে এসে তাঁর সাথে যোগ দিয়েছে কর্তার সিং ও ভি, সি, পিঙ্গলে। চলার দুর্গম পথে সহযাত্রী হয়ে ছায়ার মত হল তারা তাঁর অনুগামী। দল বেঁধে এ সময়ে 'গদর' দলের বিপ্লবী শিখ সম্প্রদায় ভারতে এসে, দ্বিধাহীন চিত্তে রাসবিহারীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। উত্তর ভারতের প্রতিটি বিপ্লবী সংস্থা তাঁর নেতৃত্বে মুক্তি সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ সংহত ও একটি সূত্রে গ্রথিত হয়। নব উদ্যমে শুরু হয়ে যায় সেখানে ব্রিটিশ অধীনস্থ সৈন্য শিবির গুলিতে গোপন অনুপ্রবেশের কাজ। শিবির গুলির মোট সৈন্য সংখ্যা নিরুপিত হয় পিঙ্গলে, কর্তার সিং ও শচীন সান্ন্যালের সহযোগিতায়। এরপর শুরু হয় ভিতরে জোর গোপন প্রচার। নির্ভীক এক দল সৈন্য স্বাধীনতা লাভের অদম্য উৎসাহে প্রচার কার্যে যোগ দেয়, ও ঠিক সময়ে রাসবিহারীর হুকুম তামিলের প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করে।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইউরোপের রণকোলাহলে মুখরিত হয়ে ওঠে পৃথিবীর আকাশ বাতাস। রণক্ষেত্রে মুখোমুখি অবতীর্ণ ইউরোপের দুই দেশ—দুই বৃহৎ শক্তি ইংল্যাণ্ড এবং জার্ম্মানী। ইতিহাসের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ভারত থেকে ইংরেজদের সমূলে উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে জার্মানী থেকে অস্ত্র ও প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য তথাকার ভারতীয় বিপ্লবীদের মুখপাত্র মহেন্দ্র-প্রতাপের সাথে জার্ম্মান সরকারের এক অস্ত্রচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গোপন সূত্রে বাংলায় এ সংবাদ পৌঁছানোমাত্র বাংলার বিপ্লবী মহানায়ক যতীন মুখার্জী (বাঘাযতীন) এই চুক্তির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলনের' সহযোগিতায় যুদ্ধের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করেন। আর রাসবিহারীর নেতৃত্বে ভারতের উত্তরাংশের পূর্ব পশ্চিম সহ বিরাট অঞ্চলে, জনসংযোগ ও সংগঠনের জন্য বিশেষ স্থানগুলি নির্ণয়ের পর, নিম্নলিখিত

বিপ্লবীদের পরিচালনাধীনে আনা হয়। ধারাবাহিক তাদের নাম—শচীন-সান্ন্যাল, ভি, সি, পিঙ্গলে, কর্তার সিং সারাব, প্রতাপ সিং, ভাই পরমানন্দ, পণ্ডিত পরমানন্দ, রামশরণ দাস, দামোদর স্বরূপ, বিনায়ক রাও, গিরিজা বাবু, প্রিয়নাথ বাবু, বিভূতি বাবু এবং হৃদেরাম।

রাসবিহারীর অভিনব প্রচার কৌশলে মুক্তির অদম্য উৎসাহে পঁয়ত্রিশটি সৈন্যশিবির নির্ণীত সময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ভারতে তখন মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ সৈন্যদের একসাথে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত তারা। সাড়া দেয় ঝিলাম, হাতিমর্দন, রাওল পিণ্ডি ও পেশোয়ারের সৈন্যশিবিরগুলি। আগ্রহে দিন গোনে, কপূর্রতলা, মীরাট, আগ্রা, ঝুলান্ধার, এলাহাবাদ, বারানসী ও লক্ষ্ণৌ রেজিমেণ্টের ব্রিটিশ কম্যাণ্ডারের অধীনস্থ ভারতীয় বিরাট সৈন্যবাহিনী। একদিকে কোহাট থেকে ডেকান, আর পেশোয়ার থেকে জব্বলপুর, এর ভিতরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আয়োজন যখন সম্পূর্ণ সমাপ্ত,—পরিচালনার জন্য লাহোর হল তখন সর্বাধিনায়ক রাসবিহারীর কেন্দ্রীয় হেড্ কোয়ার্টার। বোমা ও গুলি গোলা নির্মাণের জন্য পাঞ্জাবের নিভৃত গ্রামাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হল দু'টি কারখানা। দিনরাত কাজ ক'রে সেখানে উৎপাদনের ব্যবস্থা। একপ্রান্ত বার্মা, সিঙ্গাপুর, আর অপর প্রান্ত আফগানিস্থান থেকে এলো আক্রমণের পূর্বে অর্থ ও সৈন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। এরপর আক্রমণের নির্দিষ্ট দিন ধার্য হল ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী। রাত্রি যোগে ঐ দিন ভারতে অবশিষ্ট অত্যল্প সংখ্যক ইংরেজ সৈন্যদের হাতে হাতকড়ি পরানোর নির্দেশ। ঐ দিন ঐ শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় প্রতিটি শিবিরে তখন হাজার হাজার সৈনিক উৎসাহে আগ্রহে অপেক্ষমান। অল্প কয়েকটি দিন মাত্র তার বাকী, কল্পনার ও স্বপ্নের অখণ্ড ভারত, মুক্ত হয়ে চল্লিশ কোটী সন্তানের চোখের সম্মুখে বাস্তব সত্যে মূর্ত হয়ে উঠবে।

কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে, যুগ যুগ পরাধীন ভারতে চিরকালের যে ধারা চলে এসেছে, জাতির চরম দুর্ভাগ্যের জন্য এবারেও তার কোন ব্যতিক্রম ঘটল না। কৃপাল সিং ও নবাব খান নামক বিশ্বাসঘাতক দুই গুপ্তচর স্বার্থ-প্রণোদিত হয়ে ব্রিটিশ হাই কম্যাণ্ডের এজলাসে এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ প্রকাশ করে দিল। ফাঁস করে দিল এর পটভূমিকায় প্রধান নায়ক

রাসবিহারীর দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর পরিকল্পনার আদ্যোপান্ত ইতিহাস। সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে হাতকড়ি লাগাবার পালা। রাসবিহারীর কানে তৎক্ষণাৎ এ খবর বাতাসের ভরে গিয়ে পৌঁছালো। অমনি তারিখ দুদিন এগিয়ে দিয়ে আর একবার মরিয়া হয়ে শেষ চেষ্টায় সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন রাসবিহারী। কিন্তু ঐ বিশ্বাসঘাতকদের তৎপরতায় আর তা সম্ভব হল না। নিরুপায় রাসবিহারী নির্দেশ দিলেন তখন শিবির ছেড়ে সমস্ত সৈন্যদের পালিয়ে যেতে। তাও তখন আর সম্ভব হলনা। স্থানে স্থানে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠলো। ফিরোজপুরে পঞ্চাশজন সম্মুখ সমরে একসাথে দিল জীবন আহুতি। আর গুলিবিদ্ধ আহত অবস্থায় একশ' জনকে গ্রেফ্‌তার করা হল। কিন্তু ঐ নির্দিষ্ট দিন ২:শে ফেব্রুয়ারী বিদ্রোহের আগুন সিঙ্গাপুরে প্রবলভাবে জ্বলে উঠলো। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে সিঙ্গাপুর পঁয়ত্রিশ নম্বর শিবিরের বিদ্রোহী শিখ ও মুসলিম সিপাহীদের সম্পূর্ণ অধীনস্থ রইল। বাইরে থেকে সৈন্য এনে, প্রবল আক্রমণে শেষপর্যন্ত সিঙ্গাপুর উদ্ধার করা হয়। সৈনিক আদালতের বিচারে বিদ্রোহী সৈন্যদের অনেকেরই হল প্রাণদণ্ড।

এ সময়ের মাইকেল ডায়ার সাহেবের এক বিবৃতির অনুবাদ—"বিদ্রোহীদের সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটির চারটি বড় বড় ঘরে একসাথে হানা দেয় আমাদের অসমসাহসী গোয়েন্দা প্রধান লিয়াকত হায়াৎখান ও মিষ্টার এল, এল, টমকিল। বন্দুক, বোমা ও বোমা তৈরীর সরঞ্জাম, নানাভাষায় লিখিত বৈপ্লবিক প্রচার পত্র ও তেরঙ্গা ঝাণ্ডা সহ ১৩ জন দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে বিনা প্রতিরোধেই ওখানে তারা গ্রেফ্‌তার করে। দুর্ভাগ্য আমাদের রাসবিহারী ও পিঙ্গলেকে অনেক খুঁজেও পাওয়া গেলনা।"

পিঙ্গলেকে এর দুই সপ্তাহ পরে মীরাটে বহু বোমা ও অস্ত্রশস্ত্র সহ গ্রেফ্‌তার করা হয়। নলিনী মুখার্জী গ্রেফ্‌তার হন জব্বলপুরে। পর পর নানা স্থান থেকে ২৫১ জনকে গ্রেফ্‌তার করে সামরিক আদালতে শুরু হয়ে গেল তাদের বিচার। বিচারে বিয়াল্লিশ জন বিদ্রোহীর হল প্রাণদণ্ড। একশচৌদ্দ জনের হল দীপান্তর, তিরানব্বই জনের সশ্রম কারাদণ্ড। বিয়াল্লিশ জনকে বেকসুর মুক্তি দেওয়া হল। কিন্তু সারা ভারত তন্ন তন্ন

করে খুঁজে পাওয়া গেলনা বাংলার দুর্ধর্ষ বিপ্লবী রাসবিহারীর কোন সন্ধান।

অভাবিত এতবড় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে অনেক মহাবীরের অন্তর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু ইস্পাতের চেয়েও কঠিন উপাদানে গড়া রাসবিহারীর মনোবল। ঐখান থেকেই নবোদ্যমে আবার তার পথ চলার শুরু। অন্ধকারের নিবিড় অন্তরালে পথের সহস্র বাধা অতিক্রম করে নিরাপদে অপ্রত্যাশিত ভাবে পৌঁছালেন এসে একদিন বৈপ্লবিক পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে, তার বাল্য ও কৈশোরের চিরমধুর উপবন চন্দননগরে। বন্ধুদের অনেকেই তাঁর অতন্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত রইল। কোথাও ধরা না পড়ে পালিয়ে এসেছেন শচীন সান্ন্যাল ও গিরিজাবাবুও। রাসবিহারীর সাথে তাদের দেখা হল চন্দননগরে। বাইরে সর্ব্বত্র সর্বদা অনুসন্ধানরত গোয়েন্দাবাহিনী। সারা ভারতে পাতা জাল গুটিয়ে চন্দননগরের দিকে এগিয়ে আসবে। বেশীদিন এখানে থাকা সম্ভব নহে। ইংরেজের হাতে ফাঁসি যাওয়ার পূর্বে এখনও একটি প্রশস্ত পথ খোলা আছে—ভারত থেকে বাইরে পালিয়ে যাওয়া, আর নিরাপদে সেখানে পা রেখে ভারতের মুক্তি সংগ্রামকে, মহাযুদ্ধের সুযোগে বৈদেশিক অস্ত্র ও অর্থ সাহায্য এগিয়ে দেওয়া। এই কথা চিন্তা করে পি, এন, টেগোর এই ছদ্মনামে জাহাজে জাপান পাড়ি দেওয়ার ছাড়পত্র সংগ্রহ করলেন রাসবিহারী। দিন ধার্য হল ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে। খিদিরপুর ডকের বারো নম্বর জেটী থেকে জাপানগামী জাহাজ,—নাম 'সানুকী মারু'। সেদিনও যথাস্থানে যথা কালে তাকে পৌঁছে দিয়ে এলেন শচীন সান্ন্যাল ও গিরিজাবাবু। বিদায় সম্ভাষণের পরেও, আবার দুজনকে আলিঙ্গন করে বার বার বলে গেলেন—"অতি সাবধানে থেকে কাজের ধারা সাধ্যমত অক্ষুন্ন রেখো। দুঃখ, বিপদ প্রতি মুহূর্তে আসবে, কিন্তু বিচলিত হয়োনা। ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই স্বাধীন হবে। কিন্তু আমি আর ফিরে আসবো কিনা জানিনা। এই নাও দুইজনে আমার ভালবাসার দুটি প্রীতি নিদর্শন।"—এইবলে দুজনের হাতে তুলে দিলেন দুটি রিভলবার। ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে উর্দ্ধের আকাশ পথে তখন ঘন ঘন বজ্র নিনাদ। কড় কড় শব্দে প্রকৃতির বুক চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে, নামল বৃষ্টি জলের অবিশ্রান্ত ধারা। শচীন সান্ন্যালের চোখ দুটি কান্নায় জলে ভরে

উঠলো। রাসবিহারী তার চিবুক স্পর্শ করে বললেন,—"বিচলিত হয়োনা।" হাসিমুখে আর একবার শুধু বললেন,—"আসি তাহলে"! তারপর যে যার গন্তব্য পথে ধীরে ধীরে চলে গেল।

রাসবিহারীর জাপানে আসার পর জাপানের যুবরাজের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। পরিচয় পরে বন্ধুত্বে পরিণত হয়। রাসবিহারী তার ভারত ত্যাগের কারণ, ও উদ্দেশ্য অকপটে যুবরাজের নিকট ব্যক্ত করেন। পরাধীন দেশের মুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে, পরাভূত ও পলাতক এক সৈনিকের অন্তরের মর্মজ্বালা ও দুর্বার স্বাধীনতার আকাঙ্খার পরিচয় পেয়ে, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় রাজকুমার রাসবিহারীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। অল্পদিনের ভিতর চীনের সান ইয়াট সেন-এর সঙ্গেও তার পরিচয় ঘটে। এখানেও উদ্দেশ্য, ভারতের মুক্তির জন্য সক্রিয় সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি আদায়। এ সময়ে 'গদর' দলের ভাই ভগবান সিং টোকিওতে এসে রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিত হন।

তারপর দুজনে একত্রে সাংহাই যাত্রা করেন,—উদ্দেশ্য তথাকার জার্ম্মানীর রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ভারতের চুক্তিমত অস্ত্র-পাচারের ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ২৭ শে নভেম্বর সাংহাইএ এক প্রকাশ্য সভায়, ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে মুক্তি সংগ্রামের জন্য আন্তরিক আবেদন ব্রিটিশ গুপ্তচর বাহিনীর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিচার বিশ্লেষণের পর এই সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হয়,—ছাড়পত্রের মাধ্যমে জাপান ভ্রমণে আসা পি, এন, ঠাকুর, ও ভারতে ধরা না পড়া পলাতক রাসবিহারী অভিন্ন।

* * *

অগ্নিযুগের অন্তরভেদি বাহিরি বহ্নিশিখা,
তরুণের প্রাণে আগুন জ্বালালো,
পাহাড় টলালো, সাগর দোলালো,
মরণ ভুলায়ে ফাঁসির মঞ্চে পরাল জয়ের টিকা।

হোমানল শিখা জ্বলে নিবে গেছে
মিলিবেনা তার দেখা।

মুক্তি সংগ্রাম

কাহিনী তাহার এই মহাদেশে,
কীর্তি পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
অরণ্যছায়, পাষাণ কারায় রক্তে রয়েছে লিখা।
দু'পায়ে দলিয়া জীবন মরণ,
ভাঙ্গিয়া গড়িল এ জাতির মন,
হৃদয় গহনে এঁকে রেখে গেল স্মৃতির অরুণ রেখা।
রাত্রি যখন নিশুতি নিঝুম,
পৃথিবীর চোখে নেমে আসে ঘুম,
আঁধারের কোলে মেঘ দলে দলে কোথা হতে আসে ভেসে।
ইঙ্গিতে তার নেচে হয় সারা,
বরষে অনল সঙ্গীত ধারা,
রজনীর শেষে উষার বাতাসে সুদূর আকাশে মেশে।

ফুকারি উঠিল নিনাদ করালে একদা কালের বাঁশী,
নয়নের কোণে আগুন নেহারি,
দিক্ দিগন্ত উঠিল শিহরি,
চলচঞ্চল পথিক ভাবিল এ কোন সর্বনাশী।
কে এ মহাকাল ভ্রূকুটীভয়াল খল খল মুখে হাসি,
ধক্ ধক্ জ্বলে বহ্নি নয়ন,
তাণ্ডবে ত্রাসে কাঁপে ত্রিভুবন,
নিশ্বাসে বহে সন্ সন্ ঝড় বৈশাখী এলোকেশী।
মুক্তির পণে রণ-উন্মাদ, বহুরূপী নানাভাষী।

চার

পৃথিবীতে বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায়, ইয়োরোপের প্রধান দেশগুলির ভোগসর্বস্ব নীতির পরিবেশে ক্রমে যখন দানা বেঁধে ওঠে একের প্রতি অপরের সন্দেহ ও অবিশ্বাস, আর তার ফলে দল ভাগ হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস, তাতে তখন মুখোমুখি তুই প্রধান—ব্রিটেন ও জারমানী। এ সংবাদ ভারতে আসা মাত্র, শচীন সান্যালের সাহচর্য্যে যতীন মুখার্জী ও রাসবিহারী বসুর কাশীতে এক বৈঠক বসে। কারণ তুজনেরই প্রাণপণ প্রচেষ্টা জারমানীর অস্ত্র সাহায্যে দেশকে মুক্ত করার। যতীন মুখার্জী কলকাতায় ফিরে এলেন। তার পর দ্বিগুণ উদ্যমে সুরু হলো আবার সংগ্রামের পথে তার পদ পরিক্রমার।

যুদ্ধ আরম্ভের সাথে সাথে যতীন মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলার বিপ্লবীরা সবাই মিলিত হয়ে তাঁর নির্দেশে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মহানায়ক যতীন মুখার্জী, তার কাছে সর্বদা থেকে কাজ করার জন্য পূর্ণ দাসের কাছে জন চারেক পার্শ্বচর চাইলেন। পূর্ণ দাস অতুলকৃষ্ণ ঘোষের সাহচর্যে তার কাছে পাঠিয়ে দিলেন চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন ও রাধাচরণ প্রামাণিককে। জার্ম্মানীর অস্ত্র সাহায্যে বাংলায় সর্ব্বাগ্রে ব্রিটিশ শক্তিকে নির্মূল করার জন্য, গোপনে আয়োজন পর্বে মেতে উঠলেন বাঘা যতীন। ইংরেজ সৈন্য সারা ভারতবর্ষে তখন সংখ্যায় ছিল অত্যল্প। অভাবনীয় নানা শুভ যোগাযোগ। একটাও তার উপেক্ষা করলে চলবেনা। চাই অর্থ ও অস্ত্রবল। বড় বড় ডাকাতির মাধ্যমে নূতন করে শুরু হয়ে গেল সারা বাংলায় অর্থ সংগ্রহের পালা, আর প্রতিনিয়ত পথ চলার বাধাগুলিকে অপসারণের কাজ।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট, 'রডা' কোম্পানীর কুড়ি বাক্স মাউজার পিস্তল হাজার হাজার গুলি সহ গায়েব হয়ে যতীন মুখার্জীর হাতে এলো। সারা বাংলাদেশের বিপ্লবীদের হাতে সেগুলি তিনি বিলিয়ে দিলেন। এভাবে মুখোমুখি সম্মুখ খণ্ড-যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করা হল।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী হল গার্ডেনরীচের ডাকাতি। লুট হল একসাথে আঠার হাজার টাকা। তার পরের ডাকাতি মাত্র দশদিনের মধ্যে

বেলেঘাটায়। লুট হল একসাথে বাইশ হাজার টাকা। সন্দেহের বশে বহু বিপ্লবী গ্রেফ্‌তার হল। রেহাই পেলেননা যতীন মুখার্জীর একান্ত পার্শ্বচর নরেন ভট্টাচার্য ও রাধাচরণ। তারা দুজনেই ছিলেন প্রকৃত আসামী। দলের নায়ক ছিলেন স্বয়ং নরেন ভট্টাচার্য। অথচ জার্মান অস্ত্র সম্ভার হস্তগত করে তাড়াতাড়ি পাঠানোর জন্য নরেন ভট্টাচার্যের গোপনে বাটাভিয়ায় চলে যাওয়া তখন ছিল একান্ত প্রয়োজন। পূর্ণদাস তখন ফরিদপুরের জেলে। মহানায়ক যতীন মুখার্জীর নির্দেশে পূর্ণ দাস ও তার প্রত্যেক সহকর্মী, দেশের মুক্তির জন্য মৃত্যু বরণ কোন ছার, নরকে পড়ে তিলে তিলে দগ্ধ হতেও কুণ্ঠিত হতনা। রাধাচরণ তাদেরই একজন আর তাই ছিল তার অদৃষ্টের লিখন। ফরিদপুর জেল থেকে আসা পূর্ণ দাসের পূর্ণ সম্মতিতে ও যতীন মুখার্জীর নির্দেশে রাধাচরণ হলেন রাজসাক্ষী। মামলার যিনি প্রধান সাক্ষী তিনি নিজেই প্রধান আসামী। সকলের নাম স্বীকার করে অস্বীকার করলেন শুধু পরিচালক নরেন ভট্টাচার্যের নাম। এতে রাধাচরণের হল আট বছর কারাদণ্ড আর মুক্তি পেলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তারপর এ কাজের জন্য অন্যান্য বিপ্লবীদের শ্লেষ, বিদ্রূপ ও অশ্রাব্য টিট্‌কারিতে রাধাচরণের বন্দী জীবন হয়ে উঠলো দুর্বিষহ। নিজের অজ্ঞাতে দেহ তার তিলে তিলে ক্ষয় হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়ে, জেলখানাতেই তার মৃত্যু ঘটে। দেশের মুক্তির জন্য এই মহান ত্যাগের সাক্ষী হয়ে রইলেন শুধু নরেন ভট্টাচার্য, যতীন মুখার্জী, পূর্ণ দাস এবং ঈশ্বর স্বয়ং।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যখন গার্ডেনরীচ ডাকাতির দায়ে কারারুদ্ধ, জিতেন মুখোপাধ্যায় নামে এক ইউরোপ প্রবাসী বম্বে এসে স'থে সাথে যতীন মুখার্জীকে খবর দেয়,—অবিলম্বে বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে বাটাভিয়ায় একজন সুদক্ষ প্রতিনিধি পাঠানোর একান্ত প্রয়োজন। কারণ অস্ত্র আমদানির জন্য জার্মান প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগ ও পরিষ্কার কথাবার্তার মাধ্যমেই এই সুযোগ সফল হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই উদ্দেশ্যে নরেনকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করতে, রাধাচরণ এইভাবে বলিপ্রদত্ত হলেন। রাধাচরণ ছিলেন পূর্ণদাসের গ্রামবাসী ও আবাল্য সহচর।

মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নরেন্দ্রনাথ সি, মারটিন্ এই ছদ্মনামে বাটাভিয়ায় গিয়ে জর্মান কনসাল থিয়োডোরের নিকট তার পরিচয় পত্র পেশ করেন।

হেল্‌ফিস্ নামে জনৈক জার্মান অফিসারের সঙ্গে থিয়োডোর তার পরিচয় করিয়ে দেন। হেলফিস্ জানালেন যে, অস্ত্র বোঝাই এক জাহাজ ইতিপূর্ব্বেই করাচী বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। জাহাজের নাম এস্‌. এস্‌. মেভারিক। যাত্রা করেছে ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান্ পেড্রো বন্দর থেকে। মার্টিন (নরেন্দ্রনাথ) সে জাহাজ বঙ্গোপসাগরের দিকে ঘুরিয়ে দিতে বিশেষ অনুরোধ জানালেন। তখন লিখিতভাবে এই প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পাঠান হল সাংহাইয়ে জার্মানীর কনসাল্ জেনারেলের নিকট। এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ তিনি অনুমোদন করে বাটাভিয়ায় পাঠিয়ে দেন। এরপর মার্টিন্ (নরেন্দ্রনাথ) সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নামক স্থানে জাহাজ ভিড়ানো ও অস্ত্রশস্ত্র নামানোর বন্দোবস্ত পাকা করেন। নরেন্দ্রনাথের বাটাভিয়ায় যাত্রার পূর্ব্বেই, ওখান থেকে সংবাদ সরবরাহের উদ্দেশ্যে 'হ্যারি অ্যাণ্ড সন্স' নামে এক ভুয়া কোম্পানীকে দাঁড় করানো হয়। বাটাভিয়া থেকে উক্ত ঠিকানায় তারপর আসে মার্টিনের টেলিগ্রাম—"সংবাদ আশাপ্রদ।" প্রত্যুত্তরে ঐ প্রতিষ্ঠান তাড়াতাড়ি টাকা পাঠানোর জন্য মার্টিনকে টেলিগ্রাফ্‌ করে। উক্ত টেলিগ্রাফের প্রত্যুত্তরে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন, জুলাই ও আগষ্টের ভিতর, পরপর ৪৩ হাজার টাকা এসে পৌঁছায় ঐ ঝুটা কোম্পানীর ঠিকানায়। এর ৩২ হাজার টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হবার পর ঐ ঝুটা কোম্পানীকে পুলিশ আবিষ্কার করে। জুন মাসের মাঝামাঝি উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ সফলকাম নরেন্দ্রনাথ নিরাপদে ফিরে আসেন কোলকাতায়। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে ও স্থানে জাহাজ পৌঁছানোর ছয় মাস পূর্ব্বেই কোলকাতা ত্যাগ করে যতীন মুখার্জীকে বালেশ্বর হয়ে যেতে হয় ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের কোপ্তি পোদার মহুলডিহা গ্রামে। কারণ তার পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে অতর্কিতে হানা দিয়ে আই বি, ইনস্‌পেক্টর নীরদ হালদার, চিত্তপ্রিয়ের গুলিতে আহত ও তার কদিন পরে হেদোর দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে সুরেশ মুখার্জী নির্ম্মম-ভাবে নিহত হবার পর, কোলকাতার শহর আর তাকে নিরাপদে লুকিয়ে রাখতে পারেনা। পূর্ব্বোক্ত মার্টিন এ্যাণ্ড হ্যারিসের অধীনে বালেশ্বরে 'ইউনিভারসাল এম্পোরিয়াম্' নামে এক সাইকেল দোকান প্রতিষ্ঠিত হ'ল। বিপ্লবীদের সাথে সংবাদ আদান-প্রদান ও গোপন পরামর্শের কোপ্তিপোদাই হয় তখন সাময়িক সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটি। আর চিত্তপ্রিয়, নীরেন, মনোরঞ্জন ও জ্যোতিষের সাথে

যতীন মুখার্জীর গড়ে ওঠে আরও একটা ঘাঁটি ওখান থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণে তালডিহার অরণ্য অঞ্চলে।

পরিকল্পনা ছিল রসদ ও সৈন্য-চলাচলের পথ অচল করে দিয়ে, মাদ্রাজ-গামী রেলপথ ধ্বংস করা। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব পশ্চিমের উপকূল বরাবর দক্ষিণ দিক থেকে এগিয়ে এসে, সমগ্রবাংলাদেশ জয় করার। পরিকল্পনাকে এগিয়ে নেওয়ার পথে তার নির্ভরশীল পারিষদ বর্গ ও সহকর্মী ছিলেন যদুগোপাল মুখার্জী, ভোলানাথ চ্যাটার্জী, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হরি চক্রবর্তী, নরেন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। আগ্রহে সহযোগিতার অপেক্ষায় ছিল সারাবাংলার বিপ্লবী-সমাজ ও শিক্ষিত জনসাধারণ। মেভারিক জাহাজ পৌঁছাবার নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায় আগ্রহে দিন গোনেন যতীন মুখার্জী ও তাঁর সহকর্মীরা। তারপর অনিশ্চিত আশংকায় রাতদিন অতন্দ্র জেগে থাকেন। কিন্তু বিপদের ভয়ে জাহাজ ইতিপূর্ব্বে তার গন্তব্যস্থানে ভিন্ন পথে পাড়ি দিয়েছে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে আর সে ফিরে এলোনা।—আর তার বদলে কোলকাতার লালবাজার থেকে এলো বিখ্যাত টেগার্ট সাহেব বিপুল সেনা বাহিনী নিয়ে। তার সাথে এল উড়িষ্যার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিল্‌ভি ও কমাণ্ডান্ট মিঃ রেদার হোর্ড সাহেব। এর পরের কাহিনী দেশের মুক্তির জন্য সম্মুখ-সমরে আত্মাহুতির জলন্ত দৃষ্টান্ত—ইতিহাস প্রসিদ্ধ অগ্নিদীপ্ত বালেশ্বর সংগ্রাম।

বন্ধুগণ, মুক্তির সহায় হয়ে
ধেয়ে আসে নানা অস্ত্র সমুদ্রের পথে ॥
কিন্তু, অর্থ চাই ইহাদের উদ্ধারের তরে ;
কি করিয়া এ অর্থের হবে সংকুলান ?
বাজিল পৌরুষ কণ্ঠ শতের অধিক,
যত চাও এনে দিব তার শতাধিক।
সভাশেষে হর্ষধ্বনি—
করতালি বাজে ঘন ঘন।

সেই হতে, অর্থ সংগ্রহের তরে
প্রাণপণে সহস্র উদ্যম—
প্রতি গ্রামে প্রতিটি শহরে।
প্রাণ দিতে স্বদেশের তরে—
বণিক শোষণ তন্ত্র
ভারতের মাটি হতে করিতে নির্মূল,
ধরা দিল দলে দলে মন্ত্রের সাধক—
শিখে লয়ে সমর কৌশল
হাসিমুখে মরণেরে দিতে আলিঙ্গন,
ঝাঁপায়ে পড়িতে চাহে সাম্রাজ্যের শিরে।
ওঠে ঝড় পশ্চিম আকাশে,
প্রলয়ের মেঘ করে ছুটাছুটি দুরন্ত বাতাসে,
তারি মাঝে ভাসায়ে তরণী
রক্তের সমুদ্রে আসি ঝাঁপায়ে পড়িতে
প্রস্তুত হয়েছে যাত্রীদল, সংকল্পে অটল দৃঢ়।
সবাই অপেক্ষমান—
অধিক আগ্রহ ভরে
মেতে ওঠে চিত্ত, মনো, নীরেনের প্রাণ।
অগোচরে লুকাইয়া থাকি—
যতীনের সাথী হয়ে
ছুটে যায় বালেশ্বরে সমুদ্র সৈকতে।
পথে দেখা জ্যোতিষের সাথে—
সেও শেষে সাথী হয় বহু অনুনয়ে।
প্রতিদিন দিন কাটে অস্ত্র প্রতীক্ষায়
নীড় বাঁধিয়াছে তীরে অরণ্য ছায়ায়
মিলি পঞ্চবীর।
বার্তাবাহী হরিবাবু
ধূলি দিয়ে পুলিশের চোখে

সংবাদ বিলায়ে যায়
প্রতিদিন বৈকালে সন্ধ্যায়।
একদিন বেলা শেষে, অসতর্ক ভুলে
বেজে ওঠে নীরেনের হাতের পিস্তল।
সহসা বিকট শব্দে
প্রকম্পিত হয়ে ওঠে বন অন্তরাল।
কিসের রহস্যজাল এ অরণ্যতলে ?
অদূরে অপেক্ষারত শিকারীর দল
ভীত হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায় তরাসে।
"ডাকাত লুকায়ে আছে পাহাড়ের গায়—"
যায় ধেয়ে এ সংবাদ পুলিশের কানে।
অমনি বিদ্যুৎগতি, অনন্য উপায়
ভিন্ন পথে মিলে যায় গাঢ় তমসায়।
ছুটে আসে সশস্ত্র সৈনিক—
ঘিরে ফেলে চারিপাশ চোখের নিমিষে—
খুঁজে দেখে পাহাড়ের অন্তরাল নিভৃত আড়াল।
কোথা কিছু নাই—
একমাত্র পড়ে আছে স্তূপাকৃতি ছাই—
উনানের পোড়ামাটি বিক্ষিপ্ত জঞ্জাল।
"পালায়নি দূরে—
কোথাও লুকায়ে আছে পাহাড়ের গায় !"
পুলিশের অধিকর্তা সহসা ধূমায়ে উঠি,
দপ্ করে জ্বলে ওঠে অসহ্য আক্রোশে।
"চালাও ফায়ার—"
একসাথে গর্জে ওঠে অসংখ্য রাইফেল।
আকাশের বক্ষ হ'তে,
যেন ভূমে নিপতিত সহস্র অশনি—
স্তব্ধ হয় পাহাড়ের চঞ্চল বনানী।

শিলাময় বক্ষ ফাটি,
ছুটে আসে শ্বাপদের অন্তিম চিৎকার।
মর্মছেড়া পাখীদের করুণ বিলাপে—
পৈশাচিক পরিবেশ।
হাহাকার চারিদিকে—অভিশপ্ত বিক্ষুব্ধ আত্মার।

তীর ছেড়ে বহুদূরে অরণ্য নিবিড়—
সুবিশাল মহীরুহে ঢাকা চারিদিক,
গাঢ় অন্ধকার ময়—
ভয়ংকর হতে রূপ আরও ভয়ংকর।
লক্ষ লক্ষ বাহু মেলি ঢাকিয়াছে উন্মুক্ত আকাশ।
তারি মাঝে পঞ্চবীর—
পঞ্চপাণ্ডবের মত খুঁজে ফেরে আশ্রয় শিবির।
ভাদ্রের আকাশ হতে অবিশ্রাম ঝরে বৃষ্টিধারা,
বজ্রনাদ বিদ্যুৎ ঝলসে
দেখাইছে মাঝে মাঝে সম্মুখের পথ।
যতক্ষণ আছে প্রাণ, রাত্রিদিন অবিশ্রাম,
এ জনমে এ চলার হবেনা বিরাম।
পূর্বাকাশে হয়ে আসে ভোর
দেখা দেয় ধীরে ধীরে দিনের নিশান—
সে যেন আবীর ঢাকা লাল রক্তমাখা,
তারি ফাঁকে বহুদূরে—
ঐ বুঝি দেখা যায় একখানি গ্রাম।
আনন্দে মাতিয়া ওঠে বুক।
"ছুটে চলো, আরো জোরে—
আর নাহি ভয়,—
—ঐ গ্রামে আমাদের মিলিবে আশ্রয়।"
দল বেঁধে এইমত অপরিচিতের আবির্ভাব—

গ্রামবাসী চৌকিদার ডেকে আনে ভয়ে।
"ধর্ ধর্ তাড়া তাড়া—"
দেখিতে দেখিতে গ্রামে, জেগে ওঠে জনতার সাড়া,
বার্তা যায় গ্রাম হতে গ্রামে।
শুনে এ কাহিনী
পুনরায় ছেয়ে ফেলে সারাগ্রাম সশস্ত্রবাহিনী।
যে দিকে তাকায় দেখে শুধু অসংখ্য মানুষ।
ধাবমান চতুর্দিকে সন্ধানে তাদের।
হারায়েছে চলার শকতি
অনাহারে অনিদ্রায় প্রাণ যায় যায়,
তবু নাহি দেয় ধরা,
তবু প্রাণ রাখে ধরে, সংগ্রামের উন্মাদ নেশায়।
জ্বলন্ত সমরানলে দিতে তারে জীবন্ত আহুতি।
সম্মুখে সহসা দেখে বলংগের তীর
বালুভরা ধূসর প্রান্তর।
বহুদূরে ধূ ধূ করে অনন্তপর্বতশ্রেণী,—
বিছাইছে ধূম্রজাল গগন ললাটে।
ডেকে কয়—নাহিভয়—আয় চলে আয়,
জটায় রাখিব ঢেকে শিখরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায়—
পূতধারা গংগোত্রীর মত।
সে আহ্বান শুনি
বলংগের বারিধারা মেতে ওঠে তাণ্ডব নর্তনে।

না মানিয়া পরাজয়—ঝাঁপাইয়া পড়ে শেষে
পরপারে খুঁজে নিতে শেষের আশ্রয়।

তীরে যায় নির্বিঘ্নে সাঁতারি।
পশ্চাতে চাহিয়া দেখে সেপায়ের দল
আসে ধেয়ে শ্রেণীবদ্ধ ঢেউয়ের মতন।

বাধাবন্ধ করি চারিদিক
গভীর পরিখা কাটি রচি অন্তরাল
তারি মাঝে বসে থাকে মিলি পঞ্চবীর—
সংগ্রামের উন্মাদ নেশায়।
পুঞ্জীভূত রাজরোষ হাঁ করি করাল,
ছেয়ে ফেলে চারিপাশ দাবাগ্নির মত।
নাম ধরি সকলেরে ডাকে বার বার,
"রেখে দিয়ে হাতিয়ার, অনাবৃত দেহে—
একে একে আসি কর আত্মসমর্পণ।

"আর তারও আগে অপরাধ নতশিরে করিয়া স্বীকার
দেশ ছেড়ে চলে যাও আমার নির্দেশে।
তা নাহলে—আমার রক্তের প্রতি অনু পরমাণু
যেথা রবে, ছিদ্রপথে প্রবেশি সেথায়—
ঘুরিবে পশ্চাতে কাল রাহুর মতন—
যতদিন সাম্রাজ্যের না হবে পতন।"
বিপক্ষের সৈন্যদল আসে ধেয়ে শব্দ লক্ষ্য করি,
সাথে সাথে বজ্রকণ্ঠ বেজে ওঠে করাল নিনাদে
"সাবধান—আসিও না কাছে।
আসো যদি মরণ নিশ্চয়।"
বিপক্ষের বক্ষ হয় প্রকম্পিত দুরু দুরু
সে বজ্র নির্ঘোষে।

সুরু হয় দুপক্ষের গুলি বিনিময়
চোখের পলক যেতে পথ বেয়ে বেয়ে
নেমে আসে রক্ত ধারা ঝলকে ঝলকে।
অবশেষে ছুটে আসে—
খরবেগে সহস্র ধারায়।
ভিজে ওঠে সৈকতের নিম্ন বালুরাশি,

বিপক্ষের বহুসৈন্য—
মরে গিয়ে পড়ে থাকে অরণ্য ছায়ায়।
ফুরাইলে সকল সঞ্চয়—
নিরুপায় পঞ্চবীর, বসে থাকে শুধু, মরণের প্রতীক্ষায়।
পুলিশের রণাধ্যক্ষ সুরক্ষিত পথে—
সবিক্রমে ধেয়ে আসে সম্মুখে তাদের।
কিন্তু এ কি দেখে গিয়ে—
গম্ভীর অম্বর তলে হোমানল জ্বালি—
যেন শিব ধ্যানমগ্ন মহা মৃত্যুঞ্জয়—
কোলে তার চিত্তপ্রিয় কাল ঘুমঘোরে,
মহাশান্তি লভিয়াছে অনন্ত শয্যায়,
কৌতূহলী গ্রামবাসী
চলে যায় যে যাহার আপন আলয়ে।
খণ্ড প্রলয়ের মেঘ উড়ে যায় সাগর সঙ্গমে—
আরক্ত গগনে সন্ধ্যাবায়ু ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।

১০ই সেপ্টেম্বর পুলিশ বেষ্টিত বালেশ্বর হাসপাতালে মহাবীর মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ, ক্ষতবিক্ষত রক্তাপ্লুত দেহে, অবসন্ন, তন্দ্রাচ্ছন্ন, অবচেতন ঃ মনে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার পরিপূর্ণ বিশ্বাসের স্বপ্ন মাধুর্য্যে ডুবে থেকে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আহত মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষের আরোগ্য লাভের পর ট্রাইবুনালে হয় তাদের বিচার, বিচারের পর মনোরঞ্জন ও নীরেনের হয় ফাঁসির হুকুম। আর জ্যোতিষের আমরণ দীপান্তরে কারাদণ্ড ভোগ। কিন্তু জেলের পাশবিক নির্যাতনে দণ্ডভোগ বেশীদিন আর তাকে করতে হয় না। উন্মাদ হয়ে গিয়ে বহরমপুর পাগলাগারদে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। জ্যোতিষ পালের নিবাস ছিল যতীন মুখার্জীর মাতুলালয় কয়া গ্রামে। চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, নীরেন দাসগুপ্ত ও মনোঞ্জন সেনগুপ্ত—এঁরা তিন জনই ছিলেন মাদারীপুরের অধিবাসী। নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসির দিন ধার্য হয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের

৩রা ডিসেম্বর। ফাঁসির দুই দিন পূর্বের বিপ্লবী মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের, তার ছোট ভাইকে লেখা ছোট্ট একখানি চিঠি—

স্নেহের ভাইটি,

আগামী পরশু আমার জীবনের বিজয়া দশমী। হৃদয়ে বাসনার বীজ থাকে বলেই মানুষের পুনর্জন্ম হয়। আমাদেরও কামনা পূর্ণ হয় নি, তাই আমিও হয়ত তোমার ছোট ভাই হয়ে জন্মেই প্রারব্ধ কাজের বাকি টুকু শেষ করব। এইটুকু বিশ্বাস আমার খুবই আছে যে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাব। সেই দিনের আর বেশী দেরী নাই। মনে করিও না এ জীবন দান নিরর্থক। আমাদের মৃত্যুর জন্য দুঃখ করিও না। জান ত—

> দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
> তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীর স্তত্র ন মুহ্যতি॥

সকল জিনিষের মধ্যেই ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত থাকে। ভগবান প্রাণের আকুল আগ্রহ কোনদিনই ঠেলে ফেলেন না। এবং যা তিনি করেন সকলের মঙ্গলের জন্যই করেন এটা মনে রেখো। তোমাকে আমি বহুদিন বলেছি আজও শেষদিন বলে যাচ্ছি যে এক গালে চড় দিলে তাকে দুই গালে দুইটা চড় দিবে। বাবা, মা, দিদি, দাদা, বৌদিকে সান্ত্বনা দিও। আশীর্বাদ করি যেন ভগবান তোমাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট না করেন।

> ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয় দৌর্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।

ইতি—নোয়াদা।

এই একখানি চিঠিই তার ও তাদের প্রকৃত বীরত্ব ও পৌরুষের যেন প্রতিচ্ছবি। ক্ষাত্রতেজে প্রদীপ্ত নির্ভয় "জীবন মৃত্যু যেন পায়ের ভৃত্য", অথচ অন্তর যোগসিদ্ধ, স্থিরচিত্ত ও স্থিতপ্রজ্ঞ। সম্পূর্ণ গীতাধর্মী।

অভাবনীয় এক নাটকের পটভূমিকায় যেন বালেশ্বর সংগ্রামের পরিসমাপ্তি। এ দৃশ্য অতি করুণ ও মর্ম্মান্তিক। এর প্রায় তিনমাস পূর্বেই নরেন্দ্রনাথ সি, মার্টিন এই ছদ্মনামে বাটাভিয়ার উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা করেন। কারণ অস্ত্র বোঝাই 'মেভারিণ' পূর্বোক্ত যথাস্থানে এসে পৌঁছানোর কথা ছিল

জুলাইয়ের মাঝামাঝি। যতীন্দ্রনাথের সাথে তারও তাই উৎকণ্ঠায় দিন কাটত। বাটাভিয়ায় যাওয়ার পর পূর্বোক্ত জার্মান কনসাল থিয়োডোরের সহায়তায় 'এনি লার্সেন' ও 'হেনরি এস' নামে আরও দুই খানি অস্ত্র বোঝাই জাহাজ ভারতের পথে যাত্রা করে। কিন্তু বিপক্ষের তৎপরতায় ঐ জাহাজ দুটির নির্দিষ্ট স্থানে পেঁৗছানো সম্ভব হয়ে ওঠেনা। তাছাড়া বালেশ্বর সংগ্রামের পর বিপ্লবীদের সঙ্গে নরেন্দ্র নাথের পূর্ব যোগাযোগ যায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে। তখন তিনি সি, মার্টিন নাম পাল্টে হরিসিং নামে ইন্দোনেশীয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, জাপান, কোরিয়া, চীনদেশ অতিক্রম করে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার মার্টিন নামে ফ্রানসিস্কোতে জাহাজ থেকে অবতরণ করেন। আমেরিকায় তার অবস্থানকাল ছিল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ওখানেই তিনি মার্কস্‌বাদ ও সোসালিজম-এর সাথে বিশেষ কয়েকখানি পুস্তকের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হন। তখন গুপ্তচরের চোখে ধূলো দিয়ে ওখানে সকলের সাথে পরিচিত হন—মানবেন্দ্রনাথ রায় এই ছদ্মনামে। তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বিশ্বরাজনীতির ইতিহাসে তিনি নিপীড়িত মানব সমাজের মুক্তিকামী আমরণ ঘোর সংগ্রামী শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায়।

নরেন্দ্রনাথের জন্মস্থান কলিকাতার দক্ষিণে ৩০ মাইলের ভিতর অবস্থিত আড়বেলিয়া নামক গ্রাম। ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্কিম চন্দ্রের "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত ও বিবেকানন্দের "হে ভারত ভুলিও না তোমার উপাস্য দেব সর্ব্বত্যাগী উমানাথ শঙ্কর, ভুলিওনা তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত"—অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত এই কথাগুলি তাকে প্রেরণা যোগায় এবং পরবর্তী কালে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করে। আলিপুর মামলার পরে, যুগান্তর দলের সংযোজন ও সম্প্রসারণের কাজে তিনি ছিলেন যতীন মুখার্জির এক নিষ্ঠ সহকর্মী। তার ছাত্রজীবন এবং কৈশোরের কাহিনী তার নিজের কথাতেই বলি, "আমার বয়স যখন চোদ্দ, স্কুলে পড়ি, তখন থেকেই আমার রাজনৈতিক জীবনের শুরু। তখন থেকেই আমি মুক্তির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হয়ত জীবনটা বৃথাই কেটে যেত, কিছুই মিলত না, তথাপি সেদিন আমার আকুতির অন্ত ছিল না। একান্ত ভাবে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা পাবার নব প্রেরণাই তখন আমায় উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। বিপ্লবীরা এইরূপ সর্বাঙ্গীন মুক্তিই কামনা করত।"

বিংশ শতাব্দীর ১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর পর বিশেষ তিনটি ঘটনার জন্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ। উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য ধ্বংসের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার পর ছদ্মনামে রাসবিহারীর জাপান পলায়ন। যতীন মুখার্জীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ বালেশ্বর সংগ্রাম। আর এই ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গান্ধী-স্মার্ট চুক্তির পর ইংল্যাণ্ড হয়ে গান্ধীজির ভারতে আগমন।

বালেশ্বর সংগ্রামের পর ভারতরক্ষা আইনে তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে যায় চারিদিকে ব্যাপক ধরপাকড়। অনেকে ধরা পড়ে যায়, বাকী যারা পালিয়ে গিয়ে চন্দন নগরে আশ্রয় লয়। যুগান্তর ও অনুশীলনের বহু বিপ্লবী পূর্বথেকেই বহু গুপ্ত-হত্যা ও ডাকাতির মামলার আসামী হয়ে তখন বিভিন্ন জেলে ও দীপান্তরে। বাকী যারা, চারিদিকে স্থানান্তরিত ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। বাংলার বাইরে মজঃফরপুর, ভাগলপুর থেকে কাশী অবধি সম্প্রসারিত ছিল তখন অনুশীলনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলি বৈপ্লবিক শাখা-প্রশাখা। পুলিশ গোয়েন্দার অত্যাচারে ভেঙ্গে চুরে সব তখন তছনছ। বাংলার বহু বিপ্লবী তখন নিরাপত্তার জন্য নিজ নিজ গ্রামে ফিরে আসে। কিন্তু থানার মাধ্যমে প্রায় গ্রামেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রপরিবারের কর্তাস্থানীয় একদল তাদের বেকার ছেলেদের সরকারী চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রত্যাশায়, এইসব পলাতকদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রহণ করে ঘৃণিত গুপ্তচর বৃত্তি। বাধ্য হয়ে তখন তারা আবার নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। অনেকে বাংলাদেশ ছেড়ে আশ্রয় লয় গিয়ে আসামের অরণ্য পরিবেশে। এইভাবে গৌহাটির চারিদিকে বাংলার পলাতক বিপ্লবীদের একটির পর একটি করে ঘাঁটি গড়ে ওঠে। কিন্তু এ ঘটনা অধিক দিন গোপন থাকে না। পুলিশ টের পায়। তারপর লালবাজারের অধিকর্তা 'ফেয়ার ওয়েদার'—এর নেতৃত্বে এক বিশাল পুলিশবাহিনী অতর্কিতে তাদের আটগাও নামে একটি ঘাঁটি আক্রমণ করে। এই খণ্ড-যুদ্ধ ইতিহাসে 'গৌহাটি-সংগ্রাম' বলে প্রসিদ্ধ। বালেশ্বর সংগ্রামের পর ব্রিটিশ-রাজের সাথে সম্মুখ সমরের আর এক বীরত্বপূর্ণ কাহিনী।

আসামের আটগাও ঘাটিতে তখন ছিলেন নলিনী ঘোষ, অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনীন্দ্র রায়, প্রবোধ দাসগুপ্ত, প্রভাস লাহিড়ী। এছাড়াও উজানবাজার ও ফ্যান্সি বাজারের দুটি বাড়ীতে ছিলেন নলিনী বাকচী, নরেন

ব্যানার্জী, নিকুঞ্জ পাল, জিতেশ লাহিড়ী, তারাপদ দে, প্রবোধ বিশ্বাস, শীতল পাকড়াশি, মণীন্দ্র দত্ত এবং অপরাপর বহু বিপ্লবী। সবার উপরে দলনেতা ছিলেন নলিনী ঘোষ। এর পরের মুখোমুখী খণ্ড যুদ্ধ ঢাকার কলতা বাজারে। বলিহন তাতে অনুশীলনের বীর বিপ্লবী তারিণী মজুমদার ও নলিনী বাকচী। তারিণী মুজুমদার ছিলেন শ্রীহট্ট জিলার অধিবাসী আর নলিনী বাকচী ছিলেন বহরমপুরের।

অনুশীলনের অবদান, শহীদের খুনরাঙা রক্তের সাক্ষরে
চিরকাল রহিবে অম্লান সংগ্রামের ইতিহাসে।
ছত্র ছায়া তলে তার অগণিত তরুণের দল,
গড়ে তোলে লৌহ পেশী স্থির চিত্তে দৃঢ় মনোবল।
বচনে বিনয় নম্র, ব্যবহারে সহজ সরল,
অন্যায়ের প্রতিরোধে অতীব ভয়াল,
সুতীক্ষ্ণ ধারাল অতি খাপছাড়া যেন তরোয়াল।
বাংলায় বিহারে আসামে
গড়ে তোলে সংগঠন গ্রাম হতে গ্রামে।
পদ্মা ভাগীরথী নদী পূর্ব ও পশ্চিমে।
যখনই ক্ষেপে ওঠে অগ্নিক্ষরা রণ অট্টহাসে,
শাসকের মেরুদণ্ড থর থর কম্পমান সভয় সন্ত্রাসে।
এই দোষে রাজ রোষে দলে দলে করে দণ্ড ভোগ।
নাই তাতে অসন্তোষ, কারো মনে নাই কোন ক্ষোভ।
চলার বন্ধুর পথে লক্ষ্য রাখি স্থির
কাম্য ধন একমাত্র স্বাধীনতা লাভ।
জীবনের স্বপ্ন ও কল্পনা
স্বাধীন ভারতবর্ষ সার্বভৌম সর্বাঙ্গ সুন্দর।
উনিশ-সতের সাল বর্ষশেষ প্রায়,
মহাযুদ্ধ তখনও হয় নাই শেষ।

স্তব্ধ হয় নাই তখনও কামানের অগ্নি উদ্গীরণ।
এ সময় বঙ্গদেশে খুনরাঙা আগুনের হাসি
শাসকের হৃদযন্ত্রে অহোরাত্রি তোলে আলোড়ন।
বিপ্লবীরা কে কোথায় আছে, সংগোপনে,
সহসা তৎপর হয়ে খুঁজে ফেরে গোয়েন্দাবাহিনী।
শুধুমাত্র সন্দেহের বশে ঘরে ঘরে হানা দেয়,
যারে পায় ধরে আনি লাঠিপেটা করে।
মিথ্যা মামলার দায়ে অকারণে জেলে রাখে ধরে।
ঘর ছেড়ে বিপ্লবীরা তাই এ সময়,
বিপ্লবীরা দল বেঁধে গৌহাটির চারি পাশে লয়গে আশ্রয়।
গৌহাটির আটগায়ে বিপ্লবীর ঘাঁটি,
এ বিবৃতি কোলকাতায় ধরাপড়া রাজসাক্ষী কানাই সাহার
শোনামাত্র ক্রোধে—
লাল বাজারের চক্ষু জ্বলে উঠে আরও হয় লাল।
আই, জি'র নীল চক্ষু রক্তবর্ণ জ্বলন্ত মশাল।
ধরে এনে শাস্তি দিতে
ঝড় বেগে উড়ে যায় গৌহাটির পথে
সাথে লয়ে সশস্ত্র বাহিনী।

তৃতীয় প্রহর রাত্রি,
শীতের কুয়াশা ঢাকা মসিমাখা চাঁদ
লুকায়েছে দিগন্তের ঘন অন্তরালে।
চারিদিক নিস্তব্ধ নিঝুম।
গভীর নিদ্রার ঘোরে বিপ্লবীরা সবে অচেতন।
একমাত্র জেগে বিপ্লবী মণীন্দ্র রায় দ্বারদেশে অতন্দ্র প্রহরী।
আকাশের সূচীভেদ্য অন্ধকার চিরি
মুখে তার বারে বারে ঝলসিছে বিদ্যুতের রেখা।
প্রলয়ের আগে যেন থেকে থেকে জ্বলেওঠা কালাগ্নির শিখা।

বিপদ সঙ্কেত বুঝে
জাগায়ে তুলেছে সবে মুহূর্তের মাঝে।
পুলিশের আবেষ্টন তাক করি হাতের রাইফেল
ক্রমাগত ঘনীভূত দ্বারপ্রান্তে এসে।
দংশনের আগে,
নাগিনীরা যেই মত উর্দ্ধে তোলে ফণা—
দীর্ঘ দেহ এঁকে বেঁকে সংকুচিত করি।
দেখামাত্র অস্ত্র হাতে বিপ্লবীরা সবাই প্রস্তুত—
সঙ্কল্পে অটলদৃঢ়।
যতক্ষণ থাকে প্রাণ, কেহ কভু করিবনা আত্মসমর্পণ।
মুখোমুখী তারপর শুরু হয় দুপক্ষের তুমুল সংগ্রাম।
বিপদ ঘনায়ে এলে রুদ্ধ করি সম্মুখের দ্বার,
পশ্চাতের গুপ্ত পথে অতিক্রত করে পলায়ন।
কপাটের গায়ে সাথে সাথে জোর লাথি
দমাদম বুটের আঘাত।
দু'চার লাথির ঘায়ে, গুড়ো হয়ে ঝরে পড়ে
জরাজীর্ণ কাঠের কপাট।
কিন্তু, ঘরে গিয়ে সকলের চক্ষুস্থির অবাক বিস্ময়ে!
রক্তে ঘর ভেসে গেছে নাই তাতে মানুষের সাড়া।
যেন এক প্রেতপুরী নির্জন একাকী
মন্ত্র বলে কেহ বুঝি রচিয়াছে মায়া।
নয়তো বা সম্মোহিনী ইন্দ্রজাল মিছে
ঘটায়েছে দৃষ্টির বিভ্রম—
হাওয়া হয়ে মিলায়েছে মহাশূন্যে মানুষের কায়া।
রজনীর অবসান—
প্রভাতের সাথে, লোক চোখে ধরা দেয় রক্তঝরা অরণ্যের পথ।
এই পথ ধরে শেষে
পুলিশ বাহিনী সারাদিন হন্যে হয়ে খোঁজে,

ও পথের শেষপ্রান্ত মিলায়েছে পাহাড়ের গায়।
রাত্রি ঘোর অন্ধকারে ঐখানে ধরাপড়ে প্রভাস লাহিড়ী
গুলি বিদ্ধ বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠদেশ হতে
অনর্গল তখনও ঝরে রক্তধারা—
অর্ধঅচেতন।
বিপ্লবী মণীন্দ্ররায় যুথ ভ্রষ্ট হয়ে
মহাশ্মশানের মাঝে লয় গে আশ্রয়।
যেন এক মৃত দেহ, সম্মুখে জ্বলন্ত চিতা
দাহ হতে আছে প্রতীক্ষায়।
বাকি সব মিলায়েছে নবগ্রহ পাহাড়ের গায়।
তিনদিন কারও মুখে একমুঠো পড়ে নাই ভাত।
অসহ্য ক্ষুধায় আহারে বসেছে সবে।
গ্রাস তুলে মুখে দেবে—
এমন সময় ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসে বন্দুকের গুলি
সম্মুখের ঢালু পথ হতে।
আকাশের বক্ষ ফাটি অবিশ্রান্ত যেন বজ্রপাত।
ক্ষুধা ভুলি থাকি অবিচল
সাথে সাথে চলে প্রত্যুত্তর।
হাতিয়ার হাতে মাত্র দুইজনের দুইটি পিস্তল।
বাকি যারা কুড়াইয়া পাথরের নুড়ি
ছুঁড়ে মারে যত পারে,
বারেবারে বিপক্ষের শির লক্ষ্য করি—
আকাশের শিলাবৃষ্টি সম।
এক সাথে বেজে ওঠে পশুপক্ষী মানুষের ভয়ার্ত চীৎকার।
মাথা ফেটে কেটে গিয়ে, উর্দ্ধে ওঠা পুলিশের হয় অসম্ভব।
মুহূর্তের মাঝে, নিম্নপথে নেমে আসি
চতুর্দিক ঘিরে ফেলে অপেক্ষা না করি।
পশ্চাতের ঢালু পথে বিপ্লবীরা এলে,

শুরু হয় হাতাহাতি তুমুল সংগ্রাম।
এ আগল ভেঙ্গে ফেলে নলিনী প্রবোধ,
তীর বেগে হয়ে যায় অদৃশ্য উধাও।
পুলিশের অসতর্ক মুহূর্তের ফাঁকে—
নলিনী ঘোষের এক গোপন ইঙ্গিতে।
বাকী সব রুধিরাক্ত অবসন্ন দেহে
নত শিরে একে একে পরে হাতকড়ি।
সূর্য্য ডুবে যায় অস্তাচলে
পাহাড়ের রক্তিম ছায়ায়।
দুর্গম বন্ধুর পথে, দুজনার শুরু হয় পুন পথ চলা
দিনে থাকে লুকাইয়া অরণ্য গভীরে,
রাতে শার্দ্দুলের মত দীর্ঘপথ করে অতিক্রম।
বহুদিন পরে এসে পোঁছায় শ্রীহট্ট জেলায়।
সেথা হতে নৌকাপথে পদ্মা পাড়ি দিয়ে
ছদ্ম বেশে অবশেষে হয় কাশী বাসী।

মাত্র কিছুদিন পরে বিপ্লবী প্রবোধ
সাধু বেশে বঙ্গভূমে করি পদার্পণ
সাথে সাথে ধরা পড়ে যায়।
বহু পরিচিত মুখ,
জটা আর গোঁফ দাড়ি
ফাঁকি দিতে পারে নাই পুলিশের চোখ।
আরো দিন কত পরে
দেখা যায় নলিনী বাকচীরে।
ন্যাড়ামাথা, টিকি ধারী মজুরের বেশে,
সম্বলের মাঝে কাছে লোটা ও কম্বল।
পড়ে আছে গঙ্গা তীরে ময়দানের বৃক্ষছায়া তলে।
সর্ব্বদেহে মহামারী বসন্তের গুটি।

ফুলে ওঠা দেহ থেকে
ঝরে পড়ে রক্ত পুঁজ, দুর্গন্ধ ছড়ানো।
প্রবল জ্বরের ঘোরে "জল জল" করে সে চিৎকার।

নিরুপায় মৃত্যু অপেক্ষায়,
কম্বল শিয়রে পড়ে—শূন্য লোটা ধরণী লুটায়।
হায়, এইদৃশ্য চেয়ে দেখে
অনেকেই এ জগতে অন্ধ সেজে থাকে।
সাড়া দিতে একমাত্র তারা শুধু পারে,
ভয় বলে কোন কিছু জানা নাই যাহাদের এ বিশ্ব সংসারে।
দিন দুই পরে—নাড়ী ক্রমে হয়ে আসে ক্ষীণ।

নিবু নিবু জীবন প্রদীপ—
রক্ত রবি ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে অস্তাচল গামী।
এ সময় এই ছবি ধরা পড়ে যায়,
সতীশ পাকড়াশি নামে বিপ্লবীর চোখে।
তারপর দল বেঁধে আসি, তুলে তারে খাটিয়ায়
নিয়ে যায় গোপন ঘাটিতে।

রাত্রি দিন ধরে—
যম আর মানুষের চলে টানাটানি।
অক্লান্ত সেবার কাছে
মৃত্যু শেষে মানে পরাজয়।
ধীরে ধীরে পরে শেষে লভে সে আরাম।

তারিণী মজুমদার, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ সংগঠন নেতা
কলিকাতায় এ সময় চলে আসে কর্মী অন্বেষণে।
ফেরারী বিপ্লবী সেও নলিনীর মত।
অন্ধকারে মিশে
তারেও করিতে হয় পথ অতিক্রম।

বড় খুশী দেখা হয়ে নলিনীর সাথে।
কিছু দিন পরে—
দুইজন এক সাথে চ'লে আসে ঢাকার শহরে।
হরি চৈতন্যের নামে বাড়ী ভাড়া করে,
পুনরায় সেইখানে গড়ে তোলে বৈপ্লবিক ঘাঁটি।
মাত্র দিন কত পরে—
গুপ্তচর এ খবর তুলে ধরে পুলিশের কানে।
উনিশ আঠারো সাল পনের ই জুন।
রাত্রি প্রায় হয়ে আসে ভোর,
মেঘে মেঘে ডুবে আছে অন্ধকার আকাশের তারা।
বর্ষার প্লাবনের ধারা,
বায়ু ভরে নেমে এসে কিছু পরে দূরে ভেসে যায়।
তার পর ধীরে ধীরে উষার অধরে
ফুটে ওঠে রক্তরাগ আবীরের রেখা।
এ সময় এ বাড়ীতে হানাদেয় এসে
প্রফুল্ল বিশ্বাস নামে পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান।
সুকৌশলে মুক্ত করে অবরুদ্ধ প্রাচীরের দ্বার—
প্রবেশয় একে একে সশস্ত্র বাহিনী।
কিছু আগে শয্যা ছাড়ি নলিনী তারিণী
ছিল দোঁহে ব্যাম চর্চারত।
এ কাজের উপযুক্ত দিতে প্রত্যুত্তর,
ব্যাম ফেলে খুঁজে লয় হাতের পিস্তল।
মুহূর্তের ব্যবধানে গর্জে ওঠে অব্যর্থ সন্ধানে,
মাটিতে লুটায়ে পড়ে প্রফুল্ল ও
অন্য এক পুলিশ প্রধান।
সাথে সাথে বজ্র কণ্ঠ বেজে ওঠে প্রলয় নির্ঘোষে—
"ইংরাজের চির পোষা ঘৃণিত কুক্কুর।
ভেবেছ কি প্রাণ লয়ে ফিরে যাবে বিনা রক্তপাতে ?

মর ! যাহান্নামে যাও" ।
প্রত্যুত্তরে পুলিশ বাহিনী
ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে তারিণী ও নলিনীর দেহ !
নিবে যায় সাথে সাথে তারিণীর জীবন প্রদীপ ।
আর আহত নলিনী,
ক্ষত জ্বালা সর্বগ্লানি ভুলে
পড়ে থাকে প্রতীক্ষায় মৃত্যুরূপী চির সুন্দরের ।
জিজ্ঞাসিলে নাম ধাম শুধুমাত্র বলে,
এ সংসারে আর মোর কোন কথা নাহি বলিবার ।
সব কথা ফুরায়েছে, সব কথা শেষ !
ওঁ শান্তি ! শান্তি ! শান্তি !
এই রূপে দুই বীর দেশ মাতৃকার পায়
সঁপে দেয় রক্ত পুষ্পাঞ্জলি, নীরবে নিভৃতে ।
রক্তের সাক্ষরে আঁকা ইহাদের সংগ্রাম কাহিনী
ঢাকা আর গৌহাটির অরণ্যের প্রস্তর শিলায় ।
ইতিহাস ইহাদেরে কভু ভুলিও না ।

পাঁচ

মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশে যখন বৈপ্লবিক পরিকল্পনার গোপন প্রস্তুতি ও স্বদেশী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান ঢেউ, তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতীয়দের মানবধর্ম অনুমোদিত সামাজিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রবল অহিংস আন্দোলন। এই অহিংস আন্দোলন, পৃথিবীর সংগ্রাম ও মুক্তির ইতিহাসে এক নূতন ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী বিলেত থেকে ভারতে ফিরে এলেন ব্যারিস্টার হয়ে। মাত্র তার কিছুদিন পরই এক সওদাগরী মামলা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁকে চলে যেতে হল। গিয়ে দেখেন, হিংসা ও বর্ণবিদ্বেষের জন্য ধনী, নির্ধন সকল ভারতীয়ই শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ শাসক শ্রেণীর চোখে ঘৃণ্য। আর স্থানীয় কৃষ্ণকায় অধিবাসীরা তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য ভারবাহী কৃতদাস মাত্র—জঙ্গলের পশুরও অধম।

আশৈশব গান্ধীজী ছিলেন বিশেষ কতকগুলি সৎগুণের অধিকারী। ঐ গুণ গুলি ছিল সত্যবাদিতা, সমদর্শিতা ও সেবাপরায়ণতা। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পোরবন্দরে গান্ধীজীর জন্ম। পিতা মাতার প্রতি ছিল তার অবিচল ভক্তি। হয়ত উপরোক্ত গুণগুলি জন্মসূত্রে তাঁদের কাছ থেকেই প্রাপ্ত। পিতৃসত্য পালন করতে, রাজ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করে বনবাসী হওয়া, ও গুহক চণ্ডালকে কোল দেওয়ার জন্য রামায়ণের রামচন্দ্র ছিলেন তার আমরণ আরাধ্য দেবতা। পূর্ব্বোক্ত গুণগুলি অন্তরের প্রেরণা হয়ে, সাউথ আফ্রিকার পরিবেশে এসে বিশেষ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তার প্রভাবে নিষ্কামভাবে নিপীড়িতের সেবায় সম্পূর্ণ আপনাকে বিলিয়ে দেন। এইজন্য কুলী ব্যারিস্টার বলে শ্বেতাঙ্গ ইংরাজ মহলে হন তিনি উপহাসের পাত্র। পদে পদে অপমানিত হয়েও এই মানবোচিত অধিকার আদায়ের আন্দোলনে ব্রতী হয়ে একদিনের জন্যও তিনি বিরত হননা। অত্যাচার চরমে ওঠে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। ট্রান্সভাল্ সরকার প্রতিটি ভারতীয়কে টিপসই সহ নাম রেজেস্ট্রী করার জন্য এক আইনের প্রবর্ত্তন করে। তখন এই ঘৃণিত আইন অমান্য করে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে সেখানকার সকল ভারতীয়রা সত্যাগ্রহ করে অহিংসায় অবিচল থেকে দলে

দলে কারাবরণ করে। দীর্ঘ ছয় বৎসর ক্রমাগত সংগ্রামের পর, ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর সাথে ট্রান্সভাল্ সরকারের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তার ফলে ভারতীয়রা সসম্মানে সেখানে পায় নাগরিক অধিকার। এই খানেই মারণাস্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য গান্ধীজীর আত্মিকবল-প্রসূত অহিংস সত্যাগ্রহের জন্ম। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই চুক্তি সম্পাদনের পর ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পাড়ি দেন তিনি ইংল্যাণ্ডে। পৃথিবীময় তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রলয় ঘনঘটা। এই যুদ্ধে ইংরাজদের সাহায্য করার জন্য ভারতীয় ছাত্র ও তরুণদের নিয়ে গঠন করেন “ভারতীয় সেবাদল”। আত্মনিয়োগ করেন সৈনিকদের সেবা ও পরিচর্যায়। তাঁর অযাচিত এই সেবাদান ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টি তখন বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য গান্ধীজী প্রথমে ছিলেন শাসক সম্প্রদায়ের ঘোর শত্রু। কিন্তু সেবার মাধ্যমে ক্রম পর্যায়ে তাদের মধ্যে মিত্রতা গড়ে ওঠে। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বুয়ার-ইংরাজ যুদ্ধে জীবন বিপন্ন করে আহত সৈনিকদের সেবার জন্য তাকে ‘কাইজার-ই-হিন্দ্’ স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁর সেবার উদ্দেশ্য ছিল, ইংরাজের মন জয় করে সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতের স্বায়ত্ত শাসনকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে ফিরে এসে, শান্তি-নিকেতনে প্রথম দেখা করেন রবীন্দ্রনাথের সাথে। তখন তিনি আর ব্রিটিশ ভারতের সামাজিক মর্যাদার প্রথম শ্রেণীর মানুষ ব্যারিস্টার করমচাঁদ গান্ধী নন—কটিবাসে কোটী কোটী অর্ধনগ্ন নিরন্ন ভারতবাসীর প্রকৃত ব্যথার ব্যথী,—দেশের মুক্তি সাধনার অগ্রদূত। রবীন্দ্রনাথ তাকে আলিঙ্গন করলেন মহাত্মা বলে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় আহুত হয়ে অতি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেন এই দরিদ্র দেশের রাজন্যবর্গের মণি মাণিক্য খচিত চাকচিক্যময় বেশভূষার। গঠন মূলক কাজের জন্য কর্মী সংগ্রহ করে সবরমতী নদীর তীরে করলেন সত্যাগ্রহ আশ্রম প্রতিষ্ঠা। সাথে সাথে শুরু হোল চরকায় সুতো কাটা ও তাঁত বোনার কাজ। এরপর চম্পারনে নীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহের মাধ্যমে জেহাদ ঘোষণা। বাংলার ক্ষেত থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে যে পাপ নির্মূল হয়েছে, বিহারে বিংশ

শতাব্দীর দুইদশক পর্যন্ত তা ছিল সজীব। কয়েকবার রক্তাক্ত সংগ্রামের পরেও এর অবসান ঘটেনি। গান্ধীজী অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এখানে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন।

যারা মনের অপরিসীম ধৈর্য্য ও যোগবলে সাংসারিক কামনা বাসনার উর্দ্ধে উঠে, ঐশ্বর্য্যের বিপুল সম্ভাবনা তৃণের মত ত্যাগ করে দেশ বিদেশের নিরুপায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়, অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করে, এ সংসারে তারাই তো প্রকৃত বীর, মহামানব ও মহাত্মা। হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের অন্ধ তিমিরাচ্ছন্ন বিরাট এক অংশ জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন অশিক্ষা ও কুসংস্কারের অন্ধকারে নিমজ্জিত নিরুপায় মনুষ্য শ্রেণী, এরা ক্ষেত খামারে হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে চিরকাল সমাজের অন্ন জোগায় কিন্তু নিজেরা ভূমিহীন, তাই থাকে চিরদিন অভুক্ত। সমাজের জঞ্জাল মুক্ত করে যারা সমাজের বিচারে তারা অস্পৃশ্য। সমাজের এই নারকীয় চিত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধরে ধরা দেয় পর পর স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দনাথ ও গান্ধীজীর চোখে, তাই গান্ধীজীর চোখে এরা হরিজন, স্বামীজীর চোখে এরা দরিদ্র-নারায়ণ আর রবীন্দ্রনাথের কাছে এরা প্রাণের ঠাকুর, এই বৃহৎ জনসমাজকে পায়ের তলায় পিষে রেখে স্বার্থের মোহে আত্মঘাতী দ্বন্দের শেষ পরিণামে ভারতবর্ষ হয় চিরপরাধীন।

“হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান”।

গান্ধীজীর কংগ্রেসে প্রবেশের পরেই, তারই প্রচেষ্টায় অন্ধকার পরিবেশের অস্পৃশ্য অবজ্ঞাত মানুষগুলির সাথে কংগ্রেসের এক যোগসূত্র গ্রথিত হয়। এদের ভিতরেই অগণিত মজুর, কিষাণ, কুলি, কামার ও সমাজবন্ধু মুচি মেথর। কিন্তু ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের জন্মথেকে, প্রায় ত্রিশ বছরের উপরে পুর্ব্বোক্ত অবজ্ঞাত সমাজের সঙ্গে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আর শিক্ষার আলোকে অবচেতন মন সচেতন না হলে, দেশাত্মবোধ জাগ্রত হওয়াও অসম্ভব। কংগ্রেস প্রথমে ছিল ভারতের উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিচালনায় জাতীয় আশা আকাঙ্খা পরিপুরণের উদ্দেশ্যে আবেদন নিবেদনের একমাত্র মুখপাত্র।

এই উদ্দেশ্য সাধনে উৎসাহে সর্ব্বপ্রথম অগ্রণী হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজি, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, উমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ। কিন্তু তাদের নীতি ছিল, সংগ্রাম ও আন্দোলনের পথ এড়িয়ে গিয়ে আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে যথাসম্ভব সুখসুবিধা আদায় করা। এর পরিণামে অচিরেই ভিন্ন-মতাবলম্বী আর এক বিশেষ দলের সৃষ্টি হয়। চরমপন্থীনামে তার হন পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত এই দলের প্রধান ছিলেন মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় ও বাংলার অরবিন্দ, বিপিন পাল, ভূপেন দত্ত, অশ্বিনী দত্ত প্রভৃতি। সংগ্রাম বিমুখতার জন্য কংগ্রেসের সমালোচনায় তারা মুখর হয়ে ওঠেন এবং তাদেরই গুপ্ত প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম সংগ্রামশীলদল বাংলায়, পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্রে আত্মপ্রকাশ করে। মহাযুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতির তখনকার পরিস্থিতিতে গান্ধীজী সহ কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সকলেই আশা করেছিলেন যুদ্ধের শেষে ইংরেজ ভারতকে আত্মনির্ভর ও স্বায়ত্বশাসনে প্রতিষ্ঠিত করে ভারতের সহিত চিরদিনের মত বন্ধুত্ব বজায় রাখবে, কিন্তু চরমপন্থীরা কেহই একথা বিশ্বাস করতেন না।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান। চারবছর ক্রমাগত দু'পক্ষের রক্তক্ষয়ী প্রবল সংগ্রামের পর, পর্যুদস্ত জার্মাণীর অবনত মস্তকে পরাভব স্বীকার। ব্রিটিশ সম্রাটের গলদেশে মহাকাল পরিয়ে দিল বিজয় মাল্য। এই বিজয় গৌরব অর্জ্জনের জন্য প্রধানতম কারণগুলির ভিতর, বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল ভারতীয়দের অর্থ, সেবা, ও নিঃস্বার্থভাবে সমরক্ষেত্রে বীরের মত মৃত্যু বরণ। এর জন্য মিলেছিল শাসনযন্ত্র পরিবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি। এরপর স্বনির্ভর শাসনক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা অনেক ভারতীয়ই মনে মনে পোষণ করতেন।

কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল, প্রতিশ্রুতির বাক্যগুলি বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে রেখে, আরও শক্ত হাতে ঝুঁটি ধরে পায়ের তলে দাবিয়ে রেখে, শোষণের জন্য জঘন্য 'রাউলাট' আইনের প্রবর্তন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের সময় ভারত-সচিব মণ্টেগু ও বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডের যুক্ত বিবৃতির একাংশের সারমর্ম্ম ছিল, শাসন সংস্কারের মাধ্যমে ভারতীয়দের হাতে ক্রমে স্বায়ত্ত শাসনভার

অর্পণ করার। আর যুদ্ধের পর 'রাউলাট' আইনের প্রবর্তনে গান্ধীজীর প্রবল প্রতিবাদের উত্তরে, একই লোক ভারতসচিব মণ্টেগুর হুমকি—"আমরা ভারতছেড়ে চলে যাবো, এ যদি কোন ভারতবাসী ভেবে থাকেন, তবে তাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করেন। তিনি জেনে রাখুন ব্রিটিশ সিংহ পৃথিবীতে এখনও সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। চরম ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত শাস্তি দিতে সে জানে।" ইতিপূর্বে শাসন সংস্কারের নামে যেটুকু দেওয়া হোল, তাও হরণ করার অধিকার সম্পূর্ণ হাতে রেখে। এ যেন নেকড়ে বাঘের রূপকথার মত। বিপদ কেটে যাওয়ার পর রুদ্র মূর্তিতে অঙ্গীকারের কথা ভুলে গিয়ে, দাঁত খিচিয়ে পূর্বাপেক্ষা আরও ভয় দেখানো। মহাযুদ্ধের সংকট ত্রাণের পর রাউলাট আইনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের ক্রমবর্ধমান বিপ্লববাদকে বিচ্ছিন্ন করে চিরকালের মত ভারতকে পায়ের তলায় চেপে রাখা। কারণ রক্তাক্ত ভয়াল বিপ্লববাদের ভবিষ্যৎ করাল মূর্ত্তি বিলাতী শাসন চক্রের পশ্চাতে বিচরণ করত তখন ছায়ার মত। উদ্বেলিত হয়ে উঠল এ আইনের বিরুদ্ধে, আসমুদ্র হিমাচল। বিপ্লব ও বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠল পঞ্চসিন্ধু।

সেদিন ছিল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল। হাজার হাজার মানুষের একত্র সমাবেশ ঘটেছিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে। মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার জন্য জঙ্গলের এই পাশবিক আইন বন্ধ করার বিরুদ্ধে। উদ্যানে আগমন নির্গমনের একটি মাত্র ছিল পথ। বাকী সমস্তটাই ছিল সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠল ডায়ার সাহেব, পূর্ব্বের পুঞ্জীভূত আক্রোশ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। একটি বারের জন্যও কাউকে সতর্ক না করে, শিলাবৃষ্টির মত শুরু হল চতুর্দিকে গুলি বর্ষণ। সাথে সাথে আবালবৃদ্ধ জনতার এক বিরাট অংশ গুলির আঘাতে ওখানেই প্রাণ দিল। বদ্ধ আবেষ্টনীর ভিতর পরিত্রাহি ডাকে উদ্ধারের জন্য আহতের আর্ত চীৎকার। শত শত মানুষের রক্ত স্রোতে উদ্যানের চারিদিক ভেসে গিয়ে পৈশাচিক এক নারকীয় পরিবেশ। কানে শোনামাত্র সারাদেশ এই পৈশাচিক আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ভেঙ্গে পড়ে। এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মর্ম্মাহত রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করলেন 'নাইট' উপাধি। ব্যথায় অভিভূত হয়ে

সবকাজ ত্যাগকরে ঘটনা স্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন মহাত্মা গান্ধী। গেলেন মদন মোহন মালব্য। কিন্তু পাঞ্জাবের ভিতরে প্রবেশ তাদের পক্ষে সম্ভব হোলনা। পাঞ্জাব তখন সেপাই আবেষ্টনীর অভ্যন্তরে। অত্যাচারের প্রবল বন্যা প্রবাহে অমৃতসরের ঘরে ঘরে তখন সেপাইদের তাণ্ডব নৃত্য।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসর কংগ্রেসে মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্ব হলো সুপ্রতিষ্ঠিত। ইতিমধ্যে মুসলমান সম্প্রদায় ভারতবর্ষে খিলাফত আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে। আন্দোলনের নেতা মোহাম্মদ আলী ও সৌকত আলী। ভারতের খিলাফত আন্দোলনের জন্ম রহস্য নিম্নরূপ।

প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করায় তার পরাজয়ের পর, মিত্র পক্ষীয়েরা তুরস্কের সুলতানের অধিকার খর্ব্ব করে। ঐ সুলতানই ছিলেন মুসলিম জগতের খলিফা অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান। আর এই অপমানে পৃথিবীর মুসলিম সমাজ ওঠে বিক্ষুব্ধ হয়ে। গান্ধীজীর পরামর্শে কংগ্রেস তখন এই খিলাফত আন্দোলন সমর্থন করে। ১৯২০ সালের ১লা আগষ্ট ভারতব্যাপী শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন। দীপ্ত কণ্ঠে গান্ধীজী ঘোষণা করেন, স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের প্রকৃত সত্যের দাবীর প্রতি উদাসীন অত্যাচারী এই সরকারের সাথে যে কোন বিষয়ে সহযোগিতা করা অন্যায় ও মহাপাপ। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এ আন্দোলনের পুরোভাগে তখন ছিলেন, চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু, বিঠল ভাই প্যাটেল, বল্লভ ভাই প্যাটেল, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রাজাগোপাল আচারী, আজমল খান, সরোজিনী নাইডু, আবুল কালাম আজাদ, পুর্ব্বোক্ত আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। আন্দোলনের কার্যসূচীর ভিতর ছিল—সরকারী খেতাব বর্জন, সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আদালত ও আইনসভা বর্জন, বিলাতী বস্ত্র বর্জন, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন ও তাঁত শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা, সাথেসাথে ঘরে ঘরে চরকা প্রচলন। চরকায় কাটা সুতোয় বোনা খদ্দর সারা ভারতে জাতীয়তাবোধের প্রতীকের মর্যাদা লাভ করে। আন্দোলনের বিপুল এক সম্মোহিনী শক্তি সারা ভারতের সাড়ে সাতলক্ষ গ্রাম ও শহরগুলিকে তোলপাড় করে। সর্ব্বস্তরের মানুষের ভিতর অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। ঘরে ঘরে

চরকায় সুতোকাটা হয়, তাঁর ঐন্দ্রজালিক প্রভাব দল নির্বিশেষে সারা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করে ফেলে। মহাযাজ্ঞিকের প্রজ্বলিত হোমানলে তখন সারা ভারতের মানুষ পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন আহুতি দিতে।

* * * *

—কারাগারে নাহি হয় স্থান সঙ্কুলান।
মন্ত্রের সাধন পথে সত্যাগ্রহী দল,
দলে দলে ধেয়ে যায় মরণেরে দিতে আলিঙ্গন।
অস্ত্রহীন জনতার পরে, আগে চলে নির্ম্মম প্রহার।
অবশেষে অবরুদ্ধ করি চারিধার
ঝাঁপাইয়া পড়ে বুকে,
মারণাস্ত্র পাশবিক নির্ম্মম সংহার।
প্রজ্বলিত রাজরোষ রুধির লালসে
ধেয়ে যায় গ্রামপথে,
হানা দেয় প্রতিগৃহে কুটিরে কুটিরে।
নরকাগ্নি দাহ, রুধির সন্ধানে ঘুরি
নারী শিশু না করি বিচার,
যারে পায় তারে ধরি অসংকোচে বুক চিরে করে রক্ত পান।
তবু মহাসত্যাগ্রহ সংকল্পে অটল—
তবু মহা সত্যাগ্রহ নহে ভয়ে কভু ম্রিয়মাণ।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কার্য্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এ আন্দোলন কার্য্যে পরিণত করার পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয় গান্ধীজীর উপর। কংগ্রেসের এই ঘোষণায় সারাদেশ আবার তখন উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

গান্ধীজীর এই আন্দোলনের তোড় সাগর অতিক্রম করে সুভাষচন্দ্রের অন্তর স্পর্শ করে। সুভাষচন্দ্র তখন চতুর্থস্থান অধিকার করে লণ্ডনে আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কিন্তু তিনি বিবেকের দংশনে মর্যাদার ঐ চাকরির

প্রলোভন অনায়াসে ত্যাগ করে, রিক্তহস্তে ভারতবর্ষে ফিরে এলেন। বোম্বাই-এ জাহাজ থেকে অবতরণ করেই, চলে গেলেন গান্ধীজীর কাছে। নিজ পরিচয় দিয়ে প্রণাম করে বললেন,—“দেশ-সেবার কাজেই আমি আমাকে উৎসর্গ করতে চাই। সবার আগে তাই আপনার কাছে চলে এসেছি।” সবকথা শুনে, গান্ধীজী ত্যাগের মূর্ত প্রতীক তরুণ সুভাষচন্দ্রকে তখন সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন। সুভাষচন্দ্র মনের সন্দেহকে সম্পূর্ণ দূর করতে চেয়ে খোলামনে গান্ধীজীকে জিজ্ঞাসা করলেন,—“কেবলমাত্র আপনার এই অহিংস সত্যাগ্রহে দেশের মুক্তি কি সম্ভব ?” “ঠিকভাবে প্রয়োগ হলে কিছু অসম্ভব নয়”—গান্ধীজী উত্তর করলেন। “কিন্তু মৃত্যু ভয় জয় করে সংগ্রামীর মনে-প্রাণে অহিংস থাকা চাই. দক্ষিণ আফ্রিকায় এ শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কিন্তু সত্যাগ্রহীই হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠলে এ অস্ত্র তখন দুর্ব্বল। তুমি চিত্তরঞ্জন-দাসের সঙ্গে দেখা কর এবং তার উপদেশ মত কাজ কর।” সুভাষচন্দ্র কোলকাতায় এসে চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করে দেশের সেবায় সম্পূর্ণ তারই সহকর্মী ও অনুগামী হলেন। এর পূর্বে তাঁর সহকর্মী হয়েছেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, ডাঃ যতীন্দ্রমোহন দাশগুপ্ত সহ দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের বৃহৎ এক অংশ। সবার প্রথম চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে হোল স্তূপীকৃত বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। হোতা স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। উৎসবের পর তার ছাই ললাটে মেখে ভৃগুরামের মত দুর্বার প্রতিজ্ঞায় শুরু হোল তার পথ পরিক্রমা। অত্যল্প দিনের মধ্যে তাকে বেষ্টন করে গড়ে উঠল বিরাট এক স্বেচ্ছাসেবক দল।

এই সময় ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ এলেন ভারত পরিদর্শনে। সরকারের পক্ষ থেকে আড়ম্বর পূর্ণ তার সম্বর্ধনার বিপুল আয়োজন। কিন্তু কংগ্রেসের নির্দেশ হরতাল ও অসহযোগের মাধ্যমে তাকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ করার। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ঐ স্বেচ্ছাসেবকদল সতর্কতার সাথে শান্তি সর্বত্র বজায় রেখে হরতাল ও অসহযোগিতার মাধ্যমে এ উৎসব সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে। সাথে সাথে সরকার অর্ডিন্যান্সবলে ঐ স্বেচ্ছাসেবক দলকে বেআইনী বলে ঘোষণা করে। ঐদিনই তারপর পুলিস চিত্তরঞ্জন এবং সুভাষচন্দ্রকে গ্রেফ্‌তার করে। দু'জনেরই হয় ছ'মাস করে কারাদণ্ড। এসময় রহস্যজনক কোন গুপ্তমন্ত্রের প্রভাবে বোম্বাই-এ হঠাৎ দাঙ্গার উত্তেজনা। গান্ধীজী এর প্রতিবাদে করলেন অনশন

সত্যাগ্রহ। তার মাত্র কয়েকদিন পরে গোরক্ষপুর জেলার চৌরি-চৌরায় একটি মিছিলকে আক্রমণ করে পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালায়। অহিংসার কথা ভুলেগিয়ে মিছিলের জনতা তখন ক্রোধে উন্মত্ত ও মারমুখো হয়ে ওঠে। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত জনতার শুরু হয়ে যায় তাণ্ডবনৃত্য। থানার চারিদিক ঘিরে ফেলে তারা ধরিয়ে দেয় আগুন। আগুনের বেড়াজালের অভ্যন্তরে, নিরুপায় বন্দী দশায় একশ'জন পুলিশ কর্মচারী জীবন্ত দগ্ধ হয়। অভাবিত ভয়াবহ এ সংবাদ কানে পেঁছানমাত্র, মর্ম্মাহত গান্ধীজী তার পরবর্তী আন্দোলন বন্ধ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। কার্য্যসূচী ছিল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী বারদৌলীতে কর বন্ধ আন্দোলন সুরু করার। কংগ্রেসে তখন এই সংকল্পের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। কিন্তু হিমাচলের মত গান্ধীজী তাঁর সংকল্পে অটল। কারণ তাঁর জীবনদর্শন ও রাজনীতি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত সত্যের স্বচ্ছ নির্দেশে সর্বদা হোত পরিচালিত।

সত্যাগ্রহ গান্ধী জীবনে সত্যের অন্বেষণ,
সত্যাগ্রহ অহিংস পথে সত্যের আচরণ।
দীন হীন যারা মজুর কিষাণ চিরকাল এই দেশে,
কটিবাসে আসি তাহাদের পাশে দাঁড়ালেন ভালবেসে।
জাগে দেশ তাঁর শুভ নির্দেশে মেতে ওঠে তাঁর নামে,
চরকার ধ্বনি বহে তাঁর বাণী দূর হতে দূর গ্রামে।
গাহে তাঁর গান মিলিত কণ্ঠে হিন্দু মুসলমান,
অম্বর ভেদি ওঠে জয়নাদ একজাতি এক প্রাণ।
সাম্প্রদায়িক বিবাদ ঘুচিল সত্যের নির্দেশে,
কত মহাজন ধন মান প্রাণ বিলাইল নিঃশেষে।
সত্যাগ্রহ—সত্যের পথে শক্তি উদ্বোধন,
সত্যের তরে জীবন সঁপিতে দমিবেনা কোনজন।

এর পর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পর পর আপত্তিক

তিনটি প্রবন্ধ লিখে তিনি গ্রেফ্‌তার হন। আর বিচারের পর ছয় বছরের জন্য হয় তাঁর কারাদণ্ড।

এদিকে মুস্তাফা কামালের নেতৃত্ব তুরস্কে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটায়। প্রতিষ্ঠিত হয় ধর্ম্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র। ধর্ম্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার ভূত তুরস্কে তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসে তখন ভারতবর্ষে। সযত্নে লালিত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপদ আশ্রয়ে। প্রতিষ্ঠিত করে আপনাকে ধর্ম্মের নামে দ্বিজাতি-তত্ত্বের মিথ্যা বনিয়াদের উপর। তারপর থেকে থেকে দিকে দিকে শুরু হয় তার ধ্বংসের তাণ্ডব নৃত্য। আর শেষ পরিণতিতে বহু তপস্যা ও রক্ত ক্ষয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েও সাম্প্রদায়িকতার করাল খড়্গে হয় ছিন্নমস্তা।

সারা ভারতের নেতৃবৃন্দ একে একে প্রায়ই যখন কারারুদ্ধ তখন অহিংস আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে শেষে একেবারে নিবে যায়। বিপ্লববাদ আবার তখন গোপনে সক্রিয় হয়ে চারিদিকে আত্মপ্রকাশ করে।

কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামে অহিংস নীতি পবিত্র অন্তরে সারা ভারতে মাত্র অত্যল্প লোকই গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃত সত্যের উপর এই নীতির বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। তাই জওহর লালের দৃষ্টিতে ছিলেন গান্ধীজী ভারতীয় চির সত্য ও শাশ্বত আত্মার মূর্ত প্রতীক। সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে, বিক্ষুব্ধ ঝড়ের পারাবারে পারাপারের উপযুক্ত কাণ্ডারী। প্রেমের জগতে তাই তাঁর স্থান বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, নিতাই ও শ্রীরামকৃষ্ণের পাশে। আর আজকের আণবিক যুগে রক্তপিচ্ছিল পৃথিবীর ললাটে দূরদর্শী বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে তিনি অহিংসা ও সত্যরূপে দিগদর্শন ধ্রুবতারা।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩শে মার্চ। গান্ধীজীর বিচারের পর আদালত বন্ধ হয়ে গেল। দিনমান যখন যায় যায়, অনুরাগী বন্ধুবান্ধবরা একে একে সবাই বিদায় নিলেন। সবার চোখে জল। সবশেষে বিষণ্ণ ম্লান সন্ধ্যায়, সিপাহী প্রহরায় গান্ধীজীকে সবরমতী জেলে নিয়ে যাওয়া হল। ঐ বছরেই গয়া কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হলেন চিত্তরঞ্জন। মতিলাল নেহেরুর সমর্থনে কাউন্সিল প্রবেশের জন্য স্বয়ং তিনিই মহাসভায় এক প্রস্তাব আনলেন।

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনসংস্কারের পরে প্রদেশগুলির শাসনযন্ত্র দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। পুলিশ, আইন ও কর বিভাগ সম্পূর্ণ ব্রিটিশ শাসন

করায়ত্ত রেখে, অপ্রয়োজনীয় বোধে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ভার অর্পণের জন্য মহাসমারোহে আহ্বান জানানো হল প্রদেশগুলিকে। এ যেন সাম্রাজ্য বৃক্ষের বিশেষ এক সুমিষ্ট ফল। তার রস নিংড়ে ভাণ্ডারে গচ্ছিত রেখে, অনাবশ্যক বোধে বীচি আর খোসার ব্যাপক বিতরণ। কারণ এই শুকনো খোসায় আগুন ধরে যদি রসের ভাণ্ড গ্রাস করে—এই ভয়ে আইনত এটুকুও কেড়ে নেবার অধিকার অটুট রেখে। কিন্তু এই যৎসামান্য পাওয়ার সবটুকুরই সদ্ব্যবহার করতে চাইলেন চিত্তরঞ্জন, কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব এনে। কিন্তু গান্ধীপন্থীরা সংখ্যায় বিপুল হয়ে করলেন এর প্রতিবাদ। তাদের যুক্তি হল, ব্রিটিশ স্বার্থের প্রতিকূল কোন প্রস্তাব আইনের চোরাপ্যাঁচে ধরাশায়ী হতে বাধ্য। আর দেশবন্ধুর যুক্তি, "তবুও কাউন্সিলে সৃষ্টি হবে প্রবল এক উত্তেজনা, আর তার ঢেউ বাইরের জনমানসে প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করবে"। ভোটে শেষপর্যন্ত পরাজিত হলেন চিত্তরঞ্জন! কিন্তু এজন্য কংগ্রেস তিনি ত্যাগ করলেন না, ত্যাগ করলেন তাঁর সভাপতিত্ব। মতিলাল নেহেরুর সাহচর্যে গঠন করলেন স্বরাজ্যদল। অনুগামী হলেন তাঁর সুভাষচন্দ্র, জে. এম. সেনগুপ্ত, বিঠল ভাই প্যাটেল, কিরণশঙ্কর রায়, বীরেন শাসমল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। বাংলাদেশে এই দলের প্রচারের জন্য সুভাষচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বাংলার কথা' নামক এক পত্রিকা প্রকাশিত হল। তারপর জাতি সংগঠনের দুর্বার প্রতিজ্ঞায়, সারা-ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকায় অবতীর্ণ হল তখনকার স্বনামধন্য ইংরেজী পত্রিকা, 'ফরওয়ার্ড'। চিত্তরঞ্জনের সম্পাদনা ও সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় উক্ত 'ফরওয়াড' কাগজের মাধ্যমেই বাংলা ও ভারতের বিপ্লবী সমাজের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের আন্তরিক যোগসূত্র আরও নিবিড় হয়। প্রতিটি জিলার বিভিন্ন অঞ্চলে গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের জন্য আবার প্রস্তুত হয় বাংলার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বিপ্লবী সমাজ। আন্দামান থেকে ফিরে আসা শচীন সান্যাল রাসবিহারীর বিদায় মুহূর্তের আদেশ স্মরণ করে, আবার আগুনের খেলায় মেতে ওঠেন। এবার এ পথে একান্ত ভাবে তাঁর সাথী হন রাজেন লাহিড়ী, যোগেশ চট্টোপাধ্যায় ও পরবর্তী কালের দধীচি যতীন দাস। সারা উত্তর ভারত ব্যেপে আবার গড়ে ওঠে এক গোপন বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান আর অপর পক্ষে সারা ভারতে আবার পুলিশ ও গোয়েন্দাবাহিনীর তৎপরতা দেখা দেয়।

কালের চক্রাবর্ত্ত ইতিপূর্বে ২৩ খ্রীষ্টাব্দে পদার্পণ করেছে। এই সময় ভোটের বলে কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব দখল করে নিল স্বরাজ্যদল। বহুপূর্বের সুরেন্দ্রনাথের আরব্ধ প্রচেষ্টা এইবার সফল হল। মেয়র হলেন চিত্তরঞ্জন, ডেপুটিমেয়র সুরাবর্দী সাহেব, আর প্রধান কর্ম্মকর্তা সুভাষচন্দ্র। এ সময় বিপ্লবের প্রচেষ্টায় অধ্যাপক জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষের নির্দেশ ও সন্তোষ মিত্রের নেতৃত্বে কলকাতায় বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। একদিন জনসাধারণকে চমকে দিয়ে শাখারীটোলা পোষ্ট অফিসে গর্জে উঠলো বিপ্লবীর হাতের রিভল্বার। পোষ্টমাষ্টার অমৃত রায়ের বুকের উপর রিভল্বার উচিয়ে ধরে—দাবী করা হল ক্যাশের গচ্ছিত সব টাকা। কিন্তু অসম্মত ও অবাধ্য হওয়ায়, গুলি খেয়ে আর্তচিৎকারে মৃত্যুর কোলে তিনি ঢলে পড়লেন। ছুটে এলো চারধারের কৌতূহলী প্রতিবেশীর দল। বিপ্লবীরা তৎক্ষণাৎ চারদিকে চারজন পলায়ন রত। একটু পরে সেন্ট্ জেমস্ স্কোয়ারে ধরা পড়ে গেলো বরেন ঘোষ নামে এক বিপ্লবী। এদের দলনেতা ছিলেন সন্তোষ মিত্র।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১২শে জানুয়ারী। প্রাতঃকাল। গড়ের মাঠের বিস্তৃত অঞ্চল বালসূর্যের রক্তিম আলোকে অরুণাভ। এই সময় অভ্যাসমত চৌরঙ্গীর পথে ময়দানে বেড়াতে বেরিয়েছে কিলবার্ণ কোম্পানীর এক সাহেব—নাম আর্নেষ্ট ডে। ভ্রমণের পর মাঠ অতিক্রম করে দাঁড়িয়েছেন এসে 'হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসন' এর সম্মুখে। সাহেবের চেহারা ও চলার ধরন, অবিকল টেগার্ট সাহেবের মত। পথ জনহীন, মাঠের মাঝে ইতস্ততঃ ভ্রমণরত দু'চারজন মাত্র লোক। গোপীনাথ ছিল তখন সর্বদা টেগার্টের অনুসরণকারী। চোখের ভ্রমে আর্নেষ্ট ডে-কে টেগার্ট ভেবে, গর্জে উঠলো গোপীনাথের হাতের রিভলবার। অকস্মাৎ বজ্রাহতের মত সাহেব মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। পর পর আরও দুবার গুলি, তারপর গোপীনাথ উধাও। পথে বাধা পেয়ে আরও দুজনকে সে গুলি করে। শেষে ওয়েলেসলী ও রিপন ষ্ট্রীট-এর সংযোগ স্থলে এক সাহেব তাকে হঠাৎ জাপটে ধরে ফেলে। তখন সঙ্গে ছিল তার কার্তুজসহ একটি রিভলবার ও পিস্তল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জানুয়ারী চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পিয়ারসনের আদালতে গোপীনাথের বিচার। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গোপীনাথের বিবৃতি—সে যেন আকাশের অগ্নিক্ষরা

বজ্রবিদ্যুতের মত গুরুগম্ভীর। "আমি বিদ্রোহী ; মৃত্যুকে আমি ভয় করিনা। তাকে জয় করে ভারতের মুক্তির পথে আমার নিঃসঙ্গ একক পদযাত্রা। সঙ্কল্পে আমি অটুট ছিলাম। শুধু একটি মাত্রই আমার সঙ্কল্প ছিল। মুক্তিকামী পথিকদের প্রতিনিয়ত চলার পথের সংকটময় ঐ বিষাক্ত কণ্টককে নির্মূল করা। ধরা পড়ে যদি ফাঁসিও যাই, তাহলে ক্ষুদিরামের মত হেসে হেসে অম্লান বদনে আমি মৃত্যুর আগে ঐ ফাঁসির দড়িকে চুম্বন করব। কিন্তু টেগার্টকে মনে করে চোখের ভুলে নির্দোষের প্রাণ নিয়েছি ; তাই আমি অনুতপ্ত। যখনই কানে এসেছে আমার সন্ধান ব্যর্থ হয়েছে, টেগার্ট মরে নাই, মরেছে নির্দোষ এক ইংরেজ, তখনই এখবর তীক্ষ্ণ তীরের মত আমার অন্তরকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে। শত্রুর এই আদালতে আমার কোন নালিস নাই, প্রার্থনাও নাই। ঈশ্বরের আদালতে আমার একটিমাত্র শুধু প্রার্থনা, যে আমার মৃত্যুর পরে আমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু যেন দেশের মুক্তির জন্য তরুণদের প্রাণে প্রেরণা যোগায়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হোক, স্বাধীন ভারত কী জয়! বন্দে মাতরম্!"

মহাশক্তিরূপে, ধ্যানে, জাগো গো ভারতজননী।
সন্তান অসহায়, ধরা হতে মুছে যায়,
বন্ধন দশা তোর, বুকে ঘোর অশনি।
ছিনায়ে লয়েছে কাল বক্ষের মণিহার,
ম্লান মুখে ঝরে যায় কাননের ফুলভার,
ফুল্ল কুসুমদলে হাসি নাহি ঝলমলে,
দেখিতে পারিনা রূপ কঙ্কালআভরণী।
আবার জনম হলে, কভু এই ধরাতলে,
পোড়া প্রাণ জুড়াইতে আসি যেন তোরি কোলে,
ঘুচাইতে ব্যবধান, বন্ধন অপমান,
জনমে জনমে মাতঃ শ্যামলবরণী।

ছয়

গোপীনাথ ছিলেন শ্রীরামপুরের ক্ষেত্রমোহন সাহা লেনের অধিবাসী। বয়সে কিশোর। স্থানীয় স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। কিন্তু এত অল্প বয়সেই বজ্রবিদ্যুৎ ভরা, রক্তমাংসে গড়া একটি জীবন্ত বিস্ফোরণ। ১লা মার্চ গোপীনাথের শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হল। কারার নিভৃত অন্ধকার অন্তরালে গলায় ফাঁসির দড়ি পরে, হোমের আগুনে বুকের তাজা সবটুকু রক্ত উজাড় করে ঢেলে দিয়ে তিনি চলে গেলেন। জেলের বাইরে তখন অপেক্ষমান শহরের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ ও স্থানীয় আত্মীয়স্বজন। ঠিক হলো মরদেহ নিয়ে সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় প্রথম হবে নগর পরিক্রমা, তারপর শ্মশান যাত্রা। মরদেহ বের করে দেবার জন্য বার বার তাই দাবী পেশ করা হল। কিন্তু এ দাবী গ্রাহ্য হলনা। সৎকারের জন্য জনচারেক আত্মীয়কে ভিতরে প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হল মাত্র। বহু চেষ্টার পর পাওয়া গেল তার পরিধেয় বস্ত্রের ছোট একটি টুকরো। তাই নিয়েই হরিশপার্কের দিকে এগিয়ে চলল জনতার মিছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে এক শোক সভার আয়োজন। ঐ সভায় সুভাষচন্দ্র গোপীনাথের কথা বলতে উঠে এই ব'লে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন,—"জেলখানার এই ইংরেজের গোলামেরা জানেনা যে, শহীদের চিতা প্রকৃত বিপ্লবীর বুকে উজ্জ্বল দীপ্তিতে অনন্ত বিভূতির মহিমায় চির কাল বহ্নিমান। যখনই সুযোগ আসে, সে আগুন বাসুকির ফণার মত সহস্র শিখা বিস্তার করে সাম্রাজ্যকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়।"

এরপর তিনি আর যান কোথায়! পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখেন, গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে পুলিসবাহিনী। সেদিন ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর। সুভাষচন্দ্রকে প্রথম নিয়ে রাখা হল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হল বহরমপুর, তারপর দেওয়া হল তাঁকে সুদূর ব্রহ্মদেশে মান্দালয় জেলে নির্বাসন।

সুভাষচন্দ্রের এই অবৈধ গ্রেফ্‌তারের বিরুদ্ধে, সভাসমিতিতে সোচ্চার হয়ে

উঠলো বাংলার জনসাধারণ। 'ফরওয়ার্ড'-এ চিত্তরঞ্জনের সেদিনকার প্রতিবেদন ছিল অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী অগ্নিক্ষরা,—"গোপীনাথের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রশংসা তো আমিও করেছি; আমাকে তাহ'লে জেলের বাইরে কেন তোমরা এখনও রেখে দিলে? গোপীনাথের ফাঁসি, সুভাষের জেল, তারপর চিত্তরঞ্জনের এইরূপ বিবৃতিতে চারধারের আগুনের উত্তাপ আরও বেড়ে উঠলো।

দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের নানাবিধ উন্নয়ন মূলক কাজে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন তখন সুভাষচন্দ্র। এ সময় তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে, দেশবন্ধুর রোগজীর্ণ হাতের সম্বল লাঠিখানিকে সরকার আচমকা ছিনিয়ে নিয়ে গেলো।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর কলিকাতায় চিত্তরঞ্জনের জন্ম। পিতার নাম ভুবনমোহন দাস। পিতৃপুরুষদের নিবাস ঢাকা বিক্রমপুরে। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করার পর, বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে এলেন। প্রথম অবস্থায় পসার ভাল জমল না। তারপর আরম্ভ হল ভারত বিখ্যাত আলিপুর মামলা। উক্ত মামলায় তাঁর আইনের অকাট্য যুক্তিতে শ্রীঅরবিন্দ মুক্তিপাওয়ার পর তাঁর যশোগাথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হয়ে তাঁকে ঐশ্বর্যের সর্বোচ্চ শিখরে তুলে দেয়। প্রার্থীদের দু'হাতে দান ও অজস্র ব্যয় করেও, তাঁর ধন ভাণ্ডার দিনের পর দিন্ ক্রমশই বেড়ে ওঠে। অথচ অপার ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও মন ছিল তাঁর সর্ব বিষয়ে অনাসক্ত। মহাপ্রভুর বৈষ্ণব প্রেমধর্ম্মের তিনি ছিলেন পূর্ণ প্রতীক। তাই তাঁর হৃদয়ের গোপীযন্ত্রে প্রতিনিয়ত ঝংকৃত হয়ে উঠতো বৈষ্ণব কবিতা। এত কাজের মধ্যেও তিনি ছিলেন বাণীর একনিষ্ঠ সাধক ও সমসাময়িক একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর মানস বনের চয়নিত ফুলসম্ভারে সাজানো 'অর্ঘ্য'—ও ভক্তির উপাদানে গড়া 'নৈবেদ্যের' থালি, যেন তাঁর অন্তরের উপাস্য দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত—ভক্তি ও ভাবের একত্র সমাবেশে বৈষ্ণব ধর্মী হয়ে সেকালের অগণিত বিদগ্ধ পাঠকের চিত্তলোক জয় করেছে। তাঁর লিখিত গ্রন্থাবলীর পরিচয়—'মালঞ্চ', 'মালা,' 'অন্তর্যামী,' 'কিশোরী' ও 'সাগর সঙ্গীত'। এছাড়াও তিনি প্রকাশ করেছিলেন দীর্ঘদিন ধরে 'নারায়ণ' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর অধিবেশনের পূর্বে স্বাধীনতার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তিনি

ঐশ্বর্যের সর্বোচ্চ শিখর থেকে মাটির ধূলায় গান্ধীজীর পাশে নেমে এলেন বিলাতি বহুমূল্য পোষাক আগুনে আহুতি দিয়ে। তাঁর পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয় হল তখন মোটা খদ্দরের থান। শুধু তাহাই নহে, নিজের বলতে যা কিছু ছিল, স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি দেশ ও দশের সেবায় বিলিয়ে দিলেন। হলেন অগণিত দরিদ্র দেশবাসীর প্রকৃত বন্ধু। তাই তাঁর নামের আগে যুক্ত হল “দেশবন্ধু”। হলেন চল্লিশ কোটী দেশবাসীর অন্তরের মুকুটহীন রাজা।

এইভাবে রাজঐশ্বর্যের তুঙ্গ হতে পথের ধূলায় নেমে এসে অত্যধিক শ্রমে দেহ তাঁর একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। এ সময় দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশন যখন কাউন্সিলে প্রবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, গান্ধীজী তখন রাজনীতি থেকে কিছু দিন ধরে একটু দূরে গিয়ে রইলেন। ফলে দেশবন্ধুর কাজের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। ঠিক এই সময়ই আমেরিকার সাথে তার বাংলা দেশের পাটের এক গোপন ব্যাণিজ্যিক চুক্তির পাকা বন্দোবস্ত গেল ফাঁস হয়ে! আর এ ব্যাপারে ইংরেজ সরকার বিশেষ বিচলিত হয়ে দেশবন্ধুকে জানালো যে, তিনি যদি গান্ধীজীর উপস্থিতিতে আপসের প্রস্তাব কংগ্রেস হতে পাশ করাতে পারেন, তবে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য গোল টেবিল বৈঠকে সরকার সম্মত থাকবেন। এই জন্যই গান্ধীজীর উপস্থিতিতে ফরিদপুর শহরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের আয়োজন। সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। এসব কারণে শ্রম ও চিন্তার বোঝা আরও ভারী হয়ে তার উপর চেপে বসলো। প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর দেশবন্ধু কলকাতায় ফিরে এলেন। তারপর বিশ্রাম ও চিকিৎসার জন্য চলে গেলেন দার্জিলিং। কে তখন জানতো, কলকাতা ছেড়ে যাওয়া এই তার শেষ যাওয়া!

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন সারাভারতবর্ষকে চোখের জলে ভাসিয়ে, ট্রেনে চেপে শিয়ালদা স্টেশনে ফিরে এলো তাঁর নশ্বর মরদেহ। লক্ষ লক্ষ জনতার শোক মিছিল তাঁর মরদেহ বহন করে ভবানীপুরের বাড়িতে নিয়ে গেলো। সেখানে এবং শ্মশানে চিত্তরঞ্জনের পারিবারিক লোকজনের সাথে শোক সন্তপ্ত চিত্তে সর্বদা উপস্থিত ছিলেন মহাত্মাগান্ধী। এই মহাপুরুষের তিরোধানের পর

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

“এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান”।

নজরুল ইস্‌লাম্ লিখলেন,

"তুমি দেখেছিলে ফাঁসির গোপীতে, বাঁশির গোপী মোহন।
রক্ত-যমুনা কূলে রচে গেলে, প্রেমের বৃন্দাবন"।

নশ্বরদেহ ভস্মীভূত হল কেওড়াতলার মহাশ্মশানে। আর অবিনশ্বর আত্মার জ্যোতি ছড়িয়ে রইল দেশের সর্বত্র। অমরাত্মা সর্বত্যাগী শিবের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল, চল্লিশ কোটী ভারতবাসীর হৃদয় মন্দিরে।

* * * *

হলে দেশের লাগি সর্বত্যাগী হে চিত্তরঞ্জন,
দেশের অন্তরে তাই তোমার তরে পাতা রাজার সিংহাসন।
তুমি সকলেরে সমান হারে দিলে ভালবাসা,
ত্যাগ করিলে সেবার তরে গৃহসুখের আশা।
হল বাসের ভবন সেবা সদন—
ত্যাগের এমনি মহাজন, তুমি এমনি মহাজন।
তোমার বুকের মাঝে উঠলো বেজে বৈরাগীর একতারা,
কাঁধে নিলে ভিক্ষাঝুলি চোখে জলের ধারা।
—মন মন্দিরেতে দিল সাড়া সেবার তরে নারায়ণ।

চিত্তরঞ্জনের তিরোভাবের সময়, গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় সুভাষচন্দ্র ছিলেন মান্দালয় জেলে। অকস্মাৎ এই হৃদয়বিদারক সংবাদ তাকে খুবই বিচলিত করে। এর প্রধান কারণ, চিত্তরঞ্জন ছিলেন তার কাছে ঘরের নিতান্ত আপন জনদের থেকেও অধিক আপন। এছাড়াও দেশের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে। নানা জাতি, নানা মতের বিপুল জনসমুদ্রে, শক্ত হাতে তাঁর মত হালধরার হিম্মত আর কজনেরই বা আছে! জ্বরে ও দুশ্চিন্তায় দিনের পর দিন কৃশ হয়ে শরীর তার আরও ভেঙ্গে পড়ল। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর মেডিকেল বোর্ড নির্দেশ দিল হাওয়া বদলের জন্য। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, এরপর তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ব্রহ্মদেশের আর এক প্রান্তের ইনসিন জেলে। সেখানে বহুদিন থাকার পরও তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হলনা। আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ অনুরোধে আর একবার তখন তাঁকে ডাক্তারী পরীক্ষা করা হল। কর্তৃপক্ষের নিকট সে রিপোর্ট দুশ্চিন্তার কারণ হওয়ায়, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের

১৬ই মে দীর্ঘ আড়াই বছর পর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। বাইরে এসে চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে সুভাষচন্দ্র পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে নিখিল ভারত কংগ্রেসের যুব সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে ভলান্টিয়ার বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়ক রূপে দেখা গেল সুভাষচন্দ্রকে।

পরবর্তী ঘটনা একটি যাত্রীবাহী ট্রেন কাকোরী স্টেশন থেকে, অতি দ্রুত তালে আলমনগরের দিকে ছুটে চলেছে। এমন সময় ভিতর থেকে চেন টানায়, এক ঝাঁকুনি খেয়ে তৎক্ষণাৎ ট্রেন থেমে গেল। এ কাজ ছিল অসম সাহসী বিপ্লবী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর। এই ষড়যন্ত্রের উদ্যোক্তা ও দলনেতা ছিলেন স্থানীয় তরুণ বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিস্‌মিল। সঙ্গে সঙ্গে আট দশ জন তরুণ কিশোর গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে—পাঁচজন ঝড়ের বেগে দৌড়ে গিয়ে উঠলো গার্ড সাহেবের কামরায়। বাকি আর ক'জন পিস্তল উচিয়ে দরজায় প্রহরায় রত। ভীত ত্রস্ত যাত্রীদের তাঁরা যে যার আসনে চুপ করে বসে থাকার নির্দেশ দিলেন। গার্ড ডাইভার দুইজনেই এদের হাতে উদ্যত পিস্তল দেখে ত্রাসে হতবাক। এদের মধ্যে একজন গার্ড সাহেবকে বললেন,—আমাদের কাজে বাধা দিলে অনিবার্য মৃত্যু। আমরা শুধু মেল-ভ্যান এর সিন্দুক ভেঙ্গে টাকাগুলো নিয়ে, আবার যথাস্থানে চলে যাবো। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সিন্দুকের তালা লোহার চাড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেলে, সব টাকা হস্তগত করে সবাই লক্ষ্মৌ শহরের দিকে উধাও। আকাশে তখন ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য। পরদিন এই দুঃসাহসিক ডাকাতির বিস্তৃত বিবরণ পাঠ করে, আতঙ্কে মানুষ শিউরে উঠলো। আর ইংরেজ সরকারেরও বুঝতে বাকী রইল না যে, ঝড়ের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে, কারা এই বেপরোয়া মৃত্যুঞ্জয়ীর দল।

দীর্ঘ একমাস ধরে সর্ব্বত্র অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের পর শুরু হল ধরপাকড়। যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, রামপ্রসাদ বিস্‌মিল, রোশেন সিং এবং আসফাকুল্লা সহ মোট চুয়াল্লিশজনকে যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেফ্‌তার করা হল। কিন্তু হায়! শাস্তির ভয়ে ও নানা ভাবে প্রলুব্ধ হয়ে, দুজন এদের মধ্যে থেকেও সর্বনাশা রাজসাক্ষি হয়ে দাঁড়ালো। নাম—বারানসীলাল কাকোশ, ও ইন্দুভূষণ মিত্র। জেল থেকে তৎক্ষণাৎ হলো তারা অন্যত্র স্থানান্তরিত।

কিন্তু ধরা গেলনা কিছুতেই রাজেন লাহিড়ীকে। ২৬শে সেপ্টেম্বর যুক্তপ্রদেশের সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সর্বপ্রথম হানা দেয় তার কাশীর বাড়িতে। না পেয়ে, হন্যে হয়ে শেষে প্রদেশের সর্বত্র চষে বেড়ায়। রাজেন্দ্রনাথ তখন দক্ষিণেশ্বরে, বাগানের ভিতর পরিত্যক্ত ভেঙ্গে পড়া, জরাজীর্ণ একটি কুঠীতে। বিশেষ উৎসাহে তখন তিনি বোমা তৈরীর কাজে ব্যস্ত, সঙ্গে সহকর্মী প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী, অনন্তহরি মিশ্র, রাখাল দে। এছাড়া আরও আট দশ জন শিক্ষার্থী যুবক। এ সময় অনুরূপ আর একটি আস্তানা ছিল শোভাবাজারে।

সর্বদা অনুসন্ধানরত গোয়েন্দাপুলিশের চোখ অচিরেই এই গুপ্ত স্থানদুটি আবিষ্কার করে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ১০ই নভেম্বর রাত্রিযোগে বেড়াজালে আবদ্ধ ক'রে, অনেকগুলি রিভলবার, পিস্তল ও বোমাসহ সকলকে গ্রেফ্‌তার করে। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী ঐ রাজেন লাহিড়ীকে হস্তান্তর করা হল যুক্তপ্রদেশের পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। আর দক্ষিণেশ্বরের বোমা তৈরীর মামলা সাজানো হল বাকী আর সকলের বিরুদ্ধে। সকলকে ধরে এনে রাখা হল সেণ্ট্রাল জেলের বোমা ইয়ার্ডে। এই সময় গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপার ছিল রায়বাহাদুর-খেতাব-ধারী বিপ্লবীদের চরমশত্রু ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সন্ধ্যায় রোজই তার যাতায়াত ছিল পাশের ইয়ার্ডে। উদ্দেশ্য আলাপে গল্পে সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে তথ্য সংগ্রহ করা। সেদিন ছিল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে; যথারীতি রায়বাহাদুরের আবির্ভাব। পাশের ওয়ার্ডের বাইরে আসামাত্র বিপ্লবীরা জেল থেকেই কৌশলে সংগৃহীত লৌহদণ্ডের দ্বারা রায়বাহাদুরের মাথাটাকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। অসহায় আর্তনাদে রায়বাহাদুর মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে নরেন গোঁসাই এর হত্যাকাণ্ডের পর, আর একবার আতঙ্কে ও আর্তচিৎকারে শিউরে উঠলো ইংরেজের জেলখানা। বোমার মামলার উপরে আবার তখন চাপলো নূতন করে হত্যার মামলা। স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচার হল। বিচারে অনন্তহরি, প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হল চরম দণ্ডাদেশ। তিন জনের হল দ্বীপান্তর। বাকী অন্যরা রায়বাহাদুরকে হত্যার মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন। আপীলে বীরেন্দ্রের উপর থেকে চরম দণ্ড তুলে নেয়া হয়। অনন্তহরি ও প্রমোদ রঞ্জনের ফাঁসী হল ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে।

দীর্ঘদিন পর ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার রায় বের হল। তাতে ফাঁসীর হুকুম হল রামপ্রসাদ বিস্‌মিল, আসফাকৃউল্লা, রোশেন সিং ও রাজেন লাহিড়ীর। বাকী যারা তাদের মধ্যে কয়েকজনের হল দ্বীপান্তর আর ক'জনের হল পাঁচ থেকে দশবছরের মত কারাদণ্ড। পনের জনকে বেকসুর খালাস দেওয়া হল। বিচারের রায় ঘোষণার পর বন্দীদের "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো আদালত প্রাঙ্গণের আকাশ-বাতাস।

রামপ্রসাদ, রোশেন সিং ও আসফাকৃউল্লা—তিনজনেই ছিলেন শাহজাহান-পুরের অধিবাসী। আর রাজেন লাহিড়ীর বাসস্থান ছিল কাশীতে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে পাবনা জেলায় ভারেঙ্গা গ্রামে মাতুলালয়ে রাজেন্দ্রের জন্ম। ছাত্রজীবনে ছিলেন কাশীর অধিবাসী। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, তিনি ছিলেন সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজের ছাত্র। যুক্তপ্রদেশের বিপ্লবী নেতা যোগেশ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কানপুরে ঘটে তাঁর প্রথম পরিচয়। আর তাঁরই পরামর্শ ও আদর্শে উৎসাহিত হয়ে পরবর্তীকালে হলেন তাঁর একনিষ্ঠ সহকর্মী। পরে যোগেশ চ্যাটার্জ্জীর নির্দেশেই প্রতাপগড়ে গড়ে উঠলো তাঁর বৈপ্লবিক কর্ম্মস্থল। ওখানে বসেই শাহজাহানপুরের বিপ্লবীদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। আর এই ভাবেই সারা যুক্তপ্রদেশের বিপ্লবী সমাজ মালার মত একই কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত হয়; যেন ভিন্ন ভিন্ন কানন হতে আহরিত রক্ত জবার মালা। উদ্দেশ্য চল্লিশ কোটী গণদেবতার মুক্তির জন্য রক্ততীর্থের অগ্নিবেদীতে উৎসর্গিত হওয়া।

আমার প্রাণ যেন যায় মা তোর সেবায়
বসে অভয় চরণ তলে।
যেন দিনের শেষে অঙ্গ জুড়াই
বিছিয়ে আঁচল শ্যামল কোলে।
মাগো, কিরীটে তোর কনক কিরণ
অঙ্গে রতন শ্যামাবরণ,

কালো মেঘেরা তোর ধোয়ায় চরণ
—অঝোর ঝরা চোখের জলে।

সারা অঙ্গে মেখে মা তোর ধূলি
আমার ফুটলো মুখে মা-মা বুলি।
ভবের দিন ফুরালে তোরই ধূলায়
যেন লুটিয়ে পড়ি মা-মা বলে।

বাংলা ও যুক্তপ্রদেশে একসঙ্গে এতগুলি জেল, দ্বীপান্তর ও ফাঁসির পরে ভারতের বিপ্লববাদ কিছুদিনের জন্য যেন বেশ একটু থমকে যায়। তখন গান্ধীজীর অনুরোধে ব্যাপক হারে পুরাতন রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু পরাধীনতার অসহ্য দুঃখ-কষ্ট ও গ্লানি বহন করে বুকে যাদের আগুন জ্বলে ওঠে, স্বাধীনতা না পেলে সে আগুন কখনও নেবে না। পরাধীন দেশে বিপ্লববাদ অমর,—কিছুকাল পরেই এ কথা স্পষ্ট বোঝা গেল প্রথমে লাহোরে, পরে চট্টগ্রামে। লাহোরের কথাই আগে বলি, চট্টগ্রামের কথা পরে। এত গোয়েন্দার বাজপাখীর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে পাঞ্জাবে গড়ে উঠলো 'নও জোয়ান সভা'। প্রতিষ্ঠাতার নাম ভগৎ সিং। এছাড়া রাজেন লাহিড়ী, রামপ্রসাদের ফাঁসীর পরেও তাদের বৈপ্লবিক সংস্থা 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান্ অ্যাসোসিয়েসন্' চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে ভয়কে পরোয়া না করে, আবার নূতন উদ্যমে কাজ করে চলল।

আরও বোঝা গেল ঐ সব অগ্নি কিশোরদের ধরে এনে ফাঁসি দিলে হাসি মুখে এরা প্রাণ দেয়, কিন্তু নেবেনা তবুও প্রাণের জ্বলন্ত আগুন। লোকচক্ষুর দৃষ্টি এড়িয়ে, বাতাসের ভরে দাবানলের মত পাহাড় জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ে একজনের প্রাণের আগুন, নিভৃতে একশজন বিপ্লবীকে সৃষ্টি করে। সুযোগ এলে শত্রুর উপর আবার তখন বেপরোয়া ঝাঁপিয়ে পড়ে। অত্যাচারীর বুকের রক্তের উদ্দেশে উন্মত্তের মত এরা ছুটে বেড়ায়। প্রাণ দিয়েও এদের একমাত্র প্রাণের দাবী—"আমাদের দেশের আমরা মালিক"। হয়ত ধূমকেতুর মত ধূম্রজালে, কালে এরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

সারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে—এই দুশ্চিন্তা তখন ভারতসচিব সহ স্বয়ং বড়লাটের। তাই সবার মিলিত বুদ্ধিতে তখন স্থির হল, যে সাম্রাজ্য কায়েম রাখতে হলে বাঁধন একটু শিথিল করতেই হবে। বন্ধুত্বের পরিবেশে কংগ্রেসকে বশে এনে, তার ঝুলিতে আর একটু কিছু দিয়ে দেওয়া এখন একান্ত প্রয়োজন। কংগ্রেসের সাথে একটা পাকা বন্দোবস্তে এলে, এরাও সংযত হবে। তখন স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক কমিশন গঠন করা হল, ভারতের ইতিহাসে যা সাইমন কমিশন নামে কুখ্যাত। কমিশনের সাতজনের সকলেই ছিল শ্বেতাঙ্গ, কোন ভারতীয় এ কমিশনের ভিতর স্থান পায় নাই। জানা মাত্রই কংগ্রেস অতি কঠোরভাবে এই কমিশন বর্জনের নীতি গ্রহণ করে। একথা জেনেও কমিশন তার হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতে আসে। বোম্বের বন্দরে এসে পৌঁছানোর সাথে সাথে কালো পতাকা হাতে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবকের মিলিত কণ্ঠে বেজে উঠল শ্লোগান, "গো ব্যাক্, সাইমন।" আমরা তোমাদের ভিক্ষা আর চাইনা—। পালিত হল সর্ব্বত্র পূর্ণ হরতাল। কিন্তু কমিশন হাল ছেড়ে দিয়ে পালাল না। অত্যুৎসাহে লাহোরে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে আরও প্রবল বাধার সম্মুখীন হ'ল। মুহূর্তে তা পরিণত হল এক বিরাট দক্ষযজ্ঞে।

সেদিন ছিল ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর। লালা লাজপৎ রায়, মদন মোহন মালবীয়, ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ আলামের নেতৃত্বে বের হল কমিশনের প্রতিবাদে লাহোরের রাজপথে হাজার হাজার লোকের বিরাট মিছিল। সকলের মিলিত কণ্ঠে এখানেও ঐ একই শ্লোগান, "গো ব্যাক্, সাইমন"। অপমানে, ক্রোধে ও উত্তেজনায় রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো লাহোরের পুলিশ সুপার স্কট্ সাহেব ও তার সহকর্মী স্যাণ্ডার্স এর চোখ মুখ। হুকুম বের হল, মিছিলের উপর বেপরোয়া লাঠি চালাও। নির্দয়ভাবে লাঠির প্রহারে বহু স্বেচ্ছাসেবক সহ লালাজীর দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়েরক্তে ভেসে গেল। অচৈতন্য হয়ে পথের মাটিতে তিনি লুটিয়ে পড়লেন। গুরুতর এই আঘাতই হল তাঁর অসময়ে মৃত্যুর কারণ। ১৭ই নভেম্বর রক্তিম সূর্য যখন দিগন্তের শেষ প্রান্তে অস্তাচলগামী, লালাজী তখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায় ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী ও চরমপন্থী কংগ্রেস সেবী। নরমপন্থীদের

তোষণনীতি ও ভিক্ষা বৃত্তির তিনি ছিলেন অতি কঠোর সমালোচক। পাঞ্জাবে কিষাণ আন্দোলন গড়ে তোলার অপরাধে তাঁকে নির্বাসনে রাখা হয়েছিল বারমামুলুকে। দণ্ড ভোগের পর ফিরে এসে নানাদেশ ঘুরে প্রচার চালিয়েছিলেন তিনি নানা ভাবে, কেবলমাত্র শোষণের জন্য ইংরাজ রাজের কুশাসনের বিরুদ্ধে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় গড়ে তুলেছিলেন ইণ্ডিয়ান হোম লীগ নামে এক প্রতিষ্ঠান। অত্যাচার উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলতে তাঁর ভাষণ চিরদিন ছিল তেজোদীপ্ত ও অগ্নিক্ষরা।

লালাজীর তিরোধানের পর পঞ্চনদের অশ্রুবন্যায় ভারত ভেসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীদের শপথ—"লালাজীর অমর আত্মার তর্পণের উদ্দেশে ঐ দুশমন দুঃশাসনদের বুকের রক্ত চাই।" ঠিক তার একমাস পরে ১৭ই ডিসেম্বর সূর্যাস্তের পূর্বে, জনবহুল কোর্ট স্ট্রীটের উপর, আচমকা গর্জে উঠলো বিপ্লবীর হাতের রিভলবার। স্যাণ্ডার্স আর তার এক সহকর্মী চম্পালাল আর্তনাদে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। বিপ্লবীরা মুহূর্তে ভিন্নপথে হাওয়া। তখনকার মত কেউ আর তাদের খুঁজে পেলনা। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় তাদের দেখা গেল কলিকাতায়।

উক্ত ঘটনার পর দিল্লীতে বসে মতিলাল নেহেরু কমিশনকে উদ্দেশ করে স্পষ্ট কথা শুনিয়ে দিলেন—ভারত তার নিজের ক্ষমতাবলেই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার অর্জন করবে।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেস মহাসভার সভাপতি নির্বাচিত হলেন মতিলাল নেহেরু। অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি হলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন। সুভাষচন্দ্র হলেন কংগ্রেসের ভলান্টিয়ার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। মহাসভায় স্বায়ত্তশাসন আদায়ের প্রস্তাব পাশ হল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তার ইচ্ছা, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে আরও দ্রুত এগিয়ে চলা। তাই পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তিনি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন। প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেন জওহরলাল নেহেরু। কিন্তু এ প্রস্তাব পাশ হলনা। তবুও সুভাষচন্দ্র ভগ্নোৎসাহ হলেন না। পরবর্তী বৎসরের জন্য অপেক্ষায় রইলেন। নিষ্কাম দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা অর্জনের পথে, এই দ্রুত চলার আদর্শ, সারা ভারতের সমবেত বিপ্লববাদীদের মুগ্ধ করে।

তাঁর প্রাণের অকৃত্রিম আকর্ষণ, সর্বক্ষেত্রে স্বনামধন্য অনেক বাঙ্গালীকে তাঁর চলার পথের অনুগামী করে তোলে।

কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনের সমাপ্তির পরে, এদের নেতৃত্বে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' নামক একটি নূতন বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, এবং বাংলাদেশের প্রধান সহরগুলিতে তার বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করে। এছাড়া এই মহাসভায় এসেই, পরবর্ত্তী কালের তিন অমর শহীদ সূর্য্য সেন, যতীন দাস ও ভগৎ সিং এর সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। তারপর, স্বাধীনতা কোন পথে আসবে ওইখানে বিপ্লবীদের গোপন আলোচনা-চক্রের এইটিই ছিল বিষয়বস্তু। সকলেরই সুস্পষ্ট অভিমত, একটি সুসংহত কেন্দ্র সৃষ্টি করে তার নিয়ন্ত্রণাধীনে সারা ভারতের বিক্ষিপ্ত দলগুলিকে এনে জোর কদমে সংগ্রামের পথে এগিয়ে চলার। বৈপ্লবিক আক্রমণাত্মক পন্থা অনুসরণ না করলে, আত্মত্যাগের সংকল্পে বুকের শেষ রক্ত বিন্দুটিও উৎসর্গ না করলে, কেবলমাত্র নিরামিষ প্রস্তাব গ্রহণ ও আলোচনায় দেশ স্বাধীন হবেনা। এর পরেই এল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল। দিল্লীর পরিষদ ভবন আচমকা বোমার ঘায়ে থর থর করে কেঁপে উঠলো।

হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে ধরা পড়ে গেলেন ওখানে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। বিচারে দু'জনেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। দিল্লী, লাহোর ও যুক্তপ্রদেশে ব্যাপক হারে আবার শুরু হল ধরপাকড়। ৯ই এপ্রিল অকস্মাৎ ঘেরাও হল কাশ্মীর বিল্ডিং। অনুসন্ধানে পাওয়া গেল বহু অস্ত্রশস্ত্র সহ বোমা, ও বোমা তৈরীর মাল মসলা। গ্রেফ্‌তার হলেন সেখানে সুখদেব ও কিশোরী লালের সঙ্গে আরও কয়েকজন যুবক। ধরা পড়ে গেলেন বাংলার দধীচি যতীন দাস।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যতীন দাসের জন্ম। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দান করে কারাবরণ করেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে হন দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। তখনই বিপ্লবী শচীন সান্ন্যালের সাথে তার হয় ঘনিষ্ঠ পরিচয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য তার সাহচর্য্য ও কর্ম্মপন্থা, রাজেন লাহিড়ীর মত তাকেও বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। তারই ফলে তখন সৃষ্টি হল দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি নামে এক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান। শচীন সান্ন্যালের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের

বিপ্লবীদের সাথে পরবর্ত্তী কালে ঘটে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়। কলিকাতা তরুণ সমিতিতে বসেই তিনি শিখে নিয়েছিলেন বোমা তৈরীর কলা কৌশল। রংপুর রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে বাংলার বিপ্লবীদের সাথে আলোচনার পর, পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের গুপ্ত সমিতিগুলিকে বোমা সরবরাহের গুরুদায়িত্ব তখন থেকেই তিনি নিজস্কন্ধে বহন করে চলেছেন।

কিন্তু হায়! লাহোরে ধৃত ঐ সব বিপ্লবীদের ভিতর থেকেও কিছু দিনের মধ্যে জুটে গেল রাজসাক্ষী। আর তাদের কাছ থেকে সকল তথ্য সংগ্রহ করে পুলিস ওখানে নূতন উদ্যমে দাঁড় করালো, ইতিহাস প্রসিদ্ধ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা। শুধু তাই নয়। ঐ মামলায় আর একবার প্রধান আসামী করে কারার বাইরে টেনে এনে, আদালতে হাজির করানো হল ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে। তারপর বন্দীদের উপর শুরু হল অমানুষিক অত্যাচার। প্রত্যহের নিয়মিত বেত ও লাঠির প্রহার অসহ্য বোধে বন্দীরা প্রাণ দিতে কৃতসংকল্প হয়ে শুরু করল আমরণ অনশন ধর্ম্মঘট।

ক্রমে দিনের পর দিন অনশনে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে উঠলো তাদের দেহ, কিন্তু বন্দীরা সংকল্পে অটল। কর্তৃপক্ষের নিকট তাদের স্পষ্ট ঘোষণা, —পশুর মত প্রত্যহ তাদের উপর লাঠির প্রহার বন্ধ না হলে, তারা অনশন কখনও বন্ধ করবে না। বন্দীদের এই কঠোর মনোভাবে বিচলিত হয়ে উঠলো কর্তৃপক্ষ। বন্দীদের বাঁচিয়ে তোলার জন্য তখন নলের সাহায্যে পাকস্থলীতে আহার্য পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হল। কর্তৃপক্ষ তখন আরও বিপদের সম্মুখীন। জোর করে খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে প্রবেশ করাতে গিয়ে, যতীন দাসের জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হল। খবরের কাগজে এ সংবাদ প্রচার হওয়ার সাথে সাথে তার জীবন সংশয় বুঝে, সারা দেশের মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠলো। বন্দীদের দাবী মেনে তাদের মুক্তি দানের দাবিতে আন্দোলিত হয়ে উঠলো সারা ভারতবর্ষ।

যদি কোন দুর্বল মুহূর্তে অদম্য তৃষ্ণার ঘোরে জল পানের ইচ্ছা জাগে,—এই ভয়ে যতীন দাস জলের কলসী পূর্বেই আছড়ে ভেঙ্গে ফেলেছেন। এক দুই করে গুনে গুনে দেশের প্রতিটি মানুষের উৎকণ্ঠায় বাহান্ন দিন গত হয়েছে।

ভাইয়ের পাশে দিনরাত অতন্দ্র জেগে থাকেন কিরণ দাস। রক্ত মাংস সব শুকিয়ে গিয়ে, বজ্রের আগুন ভরা হাড়গুলিই তাঁর ছিল শুধু মাত্র অবশিষ্ট। অনশনরত মরণপথ-যাত্রী যতীন দাসের কাহিনী তখন দেশের মানুষের মুখে মুখে। লাহোরের দিকে কান পেতে থাকে সারা ভারতের মানুষ। একটি একটি করে আরও দশটা দিন কাটলো। এলো অনশনের তেষট্টিতম দিবস। রোষ-কষায়িত নেত্রে সূর্যদেব যখন আকাশের মাঝখানে অপেক্ষমান, আর রৌদ্রদীপ্ত বাতাসের যখন ঘন ঘন তপ্ত দীর্ঘশ্বাস, যতীন দাস তখন আগামী সংগ্রামের জন্য লাহোরের জেলে তার বজ্রাস্থি সংরক্ষিত রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তার মুহূর্ত পূর্বে একবার মাত্র ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারিত হল,—'বন্দে মাতরম্'।

উৎপীড়ন, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আয়ারল্যাণ্ডের ম্যাক্ সুইনী'র মত যতীন দাসের এই মহামৃত্যু, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ললাটে আর একবার কলঙ্ক ও পরাজয়ের কালিমা লেপে দিল। তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে রইল ইতিহাস স্বয়ং। মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধায় শির নত হল উদ্ধত জেল কর্তৃপক্ষ ও শাসকবৃন্দের। হাতের বেত আর লাঠি সাময়িক হাত থেকে খসে পড়ে, লজ্জায় যেন লুকিয়ে রইল। ইংরাজ সরকার সসম্ভ্রমে মরদেহ যখন তুলে দিল কিরণ দাসের হাতে, জেলের বাইরে তখন অশ্রুসিক্ত হাজার হাজার মানুষ অপেক্ষমান —একবার মাত্র এই মহাবীরের মরদেহ চোখে দেখার জন্য। মরদেহ বহন করে বিশাল জনতার মিছিল যখন ধীরে ধীরে ষ্টেশনের পথে এগিয়ে চলেছে, পুলিশ সুপার হেমিলটন সাহেব তখন সজল চোখে মাথার টুপি খুলে শত্রু যতীন দাসের উদ্দেশে জানালেন সশ্রদ্ধ অভিবাদন। পাঞ্জাবের বিরাট এক দল হল কলিকাতা অবধি কিরণ দাসের সহগামী। হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছানোর বহু পূর্বেই ষ্টেশন সহ গঙ্গার উভয় তীর লোকে লোকারণ্য। পুরোভাগে থেকে এবারেও মিছিল পরিচালনা করলেন সুভাষচন্দ্র। উপস্থিত বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ শোক সন্তপ্ত চিত্তে মরদেহ পুষ্প সম্ভারে ঢেকে দিল। লক্ষ মানুষের বিরাট মিছিল, নগর প্রদক্ষিণ করে উপস্থিত হল কেওড়াতলার মহাশ্মশানে। অগ্নিদানের পরে, দেহের অস্থি ভস্মীভূত হয়েও, কালের অপরাজেয় প্রভাবে ও ত্যাগের বিভূতিতে চিরকালের জন্য রইল দধীচির বজ্র হয়ে।

* * * *

তুমি দেশের লাগিয়া, তিলে তিলে দহি
তেয়াগিলে নিজ প্রাণ,
পুণ্যশ্লোক ; যতীন দাস—
ইতিহাসে লেখা, স্মৃতি পটে রেখা
উজ্জল মহীয়ান।

তুমি মুক্তির লাগি হোমানল শিখা জ্বেলে
ক্ষয়ে তিলে তিলে বুকের শোণিত ঢেলে,
দধীচির মত তেয়াগিয়া তনু,
অস্থি করিলে দান।

অস্থি তোমার বজ্রের তেজে উজলিল দশদিশি,
চমকি উঠিল আকাশে বাতাসে বিজলী অট্টহাসি
ক্ষেপিয়া উঠিল মুক্তি পাগল—
আরও চাই বলিদান।
আরও, আরও চাই বলিদান।

সাত

তারপর আরও বলিদানের জন্য মঞ্চে একসাথে এগিয়ে এলেন ভগৎ সিং, রাজগুরু, শিবরাম, সুখদেও ও বটুকেশ্বর দত্ত। জেলে বসেই স্পেশাল ট্রাইবুনালে হল তাদের বিচার। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর বিপ্লবীদের সম্মুখে ঘোষিত হল দণ্ডাদেশ। ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুখদেও ও শিবরামের মৃত্যুদণ্ড। সাতজনের দ্বীপান্তর। বাকী দুইজনের পাঁচ ও সাত বছর করে কারাদণ্ড। ফাঁসির দিন ধার্য হল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ।

ভগৎ সিং'এর পিতা কিষেন সিং ও পিতৃব্য অজিৎ সিং দুজনেই ছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রামী ও ক্ষাত্রতেজে পরিপূর্ণ। দণ্ডাদেশ শোনার সাথে সাথে নিক্ষিপ্ত বোমার মত, বিচারক কোল্‌ডষ্টিমকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠলেন ভগৎ সিং—আবার দেরী কেন? এইখানে এখনই আমাদের গুলি করে হত্যা কর। রক্তধারা চারিদিক হতে সহস্র খাতে প্রবাহিত হোক। ভাসিয়ে নিয়ে যাক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কালের করাল মহাসমুদ্রে। বুক পেতে দিচ্ছি। এই দিনকে ত্বরান্বিত কর। "বন্দে মাতরম্"। তারপর, বাইরের আকাশে বাতাসে কোটীকণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠলো তার প্রতিধ্বনি।

লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা দীর্ঘদিন ধরে যখন ট্রাইবুনালের বিচারাধীন, জলাতঙ্ক রোগীর মত লাল আতঙ্ক তখন ইংরেজ সরকারকে পেয়ে বসলো। রাজতন্ত্রের অবসানের পর, সৃজনশীল কর্ম্মমুখর রাশিয়ার দিকে দিকে যখন বিজয় উল্লাস, কালের নির্দেশে তারই বুঝি তরঙ্গোচ্ছ্বাস ভারতের আকাশে বাতাসে। বিকারের দৃষ্টি দিয়ে ইংরাজ সরকার আরও দেখল, মীরাটের আকাশের নীলিমায় সহসা যেন লালের আভাস!

এর পশ্চাতের পটভূমিকা, ইউনিয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের ঐক্যের জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের আপ্রাণ প্রচেষ্টা। এরা সকলেই তখন পর্যন্ত মূল কংগ্রেসেরই শাখা প্রশাখা। অথচ এদের ভিতরেই নাকি রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদ গোপনে গা ঢাকা দিয়ে আছে। বলশেভিক তন্ত্র নিপাতের উদ্দেশে, শুরু হয়ে গেল আবার প্রকাশ্যে ধরপাকড়। সন্দেহের বশে সর্বত্র খানাতল্লাস।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আটজন সদস্যসহ গ্রেফ্‌তার করা হল মোট একত্রিশ জনকে। মীরাটেই নাকি বৃটিশ শাসন উচ্ছেদের উদ্দেশে এদের সর্ব্বপ্রধান ঘাটি। প্রমাণ পত্র সহ বিরাট মামলা দাড় করিয়ে বিচার প্রহসনের পর একজন বাদে, সকলকেই জেলখানায় আটকে রাখা হল।

উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে একসাথে পরপর বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান, বাঙ্গলাদেশে যখন তখন রাজনৈতিক খুন, ডাকাতি; তার উপর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবীতে সোচ্চার। আতঙ্কিত হয়ে লর্ড আরউইন শেষে ছুটে গেলেন বিলেতে। ভারত সচিব সহ অন্যান্য কর্তাদের বোঝালেন, ভারতের হাতের শিকল আর একটু ঢিলে না হলে, আর ওদের রোখা যাবেনা। দেশীয় রাজ্য, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গুলি – সকলের শিকল গুলিই শক্তহাতে ধরে রেখে, চাই তাদের অধিকার সীমার যৎকিঞ্চিৎ সম্প্রসারণ। আর তারই ভিতরে স্বেচ্ছায় স্বাধীন বিচরণের অধিকার। আর এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে পূর্ব্বোক্ত দলগুলির প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে। এরপরে ভারতে ফিরে এলেন লর্ড আরউইন। পূর্বোক্ত দলগুলির সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনাও হল। ইতিহাসে এর নাম প্রথম রাউণ্ড টেবল্‌ কন্‌ফারেন্স। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা তো দূরের কথা, স্বায়ত্তশাসনের আভাস মাত্রও এতে ছিলনা। মহাত্মাগান্ধী ও মদন মোহন মালবীয় লর্ড আরউইনকে তার প্রচেষ্টার জন্য সাধুবাদ জানিয়ে কন্‌ফারেন্স বর্জন করলেন। কংগ্রেস বিনা, শিবহীন যজ্ঞের প্রহসনে পরিণত হল এই কন্‌ফারেন্স।

পরবর্তীকালে মহাত্মাজীর লবণ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সঙ্গে পুনরায় রাউণ্ড টেবিল বৈঠকের চুক্তি হল। সরোজিনী নাইডু সহ মহাত্মাগান্ধী যোগ দিলেন সেই বৈঠকে। বৃটিশ পার্লামেন্ট ও ভারত সরকারের আড়ম্বরপূর্ণ প্রচারের এতে কোন ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু নানা ব্যাপারের বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনার পর ঐ বৈঠক কার্যত কোন ফলই প্রসব করল না।

এদিকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের লাহোর কংগ্রেসে তরুণ নেতা জওহর লাল ও সুভাষচন্দ্রের জয় জয়কার। জওহর লালের প্রস্তাবিত পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ভোটাধিক্যে মর্যাদার সাথে গৃহীত হয়েছে। ইংরেজদের তাড়াতাড়ি বিদায়

করবার জন্য সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব আনলেন দ্বৈত সরকার গঠন করার। কিন্তু মহাত্মাগান্ধী দ্রুত এত দূর অগ্রসর হতে সম্মত হলেন না। অসন্তোষ প্রকাশ করে তখন সুভাষচন্দ্র বাষট্টি জন অনুগামী সহ তখনকার মত কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেলেন। হয়ত এ জন্যই ওয়ার্কিং কমিটি থেকে তার নাম বাদ পড়ে গেল। কংগ্রেসের বাইরে এসে পাল্টা গঠন করলেন তিনি কংগ্রেস ডেমক্রেটিক পার্টি। কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বে পাঞ্জাবের ছাত্রসমাজের সাথে তিনি এক সভায় মিলিত হলেন। মীরাটের বিচারালয়ে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করলেন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দিদের সাথে। যতীন দাসের তিরোধানের পর লাহোর জেলের অন্যান্য বন্দিদের মুক্তির উদ্দেশে নানা স্থানে হয়েছিল সভা-সমিতি। টাউন হলে বিরাট এক সভার আয়োজন। সুভাষচন্দ্রের পরিচালনায় হাজরা পার্ক থেকে এক বিরাট মিছিল টাউন হলের দিকে যাত্রা করে। বেআইনী ঘোষিত এই মিছিলের পরিচালনার অপরাধে গ্রেফ্‌তারের পর জামিনে মুক্ত ছিলেন সুভাষচন্দ্র। লাহোর থেকে ফিরে আসার পর পূর্বোক্ত মামলার রায়ে আবার একবছরের জন্য হল তাঁর কারাদণ্ড। গ্রেফ্‌তারের দিনটি ছিল আবার ২৩শে জানুয়ারী—ঠিক তাঁর জন্মদিন। এই জন্য জওহর লাল নেহেরু পত্রের দ্বারা জানালেন তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন—'পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণার পর, সকলের আগে তুমিই অর্জন করলে কারাবরণের মহান গৌরব'। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সুভাষচন্দ্রকে রেখে দেওয়া হল।

এদিকে বাংলার বিপ্লবী সমাজ আবার আর এক বিপ্লবের নূতন উদ্যোগ আয়োজনে মেতে উঠলো। বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলাগুলির নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা গোপনে এসে এসময় এক সাথে মিলিত হলেন কলকাতায়। পরিকল্পনা ছিল, বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান গুলির প্রতিটি কর্মীর সহযোগিতায় কলকাতা সহ সারা পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় একইদিনে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের। প্রধান উদ্দেশ্য, অস্ত্রাগার ও কোষাগার গুলির অস্ত্রশস্ত্র ও ধনসম্পদ হস্তগত করা। এই উদ্দেশে কলাবাগান বস্তির একটি বাড়ি হয়ে উঠলো তাদের অস্ত্র নির্মাণের কারখানা ও গোপন আবাস স্থল। বোমা তৈরীর সরঞ্জাম সহ সংগৃহীত হতে লাগল বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু মধ্য কলিকাতার বুকের উপর বসে গুপ্তচরদের নজর এড়ানো আর সম্ভব হয়ে উঠলো না। সেদিন ছিল

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাত। কর্ম মুখর কলিকাতা শহর রাত্রির অন্ধকারের কোলে গভীর নিদ্রায় অচেতন। এমনি সময় সশস্ত্র সিপাহীরা পালাবার পথ রোধ করে ঐ বাড়ির চারিপাশ সতর্ক প্রহরায় ঘিরে রইল। শহর জেগে ওঠার পূর্বেই জোর করে ঘরে ঢুকে অস্ত্রশস্ত্র-সহ একসাথে গ্রেফ্‌তার করল সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন ও রমেন বিশ্বাস কে। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ওখানে এসে রিভল্‌বার সহ ধরা পড়ে গেল সুধাংশু দাশগুপ্ত। সন্দেহের বশে আরও ব্যাপক অভিযান ও অনুসন্ধানের পর ধরা পড়ে গেল জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, নির্মল দাস, শচীন কর, পান্নালাল দাশগুপ্ত প্রভৃতি। কলিকাতার বুকের উপরে বসে বৃটিশ সাম্রাজ্য উচ্ছেদের আর এক ব্যাপক চক্রান্ত ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হল মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্র মামলা—এই নামে। এ বিষয়ে সতীশ পাকড়াশীর বিখ্যাত পুস্তক 'অগ্নি দিনের কথা' থেকে বিশেষ একটি উদ্ধৃতি,—"....১৮ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রিতে মেছুয়াবাজারের বাড়িতে অকস্মাৎ ঘুম থেকে চোখ চেয়ে দেখি, সাহেবদের টর্চ আমাদের চোখে মুখে জ্বল জ্বল করছে। তাদের খোলা রিভল্‌বার আমাদের বুকের ওপর। 'হাত তোলো, হাত তোলো' বলে চেঁচাচ্ছে।

১৯৩০ সালের আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে আমি ও নিরঞ্জন সাত বৎসরের দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হই। সুধাংশু দাশগুপ্ত, রমেন বিশ্বাস, ও অন্য কয়েকজনের পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। আমাদের ধরা পড়ার পর চট্টগ্রামের দল খুব কর্মতৎপর হয়ে তাড়াতাড়ি কাজের জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। তাঁদের আশঙ্কা হয়, পাছে পুলিশ তাদেরও ধরে ফেলে—সকল চেষ্টা পণ্ড হয়।"

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী দিল্লীতে ফেরার পথে লর্ড আরউইনকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মহাকালের গতি তারপর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ অতিক্রম করে তিরিশে পদার্পণ করেছে। ২৬শে জানুয়ারী, কর্তাদের প্রথমে হুমকি, বুটের লাথি ও বেপরোয়া লাঠির বাড়ি উপেক্ষা করে, সাড়ম্বরে সর্বত্র সর্বপ্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হল।

ইতিপূর্বে এই হতভাগ্য দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় লবণের উপর কর ধার্য করা যে কতবড় নৃশংসতা, একথা নানা যুক্তিতে প্রমাণ করে, কর তুলে নেবার দাবি

জানিয়ে গান্ধীজী বড়লাটের নিকট এক দীর্ঘ চিঠি পেশ করেন ; কারণ প্রতিটি ভারতবাসীকে তখন লবণ কর হিসাবে তার প্রতি মাসের তিন দিনের আয় গুনে দিতে হত। পত্রবাহক ছিলেন গান্ধীজীরই জীবন দর্শনের আদর্শে অনুপ্রাণিত অনুগত পরমভক্ত এক ইংরেজ পুরুষ। লাট সাহেব ওই চিঠির উত্তরে লিখলেন,—আপনার মস্তিষ্কে আবার যে সর্বনাশা পরিকল্পনার উদয় হয়েছে, তাতে কিন্তু দেশের আইন শৃঙ্খলা শান্তি সবকিছু বিপন্ন হবে! গান্ধীজী লিখলেন,—নতজানু হয়ে আপনার কাছে রুটির প্রার্থনা জানিয়েছিলাম পরিবর্তে আপনি আমাকে পাথর কুচি ছুড়ে মারলেন। আর ন্যায়বিচার প্রসূত ও সর্ব্ববাদীসম্মত অসংখ্য আইনের কেতাব বর্তমান পৃথিবীতে আছে। কিন্তু আইন বলতে এই হৃতসর্বস্ব হতভাগ্য ভারতবাসীরা এইটুকু মাত্র বোঝে, যে শাসন শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য আপনাদের উর্বর-মস্তিস্ক-প্রসূত যত রকম অপকৌশল সবই এ দেশের উপর আরোপিত আইন। আর সত্যের দাবিতে, বিবেকের তাড়নায়, বেঁচে থাকার প্রেরণায়, এ আইন যে অমান্য করে, তার শাস্তিতে বাসের ব্যবস্থা হয় কারাগারে। নয়তো যমের খাস তালুকে। আপনি ভাল করে জেনে রাখুন, আপনার প্রদর্শিত ঐ শাস্তিধামে পৌঁছানোর অপেক্ষায় কোটি কোটি ভারতবাসী এখন প্রস্তুত। একুশে মার্চ আমেদাবাদ কংগ্রেস অধিবেশনে সর্বানুমোদিত এক প্রস্তাব গৃহীত হল।

কেবলমাত্র লবণ আইন ভঙ্গই নয়, বিলাতী বর্জন ও খাজনা বন্ধও এই আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত হবে। ভারতের প্রতিটি মানুষকে নির্দেশ দেওয়া হল, মহাত্মার লবণ আইন ভঙ্গের সাথে সাথেই তারা যেন অহিংস পথে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে। কিন্তু তার পূর্বেই ১২ই মার্চ দৈনন্দিন প্রার্থনার পর অনুগামীদের নিয়ে মহাত্মাজী পায়ে হেঁটে যাত্রা করেন ডাণ্ডির পথে। সবরমতী থেকে ডাণ্ডির সমুদ্র তীর দীর্ঘ দুইশত মাইল পথ। এই দীর্ঘ পথের দশ মাইল পর পর বিশ্রামের ঘাঁটি। প্রতিটি ঘাঁটি হতে হাজার হাজার মানুষ তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের জাদু প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁকে অনুসরণ করে। উদ্বেলিত হয়ে ওঠে সারা ভারতবর্ষ। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের মত বিপ্লবীরাও দলে দলে এসে দ্বিধাহীন চিত্তে এই আন্দোলনে যোগ দেয়। পাঁচই এপ্রিল মহাত্মা তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে উপস্থিত হন ডাণ্ডির সমুদ্র তীরে। পরদিন

প্রভাতের স্নিগ্ধ অরুণালোকে সমুদ্র স্নানের পর, প্রার্থনান্তে দিনের প্রথম প্রহর যখন প্রায় অতীত তখন লবণের এক স্তূপ থেকে একতাল লবণ তুলে এনে তিনি লবণ আইন ভঙ্গ করলেন। ক্রমে সমুদ্র উপকূলে চারদিক থেকে দেখাদিল দলে দলে অভিযাত্রীদল। শুরু হয়ে গেল আইন অমান্য করে সমুদ্রের লোনা জলে লবণ প্রস্তুত করার অভিযান। সঙ্গে সঙ্গে অপরপক্ষের ধরপাকড় ও গুলিগোলার অমানুষিক অত্যাচারও তুঙ্গে উঠলো। অত্যাচারীর উৎপীড়নে লবণাক্ত উপকূল পথের চারিধার, প্রতিদিন মানুষের রক্তে লাল হয়ে উঠলো।

মহাত্মার পরবর্তী কার্যসূচী ছিল ধরশনার লবণ গোলা অধিকার। এই উদ্দেশ্যে যাত্রার সাথে সাথে আতঙ্কে থর থর করে কেঁপে উঠলো দিল্লীর রাজসিংহাসন। তৎক্ষণাৎ কর্তৃপক্ষের পাকা সিদ্ধান্ত—এই মুহূর্তে গান্ধীজীকে গ্রেফ্‌তার না করলে চারিদিকের এই ঝড়ের তাণ্ডব কিছুতেই শান্ত হবে না।

এরপর পাঁচই মে রাত্রির দ্বিপ্রহরে, মহাত্মার আশ্রয় ঘাটিতে হানা দিয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে। কিন্তু এ খবর শোনামাত্র ভারতের জনসমুদ্র আরও উত্তাল। ইংরেজের অগণিত কারাগারেও প্রতিদিনের হাজার হাজার নির্ভীক সৈনিকদের আর স্থান সঙ্কুলান হয় না। মহাত্মার গ্রেফ্‌তারের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন আব্বাস তায়েবজী। তাঁকেও গ্রেফ্‌তার করা হল। এরপর এগিয়ে এলেন সরোজিনী নাইডু। এইভাবে একের ঝাণ্ডা অপরে হাতে লয়ে ধরশনার পথে এগিয়ে চলল এক বিরাট বাহিনী।

মহাত্মার নীতি মেনে তাঁর প্রদর্শিত পথে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে বন্দুকের নলের মুখে বুক পেতে, একে একে প্রাণ দিল তিরিশজন নির্ভীক পাঠান। প্রতিদিন নিরপরাধ, নির্ভীক মানুষের এত রক্ত দেখে দেখে, স্থানে স্থানে ভারতীয় সৈন্যদের বুক ও হাতের বন্দুক আতঙ্কে শিউরে উঠলো। উত্তর প্রদেশের গাড়োয়ালী একদল সৈন্য শেষপর্যন্ত আর মানলো না তাদের উপরওয়ালার হুকুম। কোর্ট মার্শালে বিচারের পর তাদের জেলে পুরে রাখা হল।

এইরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ও মিলিটারি স্থানে স্থানে যখন বেসামাল, তখনই দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবিলের পাশে বসে নূতন করে গান্ধীজীর সাথে আর একটা চুক্তির পরিকল্পনা লর্ড আরউইনের মাথায় আসে। এইটিই দ্বিতীয় রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

কর বন্ধ করে গুজরাটের বহু অধিবাসী বরোদায় গিয়ে সাময়িক আশ্রয় লয়। বাংলার প্রতিটি জেলার, বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও কাঁথির হাজার হাজার মানুষ লবণ তৈরী ও কর বন্ধ করে নানাভাবে উৎপীড়িত হয়ে হাসি মুখে কারাবরণ করে।

* * * *

অসহযোগিতা আইন অমান্য লবণ সত্যাগ্রহ,
বুলেটের মুখে বুক পাতি রণ শোনে নাই আগে কেহ।
নানা দিক্ হতে সম্মুখে পথে কণ্টক পায়ে দলি,
ঢেউ তুলে চলে জনতার স্রোত জীবনেরে দিতে বলি।
নোয়াখালি আর মেদিনীপুরের
কূলে উপকূলে শেষে,
লবণে ও খুনে একাকার হয়ে
সমুদ্রে গেছে মিশে।
কত শহীদের বুকের রক্তে ভেসে গেল কারাগার
কত মাতা-বধূ-অশ্রু-সরিৎ বুক ফাটা কান্নার।

শহীদ স্মৃতির উদ্দেশে সভা ও পদযাত্রার নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে, পূর্ব থেকেই সুভাষচন্দ্র ছিলেন আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। ক্রমে আইন অমান্যের অপরাধে সত্যাগ্রহীতে জেলখানা ভরে গেল। সুভাষচন্দ্রের সাথে সেণ্ট্রাল জেলে মিলিত হলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন, ডাঃ যতীন দাশগুপ্ত, সত্যরঞ্জন বক্সী, মেজর সত্য গুপ্ত, এছাড়াও তৎকালীন বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি। ইংরেজদের এই সব জেলখানার গোলামদের খামখেয়ালী মেজাজ ছিল খাস ইংরেজদের চেয়ে আরও একমাত্রা চড়া। জেল সুপার সোম দত্ত হাবিলদারকে হুকুম দিলেন—শালাদের পেটে লাথি মার আর পিঠে বেত মার। তারপর সাধারণ চোর ডাকাত কয়েদিদের মত বস্ত্রের বদলে জাঙ্গিয়া পরিয়ে অর্ধ উলঙ্গ করে রাখ। কিন্তু সত্যাগ্রহীদের এতে ঘোরতর আপত্তি। সাধ্যমত একাজে তারা বাধা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেপরোয়া লাঠির প্রহারে হাত পা ভেঙ্গে শুরু হয়ে গেল তাদের আর্ত চিৎকার। শোনামাত্র ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন সুভাষচন্দ্র।

সবকিছু দেখে শুনে তিনি বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। সাধারণ কয়েদীদের পর্যায় ফেলে তাকে তৎক্ষণাৎ বিচারের জন্য ঢুকিয়ে দেওয়া হল ম্যাজিষ্ট্রেটের শাস্তি কামরায়। কিন্তু সাথে সাথেই তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। সোম দত্ত সুভাষচন্দ্রকে বাইরে দেখে ক্রোধে আগুন হয়ে বিকট আওয়াজে চিৎকার করে উঠলেন—ঢোকো জেলের ভিতরে, না হলে গুলি করবো। প্রত্যুত্তরে বুক পেতে দিয়ে সোম দত্তের দিকে এগিয়ে এলেন সুভাষচন্দ্র—কর গুলি এক্ষুণি; এই বুক পেতে দিচ্ছি। তার চোখের বিদ্যুৎ ঝলকে স্তব্ধ হয়ে গেল সোম দত্তের বাক্‌শক্তি। একটু সামলে নিয়ে শেষে হুকুম দিল জোর করে সকলকে সেলে ঢোকাবার। হুকুম পাওয়া মাত্র ওয়ার্ডাররা ঝাঁপিয়ে পড়ল বন্দীদের উপর। লাঠির ঘায়ে আধমরা করে প্রথমে ঢুকালো সত্য গুপ্তকে, তারপর একে একে সকলকেই। চারিদিকের লাঠির প্রহারে অচৈতন্য সুভাষচন্দ্র মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিন্তু বাইরে এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের ঝিমানো আগুন, অল্পদিনের মধ্যেই চারিদিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। এই ঘটনার পর সোম দত্ত বদলী হল।

* * * *

পথ ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও,
পথ ছেড়ে দাও, বিদেশী পথিক।
দাঁড়িও না আর রোধ করে পথ
আমার পথের পরে।
ঐ ঝেঁপে আসে জন-কল্লোল
ছেপে উঠি কাল ঝড়ে॥
বিদ্রোহ নয়, বিপ্লব নয়,
সত্যের দাবী, সত্য যা তারি তরে,
এ দাবী যুগের, সারা ভারতের
জনতার ঘরে ঘরে॥
এ দাবী ঘোষিছে
শহীদের খুন—
পথে, হাটে, প্রান্তরে॥

জাগাতে তোমার নবীন চেতনা,
হৃদয়ে জাগাতে সাড়া—
লাঠির আঘাতে, বুলেটের ঘায়
বুক পেতে দেই—মাথা ভেঙ্গে যায়,
শৃঙ্খলে দেই ধরা।
তরঙ্গ অতি দুর্বার গতি
রোধিবে কেমন করে ?

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের আর একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনা মহানায়ক সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও অবরোধ সৃষ্টি করে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। কৈশোরে ছাত্রাবস্থাতেই বাঘা যতীনের বৈপ্লবিক জীবনাদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করে।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রাম জিলার নোয়াপাড়া গ্রামে সূর্য সেনের জন্ম। পিতার নাম রাজমনি সেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক ও দুঃসাহসী ; তাই পাহাড়, জঙ্গল ও সমুদ্রের সাথে গড়ে উঠেছিল মনের অচ্ছেদ্য দৃঢ় বন্ধন। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করার পর, মুর্শিদাবাদ গিয়ে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। সাংসারিক জীবনে তিনিও ছিলেন বিবাহিত। দেশে ফিরে এসে চট্টগ্রাম জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হন। তখনই অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং এবং আরও কয়েকজন প্রতিবেশী ও তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাহায্যে গড়ে তোলেন 'সত্যাশ্রম' নামে এক বৈপ্লবিক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান। পরে কলিকাতার ফেরার বিপ্লবী দেবেন দে চট্টগ্রামে ঐ আশ্রমে যোগ দেন।

এই সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, প্রকাশ্যে কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর দলভুক্ত প্রায় সকলকে নিয়েই, একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়ে কারাবরণ করেন। অসহযোগ আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে আসে, কারামুক্তির পর তিনি আবার তাঁর কর্মীদের নিয়ে সত্যাশ্রমে ফিরে যান।

শহরের সাথে সম্পূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করে, দূর পাহাড়ের অরণ্য অঞ্চলের জনবিরল পল্লীর পর্ণকুটীরে গড়ে উঠলো তাঁর সত্যাশ্রম। অনন্ত সিং ও দেবেন দে চট্টগ্রাম শহরের মুখ থেকে রেল কোম্পানীর বেতনের সতের হাজার টাকা বলপ্রয়োগে ছিনিয়ে নিয়ে ঐ আশ্রমেই উধাও হন। শহরময় সর্বত্র খানাতল্লাসী করেও পুলিশ তাদের হদিশ পায়না। বহু অনুসন্ধানের পর পুলিশ যখন নাগার খানা পাহাড়ের দূর জঙ্গলে এই ঘাঁটি আবিষ্কার করে, বেধে যায় তখন প্রলয় খণ্ডযুদ্ধ। বহুবিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে দলচ্যুত হয়ে পার্বত্য পথে সূর্য সেন শেষে পালিয়ে আসেন আসামে। সেখানেও দিনরাত বিপদের পথে তার পদপরিক্রমার বিরাম ছিলনা। পুলিশ যখন চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও আসামের পাহাড়, জঙ্গল ও শহরে সূর্য সেনকে খুঁজে বেড়ায়, তিনি তখন কলিকাতায় গা ঢাকা দিয়ে, আগুনের আর এক নূতন খেলায় মেতে উঠেছেন। কিন্তু এইখানেই এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি রাজপথে ধরা পড়ে গেলেন। মুক্তি পেলেন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে, তারপর কলিকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিলেন। আর এই বৎসরই বহুদিন রোগ ভোগের পর তাঁর স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা দেহ ত্যাগ করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে মেছুয়াবাজারে, পূর্বোক্ত বিরাট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও তার সার্থক রূপায়নের এক সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য মিলিত হলেন এসে সারাবাংলার বিপ্লবীদের সাথে। কিন্তু ঐ ২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর মেছুয়াবাজারে খানাতল্লাস ও ধর পাকড়ের পর সূর্য সেন তার পরিকল্পিত ব্যাপক আক্রমণ, কেবলমাত্র চট্টগ্রামে ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠেন। মোট পয়ষট্টি জন বিপ্লবীকে নিয়ে তখনকার মত গঠিত হল তাঁর সমরবাহিনী। প্রত্যহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে গোপনে নির্জন পাহাড়তলীতে তাদের যত্নে শিখানো হল, সৈনিক জীবনের নিয়মানুবর্তিতা, সাহসের সঙ্গে কর্মতৎপরতা, কুচকাওয়াজ ও গুলিগোলা সহ নানা অস্ত্রচালনার কৌশল। এই বাহিনীর প্রায় তিন চতুর্থাংশই বয়সে ছিল নবীন, বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র। প্রত্যেকটি সৈন্যের জন্য তৈরী হল পরিচ্ছন্ন খাকির সামরিক পোষাক। ইংরাজ শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে একসাথে একই সময় আক্রমণ চালাবার জন্য ছয়ভাগে তাদের বিভক্ত করা হল। এরপর ছয়জন সুদক্ষ নায়কের পরিচালনাধীনে গড়ে তোলা হল তাদের খাঁটি আদর্শ সৈনিক রূপে।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল রাত্রি ৯-৪৫ মিনিটে সর্বসম্মতিক্রমে ধার্য হল আক্রমণের সময়। তার সাথে গৃহীত হল নিম্নোক্ত কার্যসূচী—সরকারী ও রেলওয়ে অক্সিলিয়ারী বাহিনীর অস্ত্রাগার লুণ্ঠন; চট্টগ্রামের সঙ্গে বাইরের টেলিগ্রাম ও টেলিফোনের যোগসূত্র ধ্বংস করা; রেল লাইন বিধ্বস্ত করা, কোষাগার লুণ্ঠন; জেলখানা ভেঙ্গে ফেলে বন্দীদের মুক্তিদান ও ইউরোপীয় ক্লাব ধ্বংস করা। সবকাজ সেরে ফেলার পর জাতীয় সরকার গঠন করে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। ধ্বংসাত্মক কার্যগুলির জন্য যথাক্রমে নিয়োজিত হলেন অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, উপেন ভট্টাচার্য ও নির্মল সেন। সবার উপরে ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা সূর্য সেন।

যথার্থই সেদিন পরাধীন ভারতে অগ্নিযুগের শীর্ষস্থানে, সূর্য সেন ছিলেন সূর্যের তেজে এক জ্বলন্ত বহ্নি শিখা।

জালালার ভাল উজলি আলোকে
জাগে নবারুণ সূর্য।
এক হাতে তার জাতির নিশান
আর হাতে রণতূর্য।
নিম্নে উতলা ফেনিল সাগর
উর্দ্ধে তুলিয়া ফণা।
নিরবধি কাল তরঙ্গ দোল
তারে নাহি যায় গোনা
এইমত মহা কালের প্রবাহ—
চলিয়াছে সারা বেলা,
যত ওঠে ফুঁসি তত যায় ভাসি
এইমত চলে খেলা।
তারি কোল হতে বজ্র অনল
ছিনাইয়া বারে বারে

পাহাড়তলিতে লুকায়ে রেখেছে
নিশীথ অন্ধকারে।
প্রলয় নাচনে নাচায়েছে পরে
শহর চট্টগ্রাম।
ধূমায়িত এক আগ্নেয় গিরি
নাহি জানা ছিল নাম।
চেনে নাই কেহ সূর্য সেনেরে
কোন ধাতু দিয়ে গড়া।
বোঝে নাই কেহ পাষাণের কোল
বজ্র অনলে ভরা।
আসে দলে দলে সভাতলে তাঁর
বিপ্লবী অগণন
নাম ধরি ডেকে, একে একে সবে
জানায় সম্ভাষণ।
—"শোনো হে গণেশ, শোনো অনন্ত
শোনো লোকনাথ বল,
ব্যর্থ হবেনা পূজা আয়োজন,
রুধিরের শতদল।
ব্যর্থ হবেনা মাতার অশ্রু—
এক সাথে গেলে বলি,
সারা ভারতের পাঁজরের হাড়ে
আগুন উঠিবে জ্বলি।
ঐ যে অদূরে উর্দ্ধ প্রাকার বৃটিশ অস্ত্রাগার—
থর থর ভয়ে আকাশ কাঁপিছে ত্রাসে।
পদভরে তার মেদিনী রুদ্ধশ্বাসে।
স্পর্ধা ইহার রেণু রেণু করি ধুলায় মিশাতে হবে।
অত্যাচারীর নাই কভু ক্ষমা নাই,
অনেক সভায় একথা বলেছি সবে।

শোন নির্মল, শোন হে উপেন
শোন সবে মন দিয়া
রেল লাইন ধরি সবলে উপাড়ি
সমুদ্রে ফেল নিয়া।
শোন অম্বিকা, বেশী কি বলিব আর—
সুযোগ জীবনে আসে নাকো বার বার,
বলেতে উপাড়ি, আছাড়ি আছাড়ি
সব কর চুরমার।
তড়িৎ প্রবাহে চালাও ছুরিকা
ছিঁড়ে ফেলে দাও তার।
হুঁশিয়ার, যেন একটি কথার
সময় মেলেনা তার।
ছিন্ন হউক চট্টগ্রাম—
আজি এ নিশিতে পৃথিবী তাহাকে
খুঁজিয়া পাবেনা আর।
হেথায় বাজিবে ভয় বিহ্বল
নিষ্ফল চিৎকার।
আর্তনাদের বন্যা প্রবাহ
বুক ফাটা হাহাকার।
আর, তাদেরে ঘেরিয়া অট্ট হাসিবে—
পিশাচ অন্ধকার।
আজ ভাঙিতে পাপের লৌহ আগল
নাশিতে পশুর বল
তোমাদের হাড়ে জ্বলিয়া উঠুক
কালের বজ্রানল।”
কত কিশোর কিশোরী, ছাত্র-ছাত্রী
রক্তে লিখিয়া নিজনাম
গিরি আবর্তে, মরণ শর্তে শিখিয়াছে সবে সংগ্রাম

উত্তাল কাল ঢেউ—
সিন্ধু অতলে মিলিয়া যাইবে
আবার ভাসিবে, আবার ফুঁসিবে
কত মহাপ্রাণ যাবে বলিদান
জানিবে না তাহা কেউ।
নাচে ঝড়, জাগে কোলাহল মহামার।
চোখের নিমেষে, আঁধারেতে মিশে
সব হয় একাকার।
নটরাজ মহাপ্রলয়ের বেশে,
হাসে খল খল অসীম আকাশে,
ত্রাহি ত্রাহি, আর মার মার ডাক
নাই কিছু নাই আর।
শুধু অবরোধ, শুধু প্রতিশোধ
নিষ্ঠুর সংহার।
অস্ত্রাগারের দ্বারে,
মোটা দারোয়ান পালোয়ান এক
গুলির আঘাতে মরে।
বাকি কটা ফেউ, করি ঘেউ ঘেউ
পালাইয়া গেল ডরে।
শব্দ ঝননে প্রতি টানে টানে
কাঁপে সব থরথরে।
লৌহ কপাট হইয়া লোপাট
মাটিতে লুটিয়া পড়ে।
অত্যাচারীর হাত হতে যারা
শক্তি কাড়িয়া লয়,
সে মানুষ কভু ইহ সংসারে
তুমি আমি মোরা নয়।
অধিকারী তারা দেব প্রতিভার,

দানবের মত শক্তি আধার,
তাহাদের পায়ে সাগর পাহাড়
সম্ভ্রমে নত হয়।
অস্ত্রাগারের সকল অস্ত্র
নিঃশেষে লুটে লয়।
শোনে নাই আগে পরে চোখে দেখে
মনে জাগে বিস্ময়।
রজনীর শেষে প্রলয়ের অবসান।
বাঙালী সূর্যসেন
চট্টগ্রামের আকাশে উড়ালো জাতির জয় নিশান।

আট

পরিকল্পিত আক্রমণগুলির সার্থক রূপায়ণের পর সব দলগুলি একে একে পুলিশ লাইনের পূর্ব নির্দিষ্ট কেন্দ্রস্থলে এসে মিশে গেল। তখন মিলিত কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো দিগন্তের আকাশ বাতাস। কিন্তু হায়!—তবুও অদৃষ্টের নির্মম বিধানে সব বিপ্লবীদের চোখ এড়িয়ে ঘটে গেল এক সর্বনাশা বিভ্রান্তি, পূর্ণমাত্রায় যার সুযোগ নিয়ে, ধ্বনি লক্ষ্য করে গর্জে উঠলো ইংরেজের কামান। শিলাবৃষ্টির মত অনর্গল ছুটে আসছিল মেশিন গানের গুলি। ডবল মুরিং নামক স্থানে ছিল আর একটি ছোট অস্ত্রাগার। অপ্রয়োজন বোধে তাকে আর ধ্বংস করা হয়নি। সেখান থেকে আনা মেশিন গানের মুখ থেকে অনর্গল এই অগ্নি-উদ্গার। সর্বাধিনায়কের হুকুম হল অস্ত্রাগার আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে, একটু দূরে পাহাড় তলীর অন্ধকার অরণ্যে রাত্রির মত সকলের গা ঢাকা দেওয়ার। হুকুম তৎক্ষণাৎ তামিল করা হল। কিন্তু পেট্রোলের আগুনে ভয়ঙ্কর অগ্নিদগ্ধ হয়ে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে হিমাংশু সেন। আসামাত্রই চেতনা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। বিপ্লবী

আনন্দ গুপ্তর বাসা ছিল পুলিশ লাইনের অতি নিকটে। গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত চারজনে ধরাধরি করে, গাড়ীতে তুলে আনন্দ গুপ্তর বাসায় তাকে পৌঁছে দিল। অগ্নিদগ্ধ হিমাংশু সেন ধৃত অবস্থায় হাসপাতালে ত্যাগ করলেন তাঁর শেষ নিশ্বাস। সকলের পুরোভাগে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের শহীদ নামায় রক্তাক্ষরে লেখা হয়ে রইলো তাঁর নাম।

এদিকে অবিশ্রান্ত গুলিগোলা অতিক্রম করে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং ও জীবন ঘোষালের দলের সঙ্গে মিলিত হওয়া আর সম্ভব হলনা। মহাকাল তাঁদের দল থেকে ছিন্নমূল করে, আর এক ভিন্ন খাতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্র ও বাকী সকলকে নিয়ে, পরদিন প্রভাতের পূর্বে সূর্যসেন পাহাড়ের নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যে গিয়ে গা ঢাকা দিলেন। বাইরে থেকে অতি সাবধানে সংগ্রহ করা হল সামান্য খাবার। তৃপ্তি সহকারে সকলে তা সমান ভাবে ভাগ করে খেলেন। প্রায় তিনদিন অবিশ্রান্ত পথ চলার পর এগিয়ে এলেন জালালাবাদ পাহাড়ে। শহরের দূরত্ব ওখান থেকে মাত্র তিন মাইল। কিন্তু তার তিনদিক ঘিরে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী সর্বদাই তাদের অনুসন্ধানরত।

সেদিন ছিল বাইশে এপ্রিল। জালালাবাদ শহরের শীর্ষদেশের শ্যামল সমতল অঞ্চলে সবাই যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত, ঠিক তখনই নিম্নের অতি নিকট হতে কানে ভেসে এলো সিপাহিদের জুতোর খট্ খট্ আওয়াজ। আর ক্রমেই তারা উপর দিকে এগিয়ে আসছে। শোনামাত্র সূর্য সেন লোকনাথ বলকে নির্দেশ দিলেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে। সাথে সাথে সবাই বন্দুক হাতে তৎপর হয়ে উঠলো। সকলেরই বন্দুকের তাক তখন ইংরেজ সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ্য করে। বন্দুকের পাল্লার মুখে আসা মাত্র, লোকনাথ বল সকলকে হুকুম দিলেন—'ফায়ার'। সবগুলি বন্দুক একসাথে গর্জে উঠলো। সাথে সাথে বিপক্ষের প্রত্যুত্তর। সে আরও ভয়ঙ্কর, আরও অগ্নিক্ষরা। দুপক্ষের রক্তের অবিশ্রান্ত ধারায় ভিজে পাহাড়ের মাটি কর্দমাক্ত হয়ে উঠলো। দিনভর দুপক্ষের অনলবর্ষী তুমুল সংগ্রামের পর, পর্বতের অরণ্যাঞ্চল যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, ইংরেজ সৈন্য দলে দলে তখন সমতল ভূমিতে নেমে এলো। চারদিক থেকে নেমে আসা অন্ধকার পাহাড় তলীতে বিপ্লবীদের শক্তি ও অস্ত্রবলের একটা

সঠিক হিসাব কষা তাদের পক্ষে আর কোন মতেই সম্ভব হলনা। এত সৈন্যক্ষয় ও রক্তপাতের পর পরদিন আরও জোরে আক্রমণ চালাবার উদ্দেশে হয়তো তারা থেমে গেল। লোকমুখে পরে শোনাগেল, প্রায় ১৬০ জনের মত ইংরেজ সৈন্য নিহত হয়েছে। কিন্তু তাদের ক্ষয় ক্ষতির প্রকৃত হিসাব কালের বুকে ধামাচাপা হয়ে পড়ে রইল।

আর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মীর বার জন সৈনিক রণস্থলে একে একে প্রাণ দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেল, স্বেচ্ছায় তাদের সৈনিক জীবনের পূর্ব-প্রতিশ্রুতি। —"মাষ্টার দা, আমরা আমাদের দেহের সর্বশেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করেও জন্মভূমির মুক্তির জন্য সংগ্রাম করবো"। চট্টগ্রাম পাহাড়ের শীর্ষদেশের শিলাখণ্ডে আর খণ্ডিত স্বাধীন ভারতের মর্মস্থলে, রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে রইল ঐ দ্বাদশ শহীদের নাম।

নিম্নোক্ত শহীদনামায় যথাক্রমে জালালাবাদের রক্ততীর্থে উৎসর্গিত প্রাণ পুণ্যশ্লোক ঐ দ্বাদশ শহীদের নামাবলী,—(১) নরেশ রায়, চট্টগ্রাম মেডিকেল স্কুলের ছাত্র, বয়স মাত্র কুড়ি বছর, জন্মস্থান ময়মনসিং। (২) বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, কুমিল্লার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, বয়স কুড়ি, ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। (৩) ত্রিপুরা সেন, বয়স ষোল, জন্মস্থান ঢাকা, মিউনিসিপ্যাল স্কুলের ছাত্র। (৪) অর্ধেন্দু দস্তিদার, উনিশ বছর বয়সের ঘরছাড়া এক বিপ্লবী যুবক। (৫) মধুসূদন দত্ত, বয়স ছাব্বিশ, চট্টগ্রামের এক মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম। (৬) হরিগোপাল বল, মাত্র চোদ্দ বছর বয়সের কিশোর, কলেজিয়েট স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। (৭) প্রভাস বল, মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান, জন্মস্থান চট্টগ্রাম, দশম শ্রেণীর ছাত্র, বয়স ষোল বছর। (৮) নির্মল লাহা, কক্স বাজার হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, বয়স চোদ্দ। (৯) পুলিন ঘোষ, সতের বছরের যুবক, চট্টগ্রাম জে, এম, সেন স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র, চট্টগ্রামের এক দুস্থ পরিবারের সন্তান। (১০) শশাঙ্ক দত্ত, চট্টগ্রাম ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র, বয়স আঠার বছর। (১১) মতিলাল কানুনগো, চট্টগ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান, চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র, বয়স সতের। (১২) জিতেন্দ্র দাস, সতের বছর বয়সের কিশোর, স্থানীয় এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম।

মাগো তোর শ্যামল কোলে, মা বোল বলে
আর তো সে প্রাণ এলো না রে।
যে জয়ের যাত্রাপথে মরণ রথে
ভয়ের বাধা মানলো না রে।
যে বীণা আগুন হয়ে উঠলো জ্বলে
বাজিয়ে গেল প্রলয় বিষাণ,
নাচালো প্রলয় দোলা বহ্নি হাওয়ায়
উড়িয়ে দিয়ে রক্ত নিশান।
নিবেছে বহ্নি শিখা।
আর তার রক্ত রেখা যায়না দেখা
মিলিয়েছে কোন অন্ধকারে।

এছাড়াও গুরুতর আহত অবস্থায় অচেতন হয়ে ওখানে ছিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু দস্তিদার ও মতিলাল। ভুলবশতঃ তাদেরও মৃত মনে করে পঞ্চদশ শহীদের জন্য যথাক্রমে রচিত হল তৃণশয্যা। তারপর স্থান ত্যাগের পূর্বে সামরিক প্রথায় নতমস্তকে জানানো হল তাদের বিদায় সম্ভাষণ। দিগন্তের অন্ধকার স্তর ভেদ করে বিয়োগান্ত করুণ এই দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে রইল উপরের নক্ষত্রখচিত কাল আকাশ, পাহাড়ের বুকফাটা ঝর্ণার অশ্রুপ্লাবন আর বাতাসের দীর্ঘশ্বাস। কিন্তু বিপ্লবীর মন পাহাড়ের চেয়েও কঠিন উপাদানে গড়া। বুক ফেটে তার বেরিয়ে আসুক রক্তের ফোয়ারা, তবু চোখ থেকে যেন এক ফোঁটা জলও না গড়ায়। কিন্তু বিদায়ের একেবারে শেষমুহূর্তে মহানায়কের হৃদয়তন্ত্রীতে দীপকের পরিবর্তে বেজে উঠলো অশ্রুসজল মেঘমল্লারের করুণ রাগিনী।

'আমার প্রাণের অধিক ভাইসব, নির্জন এই পাহাড়তলীতে চিরকালের মত তোমাদের বিসর্জন দিয়ে চলে যাচ্ছি। যাওয়ার পূর্বে ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা—যেন সেই মঙ্গলময়ের শুভেচ্ছায় দেশের মুক্তির জন্য তোমাদের ঢেলে দেওয়া প্রতিটি রক্তবিন্দু রক্ত গোলাপ হয়ে এখানে ফুটে ওঠে। আর আগামী দিনের স্বাধীন ভারত তাদের চয়ন করে যেন প্রতিষ্ঠিত করে উপযুক্ত মর্যাদার আসনে। বিদায়"—

* *

এ কাহিনী রবে পাষাণ কারায় বীরের শোণিতে আঁকা
মুক্তিযজ্ঞে আহুতি কিশোর
শহীদের স্মৃতি চির ভাস্বর
কালের চক্র আবর্তে কভু পড়িবেনা তাহা ঢাকা।

এরপর অন্ধকার বন্ধুর পার্বত্য পথে আবার শুরু হল নূতন আশ্রয়ের সন্ধানে পদযাত্রা। কেউই জানেনা প্রভাতের সাথে সাথে কোন অরণ্যতল সুদূর প্রসারিত বাহুর আড়ালে তাদের ঢেকে রাখবে, আর কোথায়ই বা এ চলার শেষ।

পথচলায় দুজন ছিল সম্পূর্ণ অক্ষম। নাম বিনোদ চৌধুরী ও বিনোদ দত্ত। দুইজনের স্কন্ধে ঐ দুইজনের দেহের সম্পূর্ণ ভার। বাকি সকলের স্কন্ধে অস্ত্রশস্ত্র। সূর্যসেন সসৈন্যে ঐ স্থান ত্যাগের একটুপরে অম্বিকা চক্রবর্তীর জ্ঞান ফিরে এলো। অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে নিম্নের সমতলে নেমে এসে আশ্রয় পেলেন তিনি এক মুসলমান পরিবারে।

পরদিন ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী আকারে আরও বড় হয়ে ঐ পাহাড়ে এসে হানা দিল। সারা পাহাড় তন্ন তন্ন করে খুঁজে কোথাও পেলোনা কোন জীবিত জনপ্রাণীর সন্ধান। ক্রমে উপরে উঠে গিয়ে একস্থানে শেষে দেখে পর পর সারিবদ্ধ শায়িত রয়েছে ১৪টি বিপ্লবীর দেহ। তার ভিতর ১২ জন মৃত, আর দুইজন তখনও শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেনি। সেই দুজনের নাম অর্ধেন্দু দস্তিদার ও মতিলাল। একটুপরে মতিলাল ঐখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আর অর্ধেন্দুকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। হাসপাতালে ঐ দিন ১-৫০ মিনিটে অর্ধেন্দুও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

এদিকে মাষ্টারদা তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে রাত ভর উচু নীচু পথ চলার পর ভোরের আলোয় সম্মুখে দেখেন পুষ্পিত সুবিশাল এক বনাঞ্চল আকাশকে ছত্রাকারে ঘিরে রেখেছে। তার অভ্যন্তরে বিছানো গালিচার মত কোমল তৃণদল। বিনোদ চৌধুরী ও বিনোদ দত্তের আহত দেহ ঐখানে রেখে শান্তিতে তন্দ্রাতুর সবাই গা এলিয়ে দিলেন ঐ তৃণশয্যায়। দিনের শেষে

আবার রাত্রি যখন এলো, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আবার শুরু হল পথচলা। ঐ রাত্রির ভিতরেই হালদা নদী পার হয়ে সকলকে নিয়ে নোয়াপাড়ায় তাঁর নিজ বাড়িতে তিনি উপস্থিত হলেন। সেদিন ছিল ২৪শে এপ্রিল। এই ২৪শে এপ্রিলই চট্টগ্রাম শহরে পুলিসের সাথে লড়াই করে সমরেন্দ্র চৌধুরী প্রাণ দেন। মাত্র ১৭ বৎসর তখন তাঁর বয়স, আই এ ক্লাশের ছাত্র, মাষ্টারদার নির্দেশে শহরের খবর সংগ্রহের জন্য শহরে এসেছিলেন। ২৫শে এপ্রিল আহতদের সেবার বন্দোবস্ত করে পূর্ণোদ্যমে আবার শুরু হল সূর্যসেনের আগামী সংগ্রামের উদ্যোগ আয়োজন। প্রথমে এসে তিনি আশ্রয় নিলেন কোয়েপাড়ার বিনয় সেনের বাড়ীতে। তাঁর গ্রেফ্‌তারের পর শ্রীপুরে এসে শেষে আশ্রয় নিলেন বিপ্লবী নারী কুন্দপ্রভা সেনের বাড়ীতে। অন্যান্য সকলে তাঁর সাথে পূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করে ছদ্মনামে, ছদ্মবেশে চারদিকে ছড়িয়ে রইল। মাথার উপর সকলেরই অলক্ষ্যে উদ্যত খড়্গ। চলার পথ কণ্টকাকীর্ণ। মুহূর্তের জন্য তবুও নাই বিশ্রামের অবকাশ।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ১৮ই এপ্রিল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, জীবন ঘোষাল ও আনন্দগুপ্ত রজকের ছদ্মবেশে আট মাইল পথ অতিক্রম করে রাত্রে এসে উপস্থিত হন ভাটিয়ারী স্টেশনে। ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে কুমিল্লার টিকিট চাইলে স্টেশন মাষ্টার তা দিতে অস্বীকার করে। আর তাদের মুখের দিকে অপলক চেয়ে থেকে একটুপরে বলে ওঠে,—"লাক্‌সামের টিকিট আছে ; ইচ্ছা হলে সেখানে যেতে পারো"। লাক্‌সামের টিকিট কেটেই তৎক্ষণাৎ তাঁরা প্লাটফরমের গাড়ীতে উঠে বসলেন। কিন্তু সন্দেহের বশে ঐ বিশ্বাসঘাতক স্টেশন মাষ্টার মোটা পুরস্কারের লোভে ঐ চারখানা টিকিটের উপর এঁকে দিল প্রায় অদৃশ্য এক সাঙ্কেতিক চিহ্ন। তারপর চৌদিকে খবরাখবরের মাধ্যমে এদের ধরার ষড়জাল বিস্তার করে স্টেশন থেকে গাড়ী ছেড়ে দিল। পরের স্টেশন ফেনীতে গাড়ী পৌঁছান মাত্র তাঁরা দেখেন প্লাটফরমের চারধার পুলিশ বেষ্টিত। অবিলম্বে পুলিশ সুপার তাদের কামরায় লাফিয়ে উঠলো। তাদের টিকিট পরীক্ষা করার পর গ্রেফ্‌তার করে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে রেখে, নিয়ে এলো তাদের স্থানীয় আর. এম. এস. অফিসের ভিতরে। সেখানে তাদের দেহ তল্লাসীর জন্য উদ্যত হওয়ার সাথে সাথেই গর্জে উঠলো

বার বার অনন্ত সিংএর হাতের রিভলবার। ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আচ্ছন্ন করে চারজন চারিদিকে চোখের নিমেষে পালিয়ে গেলেন। অভাবনীয় দুঃসাহসিক এই নাটকীয় ঘটনার প্রভাবে পুলিশ সুপার সাময়িক তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতবাক। আর এই সুযোগে ট্রাঙ্ক রোড ধরে চারজন দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে আবার সকলে নির্জন স্থানে মিলিত হলেন। পরে অনন্তসিং দল থেকে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বাকী তিনজন মুসলমানের বেশধরে পথের পাহাড় জঙ্গল ডিঙ্গিয়ে ট্রেনে শ্রীহট্টে এসে উপস্থিত হন। পরে সুযোগ বুঝে পাড়ি দেন কলিকাতায়। সেখানে বিপ্লবীদের ঘরে ঘরে কিছুদিন গোপনে বাস করে চলে আসেন তারপর চন্দননগরে। এর পূর্বে মাষ্টারদার নির্দেশে লোকনাথ বলও তাঁদের সাথে এসে মিলিত হন। অনন্ত সিংও অসমসাহসে নানা বিপদ অতিক্রম করে কলকাতায় এসে আত্মগোপন করেন।

এ সময় যুগান্তরের প্রখ্যাত বিপ্লবী শশধর আচার্য ও সুহাসিনী দেবী পরস্পর স্বামী-স্ত্রী সেজে বিপ্লবীদের নিরাপত্তার জন্য চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায় নিরাপদ স্থান বুঝে একটি বাড়ী ভাড়া করেন। সেখানে এসে আশ্রয় নিলেন তখন গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল।

চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের চন্দননগরে অজ্ঞাত বাসের আস্তানা অধিকদিন গোয়েন্দাদের কাছে অজ্ঞাত রইল না। প্রয়োজন বোধে, পশ্চাৎ পথে পলায়নের পুকুর সংলগ্ন জঙ্গলাকীর্ণ সরু এক ফালি পথও শেষ পর্যন্ত তাদের নখদর্পণে। সেদিন ছিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর। সসৈন্যে ঐ দিন রাত্রিযোগে টেগার্ট সাহেব চন্দননগরে এসে উপস্থিত। চন্দননগরের গোন্দলপাড়ার ঐ বাড়ীতে রাত্রিদিন একজন করে প্রহরায় নিযুক্ত থাকতেন। সহসা তার কানে বেজে উঠলো, চারিদিক থেকে ঘনিয়ে আসা জুতোর খট খট আওয়াজ। বিপদের গুরুত্ব বুঝে, সকলকে তৎক্ষণাৎ তিনি জানিয়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পিছনের সুরক্ষিত পথ দিয়ে বিপ্লবীরা পালাতে গিয়ে দেখে, সে পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর টর্চ ফেলে দ্রুমদ্রাম বেপরোয়া গুলির আওয়াজ। বিপ্লবীরাও তাদের লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে চালাল প্রত্যুত্তর। কিন্তু সীমিত গুলি ফুরিয়ে যাওয়ায় বিপ্লবীরা শেষে নিরুত্তর। চারদিক হতে সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ছুটে এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাত পা

বেঁধে ফেলে, দেহের উপর শুরু হল দমাদ্দম বুটের লাথি। নারী বলেও ঐ দানবদের নৃশংস অত্যাচারের হাত থেকে সুহাসিনী দেবী রেহাই পেলেন না। বেপরোয়া প্রহার ও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন—"কেন তোমরা একাজে নামলে? সঠিক উত্তর দাও; না হলে এই খানেই সকলের জীবন খতম করে দেবো।" কিন্তু তাদের ভিতর জীবন ঘোষালের জীবন প্রদীপ নিবে গিয়ে পূর্বেই তিনি খতম হয়ে গেছেন। গায়ের বলে ওদের হাত থেকে ফস্কে, লাফিয়ে পড়েছিলেন পুকুরের জলে। কিছুক্ষণ ডুবে থেকে—ভেসে ওঠার সাথে সাথে তাঁর শির লক্ষ্য করে বর্ষিত হল এক ঝাঁক গুলি। ভাসমান দেহ তৎক্ষণাৎ তলিয়ে গেল। রক্তে লাল হয়ে গেল পুকুরের জল। বেড়াজাল টেনে পরে তোলা হল তার মৃতদেহ। চট্টগ্রামের এক ধনীর দুলাল এই জীবন ঘোষাল। মাত্র সতের বছরের এক তরুণ কিশোর; চট্টগ্রাম কলেজের আই, এ, ক্লাশের মেধাবী ছাত্র। পার্থিব সব সুখের আশায় জলাঞ্জলী দিয়ে, দেশের মুক্তি যজ্ঞে এই ভাবে জীবন উৎসর্গ করলেন জীবন ঘোষাল। বাকী সকলকে সুরক্ষিত ভাবে নিয়ে গিয়ে, সাময়িক লালবাজারে আটকে রাখা হল। পরে স্থানান্তরিত করা হল চট্টগ্রামের জেলহাজতে।

ঠিক এই সময়েই আবার চট্টগ্রামের পুলিশের চোখে ধূলা দিয়ে মাষ্টারদার পূর্ণ উদ্যমে চলল ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেওয়ার প্রস্তুতি।

মাষ্টারদার পরিকল্পনামত ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে রাত্রি দ্বিপ্রহর যখন প্রায় অতীত, অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে শহরের দিকে একাজে এগিয়ে চললেন বিপ্লবী স্বদেশ রায়, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, মনোরঞ্জন সেন, রজত সেন, সুবোধ চৌধুরী ও ফণী নন্দী। গিয়ে দেখেন, শহরের চারিদিক ঘিরে তখনও অসংখ্য অতন্দ্র সিপাহী প্রহরায় রত। অবস্থা প্রতিকূল বুঝে সরে আসতে বাধ্য হলেন। এক পথচারী গুপ্তচর তখন এদের দেখতে পায়। তার মুখে এ সংবাদ শোনামাত্র, সসৈন্যে তৎক্ষণাৎ বিপ্লবীদের পিছু নেয় খান বাহাদুর আসানুল্লা ও আবদুল আজিজ। বাতাসের আগে, শহরের থানায় ও মিলিটারী ব্যারাকে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে। ছুটে আসে ইন্‌স্‌পেক্টর হেম গুপ্ত। এ ছাড়াও ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ারস্‌ রাইফেল্‌সের বহু সিপাহী। পথে তারপর দুপক্ষের

তুমুল সংগ্রাম। একটু পরে ফণী নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী ধরা পড়ে গেলেন। বাকী চারজন আহত অবস্থায় ছুটে পালিয়ে গেলেন সম্মুখের এক বাঁশ বনের মধ্যে। পুনরায় ওখানে আক্রান্ত হয়ে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাধ্যমত সংগ্রাম চালিয়ে, ঐ বাঁশ বনের ভিতর ছিন্নভিন্ন হয়ে রক্তাক্ত দেহে পড়ে রইলেন, স্বদেশ রায়,—বাল্যকাল অবধি মাস্টারদার বিপ্লব আদর্শের অনুগামী, কলেজের ছাত্র, বয়স তখন মাত্র ১৮ বছর। রজত সেন—বয়সে আরও এক বছরের ছোট ১৭ বছর বয়সের কলেজের মেধাবী ছাত্র। বিজ্ঞানের ছাত্র দেবপ্রসাদ গুপ্ত—বয়স ১৭ বছর মাত্র। মনোরঞ্জন সেন—প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, বয়স ১৭ বছর। পুনরায় রক্তাক্ষরে, চট্টগ্রাম সংগ্রামের শহীদ-নামায় লেখা হয়ে রইল এই চারজন তরুণ কিশোরের নাম। দেশের মুক্তির জন্য আপন ইচ্ছায় প্রজ্বলিত হোমের আগুনে তাঁরা নিজ নিজ জীবন আহুতি দিলেন।

কালার পোলের ৬ই মে'র এই ঘটনার পর ১৬ই মে সরকার পক্ষের ঘোষণা —সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, লোকনাথ বল, অনন্ত সিং, নির্ম্মল সেন, গণেশ ঘোষ, এদের সন্ধান জেনে ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচহাজার টাকা করে নগদ পুরস্কার। এরপরে অনন্ত সিং গিয়ে স্বেচ্ছায় ধরা দিলেন কলিকাতায় ইলিসিয়ান রোডে। এছাড়া আরও যাদের ধরে এনে কারাগারে বিচারের জন্য আটকে রাখা হল, তাদের ধারাবাহিক নাম—সুবোধ চৌধুরী, ফণী নন্দী, রনধীর দাসগুপ্ত, সুবোধ রায়, সহায়রাম দাস, সুখেন্দু দস্তিদার, নন্দলাল সিং, লালমোহন সেন, ফকির সেন, শান্তি নাগ, সুবোধ চন্দ্র মিত্র, মধুসূদন গুহ, নিতাই ঘোষ, মণি ঘোষ, ননীগোপাল দেব, ধীরেন দস্তিদার, অনিল দাস, সৌরীন দত্ত চৌধুরী, অশ্বিনী চৌধুরী, সুবোধ বিশ্বাস, সুকুমার ভৌমিক, আশু ভট্টাচার্য্য, হেরম্ব বল।

এদের নিয়েই সাজানো হল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা। স্পেশাল ট্রাইবুনালে বিচার। বিচারক চট্টগ্রামের তখনকার জিলা জজ মিষ্টার ইডনী। তার সহযোগী রায়বাহাদুর নরেন্দ্র নাথ লাহিড়ী। আর খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল। বিচারালয় হল, যেখানে বিপ্লবীদের আটকে রাখা হয়েছিল, তারই উপরের দোতলার একটি হল ঘর। বিপ্লবীদের পক্ষ সমর্থন করেন সেদিনের প্রখ্যাত আইনজীবী

শরৎচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্র শাসমল, সন্তোষ বসু প্রভৃতি। বিচার আরম্ভের দিন ধার্য হয়েছিল ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুলাই।

আর গোয়েন্দা পুলিশের অগোচরে থেকে সূর্য সেনের মনে তখন দানা বেঁধে উঠেছে কারাগার ভেঙ্গে ফেলে রাজবন্দীদের উদ্ধার করার পরিকল্পনা। "লাথি মার, ভাঙ্গরে তালা। যতসব বন্দীশালা, আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা আগুন জ্বালা"।

বাহির থেকে সূর্য সেনের নির্দেশ মত, ভিতর থেকে কারার কপাট ভেঙ্গে ফেলে বিপ্লবীদের পলায়নের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। ক'জন দাগী কয়েদী এসব জেনে ফেলে কর্তৃপক্ষের নিকট ফাঁস করে দেয়। বাইরের যোগসাজসে জেলের ভিতরে দরজা ভাঙ্গার আমদানী যন্ত্রপাতি শেষ পর্যন্ত হলো জেল কর্তৃপক্ষের হস্তগত। এরপর হন্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে কোথাও পুলিশ সূর্য সেনের সন্ধান পেলনা। তখন চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে শুরু করে দিল অকথ্য অত্যাচার।

এদিকে জালালার পাহাড়তলী থেকে উত্থিত ঝড়ের গতিবেগ বিশালায়তনে চট্টগ্রামের সীমা অতিক্রম করে, বাংলার প্রায় সর্বত্র বিস্তীর্ণ। মাঝে মাঝে একটু স্তিমিত, আবার প্রলয়ঙ্কর। অন্তরের বজ্র বিদ্যুৎ কোথায় কোন রাজ-পুরুষের শির লক্ষ্য করে কখন ভেঙ্গে পড়বে, এজন্য সর্ব্বত্র সবাই তারা ত্রস্ত ও সশঙ্কিত।

২০শে আগষ্ট বেলা যখন প্রায় দ্বিপ্রহর, লালদীঘির পাড়ে,—টেগার্ট সাহেবের ঐ পথে চলার নির্দিষ্ট সময় পূর্ব্ব থেকে সংগ্রহ করে, যথা স্থানে একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। ট্যাক্সির আরোহী দীনেশ মজুমদার, অনুজা সেনগুপ্ত ও আরও একজন বিপ্লবী। সঙ্গে তাদের লুকানো বোমা ও রিভলবার। টেগার্ট সাহেবের গাড়ী সম্মুখে আসতেই তার ভিতর লক্ষ্য করে তাদের হাতের বোমা নিক্ষিপ্ত হল। বিকট শব্দে বোমা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কিন্তু তার একটি টুকরোও সাহেবের অঙ্গ স্পর্শ করল না। আতঙ্কিত চারিদিকের লোকজন ছুটে এলো। তাড়া খেয়ে খেয়ে দীনেশ মজুমদার ধরা পড়ে গেলেন। আর তার পূর্বে অনুজা সেন নিজের বুকে গুলি করে বরণ করলেন শহীদের মৃত্যু। নাম না জানা অপরজন গায়ের বলে আগল ভেঙ্গে পালিয়ে গেলেন, আর তাঁকে ধরা গেল

না। বিচারের পর দীনেশের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ডালহৌসী স্কোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা নামে ইতিহাসে এ ঘটনা প্রসিদ্ধ হয়ে রইল। উক্ত ষড়যন্ত্রের যোগসাজসে নারায়ণ রায়, রোহিণী অধিকারী, সতীশ ভৌমিক, ভূপাল বসু ও অম্বিকা রায়ের অস্তিত্ব সন্দেহ করে, তাদের ঘরবাড়ী খানা তল্লাসীর পর অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা তৈরীর বহু উপকরণ পুলিশ উদ্ধার করে। গ্রেফ্‌তারের পর নারায়ণ রায় ও ভূপাল বসুর হয় পনের বছরের জন্য দ্বীপান্তর। বাকী সকলের পাঁচ ছয় বছরের জন্য কারাদণ্ড।

পরবর্তী ঘটনার স্থান ঢাকা মিট্‌ফোর্ড হাসপাতাল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট। ঐ দিন আই, জি মিষ্টার লোমান সাহেব ঢাকার এস, পি, মিঃ হড্‌সনকে নিয়ে মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে এসেছিলেন, অসুস্থ জল পুলিশের অধিকর্তা বার্ড সাহেবকে দেখতে। রোগীর ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দুজন কেবলমাত্র দাঁড়িয়েছেন, এসময় সম্মুখ থেকে তাক করে গর্জে উঠলো বার বা বিনয় বসুর হাতের রিভলবার। রক্তাক্ত দেহে দুজনেই তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল। লোকজন ছুটে আসার পূর্ব্বেই হাওয়ার সাথে যেন মিলিয়ে গেলেন বিনয় বসু। পুলিশ গোয়েন্দারা ঢাকায় আর তার কোন সন্ধান পেলনা। এ আগেই গা ঢাকা দিয়ে, ঢাকা ছেড়ে কলকাতায় তিনি পাড়ি দিয়েছেন অন্ধকারের গভীরে দলের সাথে সেখানে মিশে থেকে চলেছে নূতন ক চাঞ্চল্যকর আর এক আক্রমণের উদ্যোগ আয়োজন।

১লা ডিসেম্বর চাঁদপুর ষ্টেশনে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালী চক্রবর্তী সি, আই ডি, ইন্সপেক্টর তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করেন। হত্যার পর ষ্টেশন ছেড়ে পালিয়ে গিয়েও শেষ পর্য্যন্ত তারা ধরা পড়ে গেলেন। বিচারে রামকৃষ্ণের হয়েছিল ফাঁসীর হুকুম আর কালী চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পূর্বে বোমা তৈরী করার সময় সহসা একটা বোমা ফেটে গিয়ে গুরুতররূপে অগ্নিদগ্ধ হন। সেরে উঠে আগুনের খেলায় আবার মেতে ওঠেন।

এল তারপর ৮ই ডিসেম্বর। অন্ধকার আকাশ বিদীর্ণ করে প্রলয়ের ধূমকেতুর মত সহসা সেদিন বিনয় বসুর আবার আবির্ভাব মহাকরণের চত্বরে। সঙ্গের সাথী সেদিন তার আরও দুইজন—নাম দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত

পরিকল্পনামত যথাসময় মিলিত হলেন এসে খিদিরপুরের পাইপ রোডে, ট্যাক্সি চেপে তারপর মহাকরণের উদ্দেশ্যে যাত্রা। সাহেবদের দপ্তর সহ মহাকরণের অন্দরের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ছিল তাদের নখদর্পণে। বিনা বাধায় দ্বিধাহীন চিত্তে ঢুকে গেলেন তারা কারাবিভাগের অধিকর্তা কর্ণেল সিম্পসন সাহেবের কামরায়। তারপর সামরিক কায়দায় তিনজন যখন এক সারিতে দাঁড়িয়ে, সাহেব একমনে তখন ফাইল নিয়ে ব্যস্ত। ভ্রূক্ষেপ নাই—তাঁর সম্মুখে যাঁরা এসে দাঁড়িয়েছেন, চোখে তাদের রুদ্রের জ্বলন্ত বিদ্যুৎ-বহ্নি। মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে উঠলেন বিনয় বসু,—"সাহেব, শেষ নিঃশ্বাসের আগে ঈশ্বরকে স্মরণ কর; আমরা তোমার বৃটিশ সৈন্য নয়; আমরা এসেছি যমপুরী থেকে; আমার হাতে তোমার মৃত্যুর পরোয়ানা"। বজ্র নির্ঘোষের সঙ্গে সঙ্গে দীনেশ ও বাদলকে হুকুম দিলেন,—'ফায়ার'। একসাথে গর্জে উঠলো তিনজনের হাতের রিভল্‌বার। সাহেবের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝের উপর। বিনামেঘে বজ্রপাতের মত মহাকরণের মর্মস্থলে পর পর গুলির আওয়াজ। আতঙ্কে থর থর করে কেঁপে উঠলো কর্মরত যে যেখানে ছিল। তারপর অলিন্দসহ দোতলার ঘরে ঘরে ঝড়ের বিক্ষোভে চলল তিন অগ্নিশিশুর প্রলয় তাণ্ডব। তখন একে অপরকে অতিক্রম করে সকলের আগে পলায়নের চেষ্টা। ভয়ার্ত মানুষদের আর্তচিৎকার ও পলায়নের চেষ্টায় সর্বত্র গেল মানুষের জট পাকিয়ে। পায়ের তলায় দলিত হয়ে আহত ও মৃতপ্রায় শেষপর্যন্ত সিড়ির ধাপে ধাপে মানুষ পড়ে রইল। পালাতে গিয়ে আহত হল জুডিসিয়াল সেক্রেটারী নেলসন ও সেক্রেটারী টয়নাম। রুদ্রের তাণ্ডব যখন অলিন্দ অতিক্রম করে পাশপোর্ট অফিস আক্রমণে উদ্যত, ঠিক সেই সময় টেগার্ট সাহেব এসে তাকে বাধা দিল, সঙ্গে তার লালবাজারের বিরাট পুলিশবাহিনী। মুখোমুখি দুপক্ষের তখন শুরু হয়ে গেল গুলি বিনিময়। তিনজনের উদ্দেশ্য ছিল তখন, পুলিসের আগল ভেঙ্গে পলায়ন করা। কিন্তু গুলী তখন নিঃশেষ প্রায়। বিনয়ের ইঙ্গিতে একসাথে তিনজন ঢুকে পড়লেন শেষে পাশের এক উন্মুক্ত কামরায়; আর দুয়ার রুদ্ধকরে তিনজনেই মুখে গুঁজে দিলেন সায়নাইডের এম্পুল। মৃত্যুকে আরও ত্বরান্বিত করতে চেয়ে নিজ শির লক্ষ্য করে গর্জে উঠলো বিনয় ও

দীনেশের হাতের রিভলবার। এম্পুল আর তাঁদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করলনা। মুহূর্তমাত্র পরে বাদল ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। এদিকে দরজা খোল—বলে পুলিশের চিৎকার, আর জানলার ফাঁক দিয়ে অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ। ভিতরে সাড়াশব্দ কিছুই যখন আর পাওয়া গেলনা পুলিশ বাহিনী একসাথে ভিতরে ঢুকে গিয়ে দেখে, বাদলের দেহ প্রাণহীন, নিস্পন্দ। আর বিনয় দীনেশ রক্তে ভেসে মুর্ছিত হয়ে পড়ে আছেন স্বেচ্ছামৃত্যুর শরশয্যায়। বাদলের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হল আই. বি. অফিসে, আর বিনয়, দীনেশকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে এলে বিনয় যখন বুঝলেন এখনও তিনি জীবিত, ব্যাণ্ডেজ খুলে হাতের নখে মাথার ক্ষতকে তখন দিলেন আরও ক্ষতবিক্ষত করে। ১৩ই ডিসেম্বর তারপর সেই অমর শহীদ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চলে গেলেন বীরের চিরবাঞ্ছিত ধামে। আর হাসপাতাল থেকে দীনেশ গুপ্তকে বাঁচিয়ে তুলে নিয়ে আসা হল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেসন্ জজ্ গার্লিক সাহেবের সভাপতিত্বে গঠিত হল স্পেশাল ট্রাইবুনাল। ট্রাইবুনালের বিচারাদেশে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ঝুলানো হল তারপর তাঁকে ফাঁসির দড়িতে। সেদিন ছিল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই। কিন্তু রেশ এর এখানেই শেষ হলনা। মাত্র কুড়িদিনের ব্যবধানে গার্লিক সাহেবেরই বিচার কক্ষে তাকে শাস্তি দিতে বিচারক হয়ে আচমকা প্রবেশ করলেন কানাই ভট্টাচার্য। পর পর রিভলবারের গুলীতে সাহেবকে খতম করে আর পালাতে না পেরে ঐ খানেই করলেন তিনি শহীদের মৃত্যুবরণ। মৃত্যুর পর তাঁর পকেটে পাওয়া গেল ছোট্ট একটি কাগজের টুকরো। লেখা ছিল তাতে—"ধ্বংস হও",—দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসি দেওয়ার শাস্তি গ্রহণ কর,—বিমল গুপ্ত। ৭ই এপ্রিল ম্যাজিষ্ট্রেট পেডি সাহেবকে হত্যা করার পরথেকে বিমল গুপ্ত ছিলেন পলাতক। বিমলের নিরাপত্তার জন্য নিজেকে বিমল বলে জানিয়ে দিয়ে, কানাই ভট্টাচার্য পৃথিবীতে রেখে গেলেন বিপ্লবধর্মের অতি উচ্চাঙ্গের এক উজ্বল দৃষ্টান্ত।

বিনয়, বাদল, দীনেশ তিনজনেই ছিলেন ঢাকা জেলার অধিবাসী। বিনয় ছিলেন ঢাকা মিডফোর্ড স্কুলের চতুর্থবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। পৈতৃক বাড়ি বিক্রমপুরের রাউতভোগ নামক গ্রামে। বাদল গুপ্ত ঢাকা জেলার বানরী স্কুলের ছাত্র। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুরের পূর্ব সিমুলিয়া। দীনেশ গুপ্তের পৈতৃক গ্রাম

যশোলং। তিনি ছিলেন মেদিনীপুর জেলার বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের খ্যাতনামা সংগঠন কর্মী। আর কানাই ভট্টাচার্য, চব্বিশ পরগণার অধিবাসী, স্বর্গত বিপ্লবী সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া কর্মী ও দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবী। স্বাধীনতার জন্য বীরত্বের এই অপূর্ব কাহিনী স্বাধীনভারতের ইতিহাসে চিরপরিচিত হয়ে রইল—অলিন্দযুদ্ধ নামে।

* * * *

জাগো বঞ্চিত গণদেবতা,
ঐ ফাঁসির মঞ্চে কাঁদে মিলন বাঁশী।
জাগো সঞ্চিত বেদনারাশি।
খণ্ডিত মহাজাতি আত্মঘাতি
মৃত্যুর ইঙ্গিতে কলহে মাতি,
তোর ফুল্লকুসুমিত শ্যামল হাসি
আর মঙ্গল ঘট গেল রুধিরে ভাসি।
তোর আগুন লেগেছে ঘরে ঘরে
দেখে মিলন বাঁশী কেঁদে মরে।
জাগো মূর্চ্ছিত পদাহত শক্তি
জাগো নূতন উচ্ছ্বাসে নূতন বিশ্বাসে জাগো জাগো,
জাগো তন্দ্রাতিমির ঘোর জড়তা নাশি।

এদিকে সূর্য সেনের কর্ম্মকুশলতা ও প্রখর বুদ্ধি দীপ্তি, দলকে পূর্বের ন্যায় আবার গড়ে তোলার সাধনায় নিমগ্ন। বিচক্ষণতার সঙ্গে স্থানে স্থানে শুরু হয়ে যায় আবার গুপ্ত আক্রমণ। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের উল্লেখিত পর পর প্রলয়ঙ্কর ঘটনাবলীর অনিবার্য পরিণতির পূর্ব্বেই মহাকালের অন্তস্থল ভেদ করে রক্তাক্ত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ আত্মপ্রকাশ করে। বছরের প্রথমার্ধ প্রায় যখন শেষ এ সময় বিপ্লবীদের ঘায়েল করার সবকিছু উপকরণ সংগ্রহ করে, শুরু হয়ে গেছে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা। গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে পলাতক অম্বিকা চক্রবর্তীকে, পুলিশ প্রহরায় কলিকাতার লালবাজার থেকে আনা হয়েছে গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্তকে।

এদের উদ্ধার করা ও মামলার উদ্যোক্তা ও বিচারকমণ্ডলীকে নিধন করার উদ্দেশে, সূর্য সেনের মাথায় এলো তখন মাইন তৈরীর বৈপ্লবিক পরিকল্পনা। ভাবনার সাথে সাথেই চললো কর্মের উদ্যোগ আয়োজন। কয়েকদিনের মধ্যেই নানা উপকরণ সংগ্রহ করে পাঁচমন বারুদ প্রস্তুত হল। কল্পনা দত্ত ও মনোরঞ্জন রায়ের তত্ত্বাবধানে কলিকাতা থেকে আমদানী করা হল গান কটন ও প্রয়োজনীয় নানা জাতীয় অ্যাসিড। মাইন প্রস্তুত হলে, বিচারক ও সরকার পক্ষীয়দের দৈনিক চলার পথে পেতে রেখে, তাদের নিঃশেষ করা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে অনুসন্ধানী গুপ্তচরেরা এর সন্ধান পেলো। তাদের তৎপরতায় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গিয়ে, সংগোপনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত মালমশলা পুলিশের হাতে পড়ে সব বানচাল হয়ে গেল। এর বহু জিনিস রাসায়নিক পরীক্ষার পর দেখা গেল, পরিকল্পনা মত এর কার্যকারিতায়, সরকার পক্ষের বহু লোকের ব্যাপক ধ্বংস ছিল অনিবার্য। বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে শহর ও শহরতলীর চারধারে শুরু হয়ে গেল আবার ধরপাকড়। কল্পনা দত্ত সহ এগার জনকে গ্রেফ্‌তার করে রুজু করা হল আর এক নূতন মামলা—নাম ডিনামাইট ষড়যন্ত্র।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট বেলা যখন সাড়ে পাঁচ ঘটিকা, চট্টগ্রাম শহরের ফুটবল খেলার মাঠে বিপ্লবীর দৃঢ় হস্তের রিভলবার তখন বিপ্লবীদের চরম শত্রু পুলিশ ইনস্‌পেক্টর আসানুল্লার বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে। বিপ্লবীর নাম হরিপদ ভট্টাচার্য। কিন্তু মাঠের অগণিত দর্শক ও পুলিশ বাহিনী অতিক্রম করে পালিয়ে যাওয়া আর তার পক্ষে সম্ভব হলনা। ধরা পড়ে গিয়ে পুলিশের প্রহার ও অত্যাচারে এই কিশোরের সর্বদেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে শেষে দরবিগলিত রক্তধারা! প্রহারের সাথে সাথে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা,—কি নাম, কোথায় থাক? কিন্তু রসনা তার নীরব; নানা ভাবে উৎপীড়িত হয়েও মুখ বোবা, রক্তাক্ত দে পাষাণের মত দৃঢ়। বিচারের পর প্রথম হল ফাঁসীর হুকুম। আপীলের প বালক বলে হাইকোর্টের বিচারে হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শেষ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি আরও নয়মাস পরে সেদিন ছিল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ। বেলা যখন ন'টা, শৃঙ্খলিত বন্দীদে দোতালার বিচারঘরে নিয়ে গিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করানো হল। বিচার ইউনি, গুরু গম্ভীর আওয়াজে যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘোষণ

করলেন ব্রিটিশ বিদ্বেষী দুশমনদের শাস্তির বিস্তৃত বিবরণ। গণেশ ঘোষ, অনন্তলাল সিংহ, লোকনাথ বল, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, রণধীর দাসগুপ্ত, সুবোধ রায়, সহায়রাম দাস, লালমোহন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার ও আনন্দ প্রসাদ গুপ্ত—প্রত্যেকের প্রতি দণ্ডাদেশ হলো যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড (২৫ বৎসর)। নন্দলাল সিংহের হলো ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড। অনিলবন্ধু দাসকে কম বয়স বলে লঘুদণ্ড দেওয়া হল। এ ছাড়া প্রমাণ অভাবে ১৯ জনকে মুক্তি দিয়ে আবার তাদের কারাগারে আটকে রাখা হলো। যথাক্রমে তাদের নাম—অখিলবন্ধু দাস, অনিলবিকাশ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার চৌধুরী, আশুতোষ ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্র দস্তিদার, নন্দলাল সিংহ, ননী গোপাল দেব, নিতাই পদ ঘোষ, বিজয় কুমার সেন, মধুসূদন গুহ, শান্তি ভূষণ নাগ, শ্রীপতি চৌধুরী, সুকুমার চৌধুরী, সুবোধ বল, সুবোধ বিশ্বাস, সুবোধ মিত্র, সৌরীন্দ্র দত্ত চৌধুরী, হেরম্ব বল, হেমেন্দু দস্তিদার।

এর পূর্ব্বোক্ত ইতিহাসের আর একটি কলঙ্কিত রক্তাক্ত দিবস ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর। পুলিসের বেপরোয়া গুলিতে হিজলীর জেলখানায় বয়ে গেল রক্তগঙ্গা। আর বন্দী সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত, ঐ স্থানেই শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন। এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতের পটভূমিকা—সন্দেহের বশে বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে বিপ্লবীদের ধরে এনে, বিনা বিচারে হিজলীর কয়েদ খানায় অন্তরীণ রাখা। এর একমাত্র সুনির্দিষ্ট কারণ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিং ও মেদিনীপুর'এ বিপ্লবীদের ব্যাপক আক্রমণে রাজপুরুষদের মনে ত্রাস ও ভয়ের সঞ্চার। ঘরে বাইরে সর্বদা তারা সশঙ্কিত।

অন্তরীণ বন্দীদের দৈনিক খরচের টাকার অঙ্ক নিয়ে, সর্বপ্রথম হয় কলহের সূত্রপাত। তার পরে হয় অসুখের চিকিৎসার বন্দোবস্ত নিয়ে। বন্দীদের শারীরিক অসুস্থতা, খরচার ভয়ে কর্তৃপক্ষের ক্রমে উপেক্ষার বিষয়বস্তু হয়ে উঠে। বন্দীদের মনে দানা বেঁধে ওঠে গুরুতর অসন্তোষ। আর জেলখানার কর্তৃপক্ষ ক্রমে ওঠে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে। ক্রোধের এ আগুন আরও প্রবল ভাবে জ্বলে উঠলো যখন তারা দেখল, জজ্ সাহেব মিষ্টার গার্লিক কানাই ভট্টাচার্যের গুলীতে খতম হওয়ায় বন্দীদের দ্বারা জেলখানার ফটক আলোক

মালায় সুসজ্জিত হয়েছে। উক্ত ঘটনার পর ১৫ই সেপ্টেম্বর বন্দী দীনেশ সেনকে বক্সা বন্দী নিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়। অপর বন্দীরা তাকে দল বেঁধে প্রধান ফটকের কাছে পৌঁছে দিতে আসে। প্রহরীরা বাধা দিতে এলে, উপেক্ষার হাসি হেসে বন্দীরা এ বাধা অগ্রাহ্য করে। অপমানের জ্বালায় প্রহরীদের ক্রোধবহ্নি তখন আরও প্রজ্বলিত। পরের দিন রাত্রে বন্দীদে আবার ঘরের বাইরে পদচারণা করতে দেখে, প্রহরীদের একজন বন্দুক উঁচিয়ে চিৎকার করে বলে উঠে—"শালা লোগকো মার ডালো। বড়া সাহেবকে হুকুম মিল গয়া।" বিনা বিচারে আটক নিরস্ত্র বন্দীদের উপর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে শুরু হল রাইফেলের গুলী বর্ষণ। মুহূর্তের মধ্যে হিজলীর জেল কম্পাউণ্ডে শত শত বন্দীর রক্তে রক্ত গঙ্গার তুফান খেলে গেল। আহতদে আর্ত চিৎকারে প্রাচীরের চারধার থর থর করে কেঁপে উঠলো। হিজলীর এ মর্মান্তিক দুঃসংবাদ কলিকাতায় পৌঁছানো মাত্র ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন জে. এম, সেনগুপ্ত ও সুভাষচন্দ্র। গিয়ে দেখেন সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্তর জীবন প্রদীপ চির দিনের মত নিবে গেছে। আর শত শত বন্দী বন্দুকের গুলীতে আহত।

জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের পর আর একবার হিজলীর জেলে বিনা বিচারে আটক বন্দীদের ঘিরে, ইংরেজ সরকারের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড পরদিন দুই শহীদের মরদেহ সুভাষচন্দ্র ও জে. এম. সেনগুপ্তর তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা হল হাওড়া ষ্টেশনে। কলিকাতার একলক্ষ লোকের মিছিল, শহীদদের মরদেহ নিয়ে শহর প্রদক্ষিণের পর কেওড়াতলার মহাশ্মশানে তাঁদের শেষকৃ সম্পন্ন করে।

জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজ প্রদ 'নাইট' খেতাব বর্জন করেন। পরাধীন নিরস্ত্র জাতির উপর নৃশংস অত্যাচারে বিরুদ্ধে সেদিন তাঁর আক্রমণাত্মক ভাষার ধার ছিল তীরের ফলার ম সুতীক্ষ্ণ। এর বার বছর পরে হিজলী জেলের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। কবি তখ বয়সের ভারে ন্যুব্জ, অসহ্য মনোবেদনায় কবির দেহের উজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ বিষাদে কালিমায় তখন ম্লান। লেখনীর ধারায় সেদিন মেঘমেদুর আকাশের অশ্রু প্লাবন।—তাই ঈশ্বরের আদালতে তাঁর সকরুণ 'প্রশ্ন'—

* * * *

“ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে—
তারা বলে গেল ‘ক্ষমা করো সবে,’ বলে গেল ‘ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো।’
বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে॥
আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপটরাত্রি ছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে।
আমি যে দেখেছি—প্রতিকার হীন, শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে॥
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীত হারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?”

সন্তোষ মিত্র আমাদের পূর্বপরিচিত। বিগত ১৯২৩-এর ৩রা আগষ্টের শাঁখারীটোলা পোষ্ট অফিস আক্রমণের দলপতি। বিপ্লবী নায়ক বিপিন গাঙ্গুলীর দলভুক্ত ও কলিকাতার বৌবাজার অঞ্চলের অধিবাসী। এজন্য ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ঐ অঞ্চলের সেণ্ট জেম্স্ স্কোয়ারের নাম পাল্টে 'সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার' রাখা হল। তারকেশ্বর সেনগুপ্তের বাড়ী ছিল বরিশালের প্রখ্যাত গৈলা গ্রামে। আকৈশোর তিনি ছিলেন বরিশালের শঙ্কর মঠ ও গৈলা সেবাশ্রমের একনিষ্ঠ বিপ্লবী কর্মী। তরুণ শহীদের স্মৃতির উদ্দেশে তারকেশ্বর নামাঙ্কিত একটি স্মৃতিস্তম্ভ গৈলা সেবাশ্রমে নির্মিত হয়। দেশবরেণ্য

নেতা সুভাষচন্দ্র বসু এই অনুষ্ঠানে গৈলায় গিয়ে সর্ব্বপ্রথম সেই শহীদস্তম্ভ মাল্যভূষিত করেন। আজ স্বাধীন ভারতে পরিত্যক্ত জন্মভূমির সেই পবি স্মৃতি এখনও মনকে ভারাক্রান্ত ও অশ্রুসিক্ত করে তোলে।

—অতীতের স্মৃতি, পুরাতন গীতি
হৃদয়ে জাগায় ব্যথা।

চট্টগ্রামের আসামুল্লার মত বিপ্লবীদের চলার প্রতিপদে পায়ে বেঁধার আ এক বিষাক্ত কণ্টক ছিল কুমিল্লার এস, পি,—শ্বেতাঙ্গ এলিসন সাহেব। সূর্যসে তার গোপন ঘাঁটি থেকে নির্দেশ দিলেন, যেমন করে হোক কুমিল্লার অত্যাচা এলিসনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। নির্দেশ পাওয়া মাত্র চট্টগ্রাম শহ ত্যাগ করে দলের জনৈক কর্মী চলে এলেন কুমিল্লা শহরে। অত্যল্প কালের ম তুললেন ওখানকার ভাঙ্গা দলকে পুনরায় সংহত ও সঞ্জীবিত করে। তারপ শৈলেশ রায় নামে এক বিপ্লবীর হাতে গুলী ভর্তি একটি পিস্তল অর্পণ ক নির্দেশ দিলেন ঐ পিস্তল দিয়েই এলিসন সাহেবকে হত্যা করার। শৈলে রায়, সানন্দে এ কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সর্বদা থাকে রাত দিন সুযোগে সন্ধানে। তারপর সাহেব একদিন সাইকেল চেপে পথ চলার সময়ে, ঝড়ে হাওয়ায় যেন উড়ে এসে, সাহেবের বক্ষ বিদীর্ণ করে দিয়ে, চোখের পলা হাওয়ায় আবার মিলিয়ে যায়। রক্তাপ্লুত হয়ে এলিসন সাহেব পড়ে রই পথের ধূলায়। হন্যে হয়ে সর্বত্র খুঁজেও কেউ কোথাও আর শৈলেশ রা সন্ধান পেলো না।

মহাকালের প্রভাবে উত্থিত ঝড়ের উদ্দাম গতি, ক্রমেই বিস্তীর্ণ শাখ প্রশাখায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ আরও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দেখে ভীত ত্র ইংরেজ সরকারের রক্ত চক্ষু ক্রোধে হয়ে ওঠে আরও রক্তবর্ণ।

এর অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর দমন নীতি অগ্রগতি বিনা বাধায় অব্যাহত রাখার জন্য 'বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স' নামে এক অর্ডিন্যাস জারি করা হয়। তাতে বাংলাদেশের প্রতি জেলায় জেলাশাসক করা হয় জেলার সর্বময় কর্তা। সন্দেহের বশে যে কোনও মানুষকে ধরে এ খুশীমত দণ্ডদানের অধিকার বর্তায় জেলাশাসকের হাতে। এ আইনের ব

অন্তত বিপ্লবীদের ব্যাপারে জুরীর সহায়তায় আদালতের মামলা, অথবা স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচার প্রহসন, সাময়িক শিকেয় তোলা থাকে। এককথায় জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিজেলায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তাছাড়া এ আইনের ক্ষমতাবলে ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল, ফরিদপুরের বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান ও যে সব আশ্রমে ছেলেমেয়েদের গোপনে অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হত, জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশে, পুলিশ বাহিনী সে সব আশ্রমগুলি বেআইনি ঘোষণা করে। উত্তেজনায় তখন আরও দ্বিগুণ তেজে জ্বলে ওঠে বিপ্লবীদের মনের আগুন। তাদের ঘোরতর শত্রু হয়ে ওঠে শ্বেতাঙ্গ জেলাশাসকের দল। তাদের ধ্বংস যজ্ঞে নূতন করে স্থানে স্থানে বিপ্লবীরা আবার মেতে ওঠেন। কুমিল্লায় এলিসন নিধনের মাত্র কয়েকদিন পরে ঢাকার তৎকালীন অত্যাচারী জেলাশাসক ডুর্ণোসাহেব, বিপ্লবী সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিকের গুলিতে, শহরের রাজ পথে এক অসতর্ক মুহূর্তে অতি গুরুতর ভাবে আহত হয়। সাহেবের ছিল মদ্যপানে অত্যধিক আসক্তি। মদের মদিরায় বিভোর সাহেব, এক বোতল মদ বগলে নিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। মৃদুমন্দ গতিতে পথে অপেক্ষমান গাড়ীর পাদানিতে এক পা দেওয়ামাত্র, তাকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠলো সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিকের হাতের রিভলবার। বহুদিন ধরে দুজনে একত্রে মিলিত হয়ে ডুর্ণোকে হত্যাকরার সুযোগ খোঁজে। কিন্তু আশ্চর্য, সাহেবের অসম্ভব প্রাণশক্তির প্রাচুর্য। দু'জনের হাতের রিভলবারের গুলি দিব্যি হজম করে, আবার পূর্বের ন্যায় সুস্থ, সবল হয়ে সেরে ওঠে। ঢাকার নিরীহ শহরবাসীদের উপর তারপর শুরু হয় পুলিশের অহেতুক অকথ্য অত্যাচার। কিন্তু বিপ্লবীদ্বয়কে ধরা আর তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। পুলিশ ও গোয়েন্দার তীব্র দৃষ্টি অতিক্রম করে, হাওয়ায় তারা মিলিয়ে যায়। সরোজ গুহ ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও জালালাবাদ সংগ্রামের পর, ঢাকা শহরে এসে ফেরার বিপ্লবী। রমেন ভৌমিক নোয়াখালি থেকে ডুর্ণো হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে তার সাথে যুক্ত হন কুমিল্লায়।

এর পরবর্তী ঘটনার স্থান কুমিল্লা শহর। তরুণ ছাত্রদল কিংবা যুবসম্প্রদায় একত্রে কোথাও মিলিত হলেই তাদের উপর পুলিশের তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তাই স্কুলের মেয়েদের ওখানকার বিপ্লবী সমাজ গোপনে লাঠি, ছোরা-

খেলা ও বন্দুক চালনা শিক্ষা দেয়। তারপর শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট স্টিফেন্সকে হত্যা করার জন্য অস্ত্রশিক্ষাপ্রাপ্ত দুজন কিশোরীকে নিয়োগ করে। বালিকাদের একটি সাঁতার প্রতিযোগিতার সময় সেখানকার সভায় সভাপতিত্বের জন্য আহ্বান জানিয়ে প্রথমে তাকে প্রকাশ্য জনসভায় বের করে আনার কৌশল রচিত হয়। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আবেদন জানানো হয় সরকারী সাহায্যে সহরে মেয়েদের সাঁতার শিক্ষার একটি সুইমিং ক্লাব গড়ে তোলার জন্য। উত্তরে স্টিফেন্স সাহেব মেয়েদের পক্ষ থেকে দুজনকে তার দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষাৎ করার জন্য লিখে পাঠান। কিন্তু সাঁতারের পাল্লার সভা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে তিনি অসম্মত হন। তখন শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নামে দুটি বালিকা অতিউৎসাহে তার বাংলোয় প্রবেশ করে তাকে হত্যা করার দুর্ব্বার প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে আসে। সেদিন ছিল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর। তারা দুজনেই ছিল স্থানীয় কমরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। বয়স ছিল একজনের তের, অপর জনের চৌদ্দ বছর। সাহেবের বৈঠকখানায় তারা এসে উপস্থিত হন। তারপর কথাবার্তার মাঝখানে চকিতে একসাথে গর্জে উঠলো তাদের দুজনের হাতের গোপন আগ্নেয়াস্ত্র। সাহেবের বক্ষস্থল বিদীর্ণ হয়ে সাহেব মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আচ্ছন্ন সাহেবের বৈঠকখানার চারিপাশে জড় হয়ে শুরু হয়ে যায়, ভয়বিহ্বল পার্শ্বচরদের আর্তচিৎকার। বাইরের প্রহরারত পুলিস ভিতরে ছুটে আসে। ভিতর বাহিরের চক্রব্যূহ ভেদ করে বালিকাদের আর পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়না। বিচারের শেষে··· · নাবালিকা বলে তাদের আর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। দুজনেরই হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বাংলার বিপ্লবীদের প্রতিনিয়ত আত্মত্যাগের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অন্তঃপুরের নারী সমাজকেও অত্যল্প দিনের ভিতর জাগ্রত করে তোলে। দেশের মুক্তির জন্য মরণের আহ্বানে ভাইদের পাশে তারাও এসে দাঁড়ায়। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চেয়ে উপযুক্ত কাজের জন্য অপেক্ষা করে। এবং প্রতিটি কাজকে উজ্জ্বল মহিমায় সার্থক করে তোলে। যথাক্রমে তার দৃষ্টান্ত চন্দননগরের গোন্দলপাড়ায় চট্টগ্রামের পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রী সুহাসিনী দেবী। শ্রীপুর গ্রামের কুন্দপ্রভা সেন বিপদের ঝড়ঝঞ্ঝা মাথায় করে, শত্রুর হাতে মৃত্যু

ও লাঞ্ছনার ভয় উপেক্ষা করে, সূর্য সেনকে নিজঘরের অন্ধকার আড়ালে ঢেকে রেখেছেন। সূর্যসেনের শত্রুবিধ্বংসী ডিনামাইট পরিকল্পনার দুঃসাহসিক অভিযানে দেখি কল্পনা দত্তকে। দেশের মুক্তির জন্য জীবন আহুতির পূর্বে সর্বপ্রথম দেখি, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসির অপেক্ষায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের পাশে ভগ্নীর ছদ্মবেশে, ছদ্মনামে। এছাড়াও বহু নারী বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছেন। দনুজদলনী ভয়ঙ্করী হয়ে শত্রুর সাথে সংগ্রামে মেতে উঠেছেন। ধরা পড়ে কারাবরণ করে, অকুতোভয়ে হাসিমুখে দুঃখ লাঞ্ছনার সম্মুখীন হয়েছেন। কেউ বা করেছেন মৃত্যুবরণ।

ওই ওই ওই,
ভৈরবের ঘূর্ণিবাত্যা নেচে ওঠে থৈ তা তা থৈ।
তারি সাথে হাতে হাত মিলায়েছে করালিনী কালী
দনুজ দলনে, কালের পঞ্জর টুটি ধ্বনি ওঠে মাভৈঃ মাভৈঃ।

কালের নৃত্যের তালে তালে পা ফেলে, অগ্নিযুগও তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। কুমিল্লার জেলাশাসক ষ্টিফেনস্ হত্যার পক্ষকাল মাত্র পরেই পুরাতন বৎসরের শেষ। পৃথিবীর রথে, সাথে সাথে পথপরিক্রমায় ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের যাত্রা শুরু। এবারেও সর্বপ্রথম ঝলসে উঠলো বাংলার অন্তঃপুরের একুশ বছরের এক ক্ষ্যাপা মেয়ের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র। নাম বীণা দাস। সেদিন ছিল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। উৎসবের সভাপতি স্যর স্ট্যান্‌লী জ্যাক্‌সন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও তখনকার বাংলার শাসনকর্তা। উপাধিপত্র গ্রহণের জন্য ছাত্রী বীণা দাস ঐ সভায় উপস্থিত। সাহেবের উপাধিপত্র বিতরণের সময় তাকে লক্ষ্য করে হঠাৎ গর্জে উঠলো বীণা দাসের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র। কিন্তু নিক্ষিপ্ত গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। জ্যাক্‌সন সাহেব অক্ষত দেহে রইলেন। কিন্তু বীণা দাসের পক্ষে চারদিকের চক্রব্যূহ ভেদ করে বাইরে পালিয়ে আসা সম্ভব হল না। হাতের আগ্নেয়াস্ত্রসহ ঐখানেই ধরা পড়ে গেলেন। যথা সময় ট্রাইবুনালে হল তাঁর বিচার। ট্রাইবুনাল গঠিত হল বিচারপতি মন্মথ মুখার্জ্জী, চারুচন্দ্র ঘোষ ও মহিমচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে। বিচারে বীণা দাস নয় বৎসরের জন্য দণ্ডিত হন সশ্রম কারাদণ্ডে।

এরপর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল। মেদিনীপুরের জেলাশাসক মিঃ ডগলাসকে হত্যা করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সহরের এক সভায়, প্রহরারত পুলিশের এক অসতর্ক মুহূর্তে প্রবেশ করেন প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশু নামে দুইজন তরুণ বিপ্লবী। মিঃ ডগলাসের ঐ সভায় উপস্থিতির সংবাদ সঠিক ভাবে পূর্ব থেকেই তাঁরা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। উপযুক্ত সময় বুঝে প্রদ্যোৎ-ই প্রথম গুলী চালাতে উদ্যত হন। কিন্তু বার বার ট্রিগার টেপা সত্ত্বেও তাঁর হাতের অস্ত্র বোবা হয়ে রইল। পরক্ষণেই অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গর্জে উঠলো বার বার প্রভাংশুর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে ডগলাস রক্তাক্ত দেহে চেয়ারের উপর লুটিয়ে পড়ে ঐখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। বিদ্যুৎ বেগে দুইজনেই বাইরে বেরিয়ে আসার পর প্রদ্যোৎ পথ আগলে রিভলবার হাতে রুখে দাঁড়িয়ে থেকে, প্রভাংশুকে পালাবার পথ করে দিলেন। প্রভাংশুকে পাওয়া গেল না। পকেটে রিভলবার সহ প্রদ্যোৎ ঐখানেই ধরা পড়ে গেলেন। থানায় নিয়ে গিয়ে তাঁর দেহ অনুসন্ধানের পর পাওয়া গেল পকেটে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ, তাতে লেখা ছিল—আমাদের আত্মাহুতিতে জেগে উঠুক সারা ভারতবর্ষ। এরপর শুরু হল তাঁর উপর অকথ্য অত্যাচার। নিশ্চুপ বোবা সেজে প্রদ্যোৎ সমস্ত অত্যাচার সহ্য করলেন। ট্রাইবুনাল গঠিত হয়ে বিচারে হল তাঁর ফাঁসির হুকুম। প্রদ্যোতের জননী অতি কাতর ভাবে ব্রিটিশ রাজের নিকট পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু রাজদরবারে সম্পূর্ণ বিফল হল মায়ের চোখের জল। নানা কারণে ফাঁসির নির্দিষ্ট দিন সরে গিয়ে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী ধার্য হল। ঐ দিন প্রত্যুষে মেদিনীপুরের বীর বিপ্লবী সন্তান প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ক্ষুদিরামের মত ফাঁসির মঞ্চে দেশের মুক্তির জন্য আত্মাহুতি দিলেন।

ডগলাসের মৃত্যুর পর মেদিনীপুরের জেলাশাসকের শূন্য আসন পূর্ণ করলেন শ্বেতাঙ্গ বার্জ সাহেব। প্রদ্যোতের ফাঁসির দিন সাহেব স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ সাহেব ফাঁসির পূর্বে প্রদ্যোৎকে প্রশ্ন করলেন,—মৃত্যুর জন্য তুমি নির্ভীক ভাবে প্রস্তুত? প্রদ্যোৎ উত্তর দিলেন—"হ্যাঁ। তবে একটা কথা বলার জন্য মুহূর্ত মাত্র সময় আমাকে দাও"। সাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তার মৃত্যুর আগের কথাটা শুনতে চাইলেন।

চিরনির্বাণের পূর্বে জ্বলে উঠলো প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য। "—শোন সাহেব, মেদিনীপুরের বিপ্লবীদের প্রতিজ্ঞা, কোন শ্বেতাঙ্গ সাহেবকে মেদিনীপুরে থাকতে দেওয়া হবে না। তোমারও দিন ঘনিয়ে আসছে। এখন থেকেই প্রস্তুত হও।"

ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্ভীক প্রদ্যোতের এই ভবিষ্যৎ বাণীকে আটমাসের মধ্যে মেদিনীপুরের বিপ্লবীরা সত্যে পরিণত করে। পুলিস ও গোয়েন্দা বাহিনীর সর্বদা সতর্ক প্রহরা শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কবল থেকে বার্জ সাহেবকে রক্ষা করতে সমর্থ হলনা।

বার্জ সাহেব ছিলেন একজন সুদক্ষ ফুটবল প্লেয়ার। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর খেলার মাঠে সেদিন টাউন ক্লাবের সঙ্গে মহামেডান ক্লাবের খেলা। মাঠের চারদিক উৎসাহী হাজার হাজার দর্শকে পরিবেষ্টিত। বার্জ সাহেব টাউন ক্লাবের হয়ে মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে, বিনামেঘে বজ্রাহতের ন্যায় প্রাণহীন দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ঘটনার সাথে সাথে যেদিক থেকে গুলী এসেছে সেদিক লক্ষ্য করে, তাঁর দেহরক্ষী ও পুলিসের হাতের রাইফেল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে শুরু হল বেপরোয়া গুলী বর্ষণ। বিপ্লবীরাও দলভারী হয়ে মাঠে সেদিন এক সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দুইজন বেপরোয়া গুলী বর্ষণে রক্তাপ্লুত দেহে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তাদের নাম অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত। একদিকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ যেন প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য, অপর দিকে প্রাণ ভয়ে পলায়নরত দর্শকবৃন্দ। বিপ্লবীদের মধ্যে আর যাঁরা ওখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের আর খুঁজে পাওয়া গেল না। উন্মত্তের ন্যায় এরপর শুরু হল পুলিশ সুপার ইভান্‌স সাহেবের পুলিশ বাহিনী নিয়ে পলাতক বিপ্লবীদের অনুসন্ধানের নামে, মেদিনীপুরের শহর ও গ্রামের ঘরে ঘরে দানবীয় দমন নীতি ও অকথ্য অত্যাচার। অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বিষয় সম্পত্তির মায়া ত্যাগ করে, অনেকে অন্যত্র পালাতে শুরু করলেন। বিপ্লবীদের নাম ধরে ধরে, ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হল যথাক্রমে পাঁচ হাজার ও দশ হাজার টাকা।

এসময় চট্টগ্রামে পুলিসের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে নানা গোপন ঘাঁটি

থেকে সূর্য সেনের সপারিষদ প্রতিনিয়ত চলে আক্রমণাত্মক রণ প্রস্তুতি। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন। ঐ দিন সূর্য সেন, নির্ম্মল সেন ও অপূর্ব সেন—তিন জনেই একসাথে মিলিত হয়েছিলেন নবীন চক্রবর্তীর বাড়িতে। নূতন এক পরিকল্পনা ও তার প্রস্তুতির আলোচনার জন্য প্রীতিলতাও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। আর ঠিক ঐ দিনই গুপ্তচরের মুখে ক্যাপ্টেন ক্যামারণ সূর্য সেন, নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের ঐ বাড়িতে অবস্থিতির সংবাদ অবগত হয়। সাথেসাথে অতি সতর্ক ভাবে রাত্রিযোগে তাদের ধরার জন্য শুরু হল উদ্যোগ আয়োজন। ক্যাপ্টেনের হুকুমে তার সাথে সহযোগিতা করে বহু সশস্ত্র সিপাহীসহ স্থানীয় দারোগা মনোরঞ্জন বসু। প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষায় বসে থাকে তারা রাত্রির অন্ধকারের জন্য।

সূর্য্যাস্তের সাথে সাথে আকাশ হতে নেমে এলো সন্ধ্যার ম্লান ছায়া। ক্রমে ধলঘাটের পথ ঘাট হয়ে উঠল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রাত্রি যখন প্রহরাতীত, ক্যামেরণ সাহেব তখন যাত্রা করল তার সিপাহী বাহিনী নিয়ে সূর্য সেনকে জীবন্ত ধরে ফেলে বলিদানের জন্য সরকারের হাতে সঁপে দেওয়ার দুর্দমনীয় দুরাশা নিয়ে। সদম্ভে পুলিশ বাহিনী নিয়ে বাড়ীর চত্বরে পা ফেলামাত্র, উৎকর্ণ সূর্যসেন দোতলা থেকে তাদের আগমন বার্তা টের পেয়ে গেলেন, মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে অস্ত্র হাতে এক সঙ্গে সকলে হলেন সম্মুখ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। প্রথমে নীচের তলায় প্রবেশ করে, গৃহস্বামী নবীন চক্রবর্তী ও তার স্ত্রী পুত্র কন্যাদের হাতে শিকল পরিয়ে—পুলিশ প্রহরায় রেখে ক্যামেরণ সাহেব স্বয়ং সিঁড়ি বেয়ে সর্বাগ্রে উপরে উঠে গেলো সূর্যসেনের সন্ধানে। খট্‌খট্ বুটের শব্দ সিঁড়িতে কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে নির্মল সেন সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিলেন। সূর্য সেনকে বললেন,—"পিছনের বারান্দার মই বেয়ে প্রীতি ও অপূর্বকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যান। মাষ্টারদা, ঝোপ জঙ্গলের ঐ পথ এখনও ওদের অজানা। আপনাদের না যাওয়া পর্যন্ত সিড়ির পথ আমি আগলে থাকবো তারপর আমিও পালাতে চেষ্টা করবো। আপনাকে বেঁচে থাকতেই হবে। আপনার এভাবে এখানে মৃত্যু হলে প্রজ্বলিত এই অগ্নিমশাল এক ফুৎকারে ওরা নিবিয়ে দেবে।" এদিকে বদ্ধ কপাটে ক্যামেরণের বুটের দমাদম লাথি ও "দরজা খোলো" চিৎকার। লাথির পর লাথির আঘাতে পুরাতন

দরজার একটা পাল্লা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে উল্টে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরণের বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে, গর্জে উঠলো নির্ম্মল সেনের হাতের রিভলবার। ব্যাঘ্র যেমন রক্তের উন্মত্ত লালসায় শিকারীর বন্দুককে অগ্রাহ্য করে তার উপর ঝাঁপ দেয়, আর ঠিক তার সঙ্গে সঙ্গে শিকারীর অব্যর্থ সন্ধানে মৃত্যু যন্ত্রণায় নিষ্ফল আক্রোশে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করে,—সিঁড়ির উপর লুটিয়ে ক্যামেরণ সাহেবের ঠিক সেই অবস্থা। তারপর আর একটা গুলীর সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাণহীন দেহ সিঁড়ির উপর গড়িয়ে পড়ে ঝুলে রইল। একলা সিপাহী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে বীরের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। পরে শরশয্যায় যখন নির্মল সেন অন্তিম শয়নে, তখনও তাঁর মরদেহ অতিক্রম করে শত্রুপক্ষের অবিশ্রান্ত গুলী বর্ষণ, যার ফলে অপূর্ব সেনের পক্ষে আর পালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলনা। পর পর গুলীবিদ্ধ হয়ে তিনিও রেহাই পেলেন না মৃত্যুর হাত থেকে। ঘরের ভিতর আর কারোও যখন সাড়াশব্দ নেই, পুলিশবাহিনী তখনও আতঙ্কে রক্ত পিচ্ছিল সিঁড়ি দিয়ে, নির্ম্মল সেনের মরদেহ অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করার সাহস পেলোনা, রাত ভর তারা বাড়ির চৌদিকে প্রহরায় মোতায়েন রইল। সূর্যোদয়ের সাথে দলে দলে আরও পুলিশ আসার পর, সাহসে ভর করে দোতলায় উঠে দেখতে পেলো, এক কোণে ছিন্ন ভিন্ন অপূর্ব সেনের মরদেহ পড়ে আছে।

আর যাকে ধরার জন্য আড়ম্বর পূর্ণ এত আয়োজন, এত রক্তক্ষয়, সে কোন ফাঁকে স্থানত্যাগ করে পলাতক। অন্ধকারের বুকে সাঁতার কেটে অন্যত্র উধাও হওয়ার পর উৎকণ্ঠায় আর স্থির থাকতে না পেরে, প্রীতি একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করলেন,—"ওদের খবরটা কি কোন উপায়ে নেওয়া যায়না, মাষ্টারদা!"

"না—ও বাড়ির চারদিক এখন পুলিশ ঘিরে আছে। পিছন ফিরে তাকাবার সময় এখন তোমার আমার নেই। স্বাধীনতার জন্য বীরের ন্যায় যুদ্ধ করে যদি ওরা মৃত্যুবরণ করেই থাকে, শোক না করে তুমি আমি আমরণ ওদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবো"।

হায় মহারুদ্র বিপ্লবী বৈরাগী! মুক্তির পণে আর দেশপ্রেমের জলন্ত উন্মাদনায় বুকের অশ্রুর উৎস তোমার শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে। পাষাণের বুকেও অশ্রু আছে। কিন্তু তুমি! তুমি পাষাণ অপেক্ষা আরও কঠিন।

নির্ম্মল সেন ছিলেন চট্টগ্রামের যুবছাত্র অভ্যুত্থান ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের;

সময় সূর্যসেনের সেনানায়কদের মধ্যে অন্যতম। গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী ও অনন্ত সিংএর সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হবার পর মৃত্যুবরণের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত নির্মল সেন ছিলেন সূর্যসেনের সর্বদা পার্শ্বচর। এই জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তাকেও ধরে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল শেষপর্যন্ত দশ হাজার টাকা। ধলঘাটে বসে তারই শিক্ষার গুণে কল্পনা ও প্রীতিলতা উভয়েই অস্ত্রচালনায় সুনিপুণ হয়ে উঠেছিলেন। দেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গের সময় এই মহাবীরের বয়স ছিল মাত্র ২৫ বৎসর।

অগ্নিযুগ ইতিহাসের উজ্জ্বল সৌরলোকে, শৌর্যে, বীর্যে, বুদ্ধি ও সাহসে চিরকালের মত গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত একটি নাম – নির্মল সেন।

আর অপূর্ব সেন, মৃত্যুবরণের সময় এই অগ্নি কিশোরের বয়স ছিল মাত্র ১৫ বৎসর। মুক্তির অদম্য প্রেরণায় চট্টগ্রামের আরও বহু কিশোর ছাত্রের ন্যায় মুক্তি যজ্ঞে বুকের রুধির ঢেলে দিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলেন। ধন্য চট্টগ্রাম।

এর পরবর্তী ঘটনার স্থান আবার ঢাকা সহর। সেদিন ছিল ৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জুন। বিপ্লবীদের পরমশত্রু কামাখ্যা সেন ২৩ শে জুন ঢাকায় বেড়াতে এসে সহকর্মী সদর এস, ডি, ও শচীন চট্টোপাধ্যায়ের অতিথি হন। ঢাকার বিপ্লবীচক্র একথা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করার সুযোগ আবিষ্কার করার পর ২৬ শে জুনের গভীর রাত্রির অপেক্ষায় রইল।

বিপ্লবীদের উপর নানাভাবে অত্যাচারের নৃশংস পরিকল্পনা রচনায় ও তার প্রয়োগের প্রকাশ্য দম্ভোক্তিতে কামাখ্যা সেন মহাশয়ের মত দ্বিতীয় একজন বাঙ্গালী বাংলাদেশে বোধহয় আর ছিল না। অনেক ব্যাপারে ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত ঐ দুশমনের অত্যাচারের হাত হতে রেহাই পেতনা। উক্ত সেন মহাশয় বন্ধুর বাড়ীর একতলা ঘরের জানালা খুলে দিব্যি আরামে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর প্রায় অতীত—এমন সময় জানালার ফাঁক দিয়ে তার মস্তক লক্ষ্য করে ক্রুর অজগরের মত দুলে উঠলো বিপ্লবীর হাতের রিভলবারের অগ্রভাগ। তারপর পরপর তার ভয়াল গর্জনে সকলের ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে শুরু হয়ে গেল চতুর্দিকে জনতার আর্তচিৎকার। চারিদিক থেকে ত্রস্ত হয়ে ছুটে এলো প্রহরারত সিপাহী বাহিনীর যে যেখানে ছিল। কিন্তু

কামাখ্যা সেনের ঘুম আর ভাঙ্গলো না। পুলিস ও গোয়েন্দাবাহিনী বাকি রাতটুকু হন্যে হয়ে খুঁজেও কোথাও সন্ধান পেলো না, কিন্তু আনন্দে অধীর বিপ্লবীদের একজন ইছাপুরের সারদা মেডিকেল হলের সুরেশ গাঙ্গুলীকে টেলিগ্রাম করতে গিয়ে বোকামির জন্য ধরা পড়ে গেলেন। এই যুবকের নাম মনোরঞ্জন। টেলিগ্রামের ইংরেজী কথার বাংলা মানে ছিল নিম্নরূপ,—কামাখ্যার অস্ত্রোপচার সুসম্পন্ন। (Kamakhya's operation successful) দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তারবার্তা হাতে পেয়েই পোষ্ট মাষ্টারের মনে হয় গুরুতর সন্দেহের উদ্রেক। ওকে নানা কথায় ওখানে ভুলিয়ে রেখে, তৎক্ষণাৎ থানায় সে খবর পাঠায়। পুলিশ এসে সঙ্গে সঙ্গে ওকে গ্রেফ্‌তার করে। তারপর তার কাছ থেকে আরও তথ্য সংগ্রহ করে, অনুসন্ধানের পর গ্রেপ্তার করে কালিপদ মুখার্জিকে। কালিপদ ধরা পড়ার পর পুলিশের নিকট নির্দ্বিধায় স্বীকার করলো—"অন্য কারোর দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ঐ গুণ্ডাকে আমি হত্যা করেছি। ঐ দুশমন বাঙ্গালী হয়ে ধরপাকড়ের অছিলায় ঘরে ঘরে গিয়ে মা-বোনদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাতো। আমি তার প্রতিশোধ নিয়েছি। আমি একাই এ জন্য দায়ী। যথা সময়ে আদালতের বিচারে কালিপদের হলো ফাঁসির হুকুম।

কামাখ্যা সেনকে হত্যা করার পর ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে আগষ্ট আবার ঢাকায় শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপার মিঃ গ্রাসবীকে লক্ষ্য করে গর্জে উঠলো বিপ্লবীর হাতের রিভলবার। কিন্তু পালাবার মুখে তিনি ধরা পড়ে গেলেন। বিপ্লবীর নাম বিনয় সেন। বিচারে তাঁর হল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এদিকে মিঃ গ্রাসবী পূর্ব্বোক্ত জেলাশাসক ডুর্ণোর মত গুলীর আঘাত শেষ পর্যন্ত সামলে ওঠে। ঢাকার যখন এইরূপ পরিস্থিতি, চট্টগ্রামে তখন শাসকশ্রেণী ও তাদের বিশ্বস্ত অনুচর সুচতুর গোয়েন্দাবাহিনী ধলঘাটে সূর্যসেনকে ধরতে না পেরে, অধিকন্তু ক্যামেরণ সাহেবের নিহত হওয়ার পর, চট্টগ্রামবাসীদের উপর শতগুণ আক্রোশে ফেটে পড়ে।—কোথায় পালিয়ে আছে সূর্যসেন? যেমন করে হোক তাকে ধরা চাই,—গোয়েন্দাদের প্রতি কড়া নির্দেশ। কোথাও বা অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে, কোথাও বা লোক বুঝে মোটা টাকার প্রলোভন দেখিয়ে, সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ তাকে ধরার জন্য অন্ধকারে ফাঁদ পাতা হচ্ছে। অপরদিকে

সূর্য সেনের চলেছে শহরের পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবঘরকে ধ্বংস করার উদ্যোগ আয়োজন। এ যেন লুকোচুরি খেলার মত, একে অপরকে ঘায়েল করার নিরলস প্রচেষ্টা। পরিকল্পনা করা হল, মত্ত অবস্থায় রাত্রিযোগে হঠাৎ আক্রমণ করে শ্বেতাঙ্গ মাতালগুলিকে খতম করার। ক্লাবঘর ছিল অশ্লীল নাচগান ও মদ্যপানের এক বিরাট আড্ডাখানা। ১৭ই সেপ্টেম্বর একবার আক্রমণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। আক্রমণ পরিচালনার নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছিল কল্পনা দত্তকে। যথাসময় এ উদ্দেশ্যে কল্পনা দত্ত পাহাড়তলীর দিকে যাত্রা করেন। সঙ্গে অনুচর কয়েকজন মাত্র বিপ্লবী। দেওয়ান-হাটের কাছে গাড়ি এসে পৌঁছানোর পর তাদের চালচলন, প্রহরারত সাদা পোষাকের এক গুপ্তচরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর অপর কারণ, কল্পনা দত্তের সামরিক বেশভূষা। দেখা মাত্র হন্যে হয়ে ছুটে গিয়ে ঐ গুপ্তচর নিকটস্থ থানায় সংবাদ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গ পালের মত চারদিক থেকে বেরিয়ে আসে অসংখ্য সিপাহী। পথের সম্মুখ পিছন নিমেষে অবরুদ্ধ হওয়ায় অন্যত্র পলায়নের আর কোন উপায় থাকে না। প্রস্তুত হয়ে অস্ত্রচালনার পূর্ব্বেই সিপাহীরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কল্পনা দত্ত তার অনুচরদের নিয়ে ওখানে গ্রেফ্‌তার হন। অস্ত্র আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। জামিনে মুক্ত হয়ে তার পর দুদিন পরেই কল্পনা দত্ত ফেরার। পরবর্তী আক্রমণের তারিখ মাত্র এর এক সপ্তাহ পরে। সেদিন ছিল ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর। স্বাধীনতার ইতিহাসে এক প্রখ্যাত রক্তাক্ত দিবস।

রাত্রির প্রথম প্রহর প্রায় যখন অতীত, ক্লাবঘরে যখন পানোন্মত্ত শ্বেতাঙ্গ নরনারীদের কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গীতে নাচের আসর জমজমাট, আচমকা তখন এক মহাশক্তির নির্দেশে তাদের উপর দ্রুম-দ্রাম বজ্র পাতের মত গুলী বর্ষণ। রক্তের ঢেউয়ে সকলের মদের নেশা গেল টুটে। প্রমোদ ভবনে প্রাণভয়ে তখন শ্বেতাঙ্গ নরনারীদের বুক ফাটা আর্ত্তনাদ। কিন্তু অক্ষত যারা ছিল, মুহূর্ত্তের মাঝে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে বন্দুক হাতে মুখোমুখি রুখে দাঁড়ালো। ক্লাব ঘর আর তার বাইরের চত্বর তখন, দুপক্ষের অবিশ্রান্ত গুলী গোলায় রক্তাপ্লুত রণভূমিতে পরিণত হয়েছে। উত্তাল ঝড়ের বেগ ক্রমে ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলো। শেষে সম্পূর্ণ শান্ত। তখন দেখা গেল, ঘরের ভিতর মিসেস

সালিভান নামে এক ইংরাজ মহিলার মৃতদেহ। আর শায়িত অবস্থায় তাকে বেষ্টন করে আছে আরও এগারজন। তাদের সর্ব্বাঙ্গ গুলীতে ক্ষত বিক্ষত। ক্লাব ঘরে শ্বেতাঙ্গদের নারীপুরুষ মিলিয়ে সংখ্যায় ছিল সে রাত্রে চল্লিশ জন। বিপ্লবীদের অনেকেই অল্পবিস্তর আহত অবস্থায় পলাতক। কিন্তু একটু দূরে সারাদেহ রক্তে ভেসে গিয়ে রক্তজবার মালায় যেন ভূষিত হয়ে পুরুষ সৈনিকের বেশে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে আছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের মরদেহ। মহীয়সী বীরাঙ্গনা শত্রু হস্তে পতিত হবার পূর্বে সায়নাইড পান করে দেহ থেকে আত্মাকে বিমুক্ত করেছেন।

চট্টগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন স্থানীয় খাস্তগীর বিদ্যালয় থেকে। ঢাকায় ইডেন কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে কলিকাতায় এসে বি. এ. পাশ করেন বেথুন কলেজ থেকে। ঢাকায় যখন ছিলেন তখন এলেন ঢাকার দীপালী সংঘ নামে একটি ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে। এই খানেই হয় সর্বপ্রথম তাঁর অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার হাতেখড়ি। বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস যখন আলিপুর জেলে ফাঁসির হুকুমের পর মৃত্যুর প্রতীক্ষায়, এই অসাধারণ মেয়ে প্রীতি তখন নাম পাল্টে রাণী নামে রামকৃষ্ণের বোন পরিচয়ে বহুবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। রামকৃষ্ণ তখন তাঁকে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে, চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে আমরণ সূর্যসেনের নির্দেশে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট দিনে রামকৃষ্ণ ফাঁসির দড়িতে মৃত্যুবরণ করলেন। প্রীতি চোখের জল সম্বরণ করে চট্টগ্রামে ফিরে এসেন। অনেক অসাধ্য সাধনার পর সূর্য সেন ও নির্মল সেনের দেখা পেলেন। তখন কল্পনা ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, দুজনেই নির্মল সেনের শিক্ষায় অস্ত্রচালনা বিদ্যায় সুনিপুণ হয়ে উঠেন। মৃত্যু প্রতীক্ষায় রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের নিকট বিপ্লবের অগ্নি মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সূর্য সেনের সংস্পর্শে আসার পর, তাঁর বুকের জ্বলন্ত দেশ প্রেমের পাবক শিখায়, প্রীতি যেন ত্যাগের দীপ্তিতে দিন দিন আরও উজ্জ্বল, আরও মহীয়সী। তার উপর নির্ম্মল সেনের সম্মুখ সমরে আত্মাহুতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শত্রু আক্রমণে তাঁকে আরও উৎসাহিত করে এবং ২৪শে সেপ্টেম্বর সূর্য সেনের নির্দেশে আপনাকে শত্রু সংহারে নিয়োজিত করে' প্রস্ফুটিত রক্তজবার মত আপনাকে উৎসর্গ করে দেশ

মাতৃকার পায়ে। বিষের ক্রিয়া অমৃতময় হয়ে মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠে সর্ব্বশেষে জয়ের পরমবিশ্বাস।

জয় হবে জয় হবে হবে জয়।
অসুর দলনে ঐ নেচে ওঠে মাতা,
এক হাতে তার খড়্গ করাল—আর হাতে বরাভয়।
বাংলার মেয়ে প্রীতি মাতে রণরঙ্গে,
সংহার তাণ্ডবে সমর তরঙ্গে,
রুধিরের খরধারা বহে সারা অঙ্গে,
ভ্রূভঙ্গে নাচে ঝড় যেন সে মহাপ্রলয়।
বঙ্গ বীরাঙ্গনা জ্বলন্ত বহ্নি,
ধরণীতে রেখে গেলো শৌর্যের পরিচয়।

এদিকে গুপ্তচর ও গোয়েন্দা পুলিশের চোখ এড়িয়ে, সূর্যসেনের আশ্রয়স্থল হল দিনের বেলায় অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যতল, পরে অতি সতর্কভাবে রাত্রিতে চলে পথ পরিক্রমা। এই করে কিছুদিন পরে আবার নূতন এক নিরাপদ আশ্রয় জুটল গৈরিলা গ্রামের ব্রজেন সেনের বাড়ীতে। পরে ওখানে তাঁর সাথে এসে মিলিত হলেন কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী ও মণি দত্ত।

দুঃসাহসের চরম পরিচয় দিয়ে পাহাড়তলীর ক্লাব ঘর আক্রমণ, ও প্রীতিলতার মৃত্যু বরণের পর, আবার গোয়েন্দা বাহিনীর উপর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, যেমন করে হোক সূর্য্য-সেনকে জীবন্ত ধরে ফেলা চাই। শুরু হলো, নূতন উদ্যমে হন্যে হয়ে সর্বত্র আবার খুঁজে ফেরার পালা। ধরে দিতে পারলে নগদ পুরস্কার দশ হাজার টাকা। অদৃষ্টের এমনই নির্মম পরিহাস, যে ব্রজেন সেনের নিজ সহোদর নেত্রসেন দশ হাজার টাকার লোভে সূর্য্য সেনকে সর্বত্র খুঁজে বেড়ায়। বিপ্লবীদের কেউই একথা আগে জানত না। নেত্র সেন যখনই টের পেয়ে গেল যে তাঁর নিজভ্রাতা স্বয়ং সূর্যসেনের আশ্রয়দাতা, তখনই সে এঘটনা পুলিশের গোচরে আনে।

সেদিন ছিল ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী। রাত্রির ঘোর অন্ধকারে বিরাট এক সিপাহী বাহিনী নিয়ে মেজর কীন নামে এক শ্বেতাঙ্গ ব্রজেন সেনের বাড়ীর চারিদিক এমন ভাবে ঘেরাও করে যে একটা পিঁপড়েও যাতে না ফসকায়। এত সন্তর্পণে এল, যে বাইরের কোনও সাড়াশব্দই ভেতরে কারও কানে আগে প্রবেশ করল না। তারপর অনুসন্ধানী আলোতে ঘরের চত্বর ও আকাশ ঝলসে দিয়ে শুরু হল মেসিন গানের প্রলয়ঙ্কর অগ্নিবর্ষণ। বজ্র বিদ্যুতে রাত্রিতে ঘুমের মানুষ যেমন চমকে ওঠে, ঠিক তেমনি করে চমকে উঠল সেদিন সেবাড়ীর প্রতিটি মানুষ। অনন্যোপায় হয়ে তৎক্ষণাৎ শুরু হলো সকলের রণপ্রস্তুতি। এক পক্ষে মাত্র চারটি রিভলবার আর অপর পক্ষ থেকে অবিশ্রান্ত মেসিন গানের গুলি। পালাতে হলে এর ভেতর দিয়েই পথ করে নিতে হবে। চার জনেই গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বেরিয়ে এল। সম্মুখে অগণিত সিপাহী আর পশ্চাতের অন্ধকারে বাধা হয়ে দাঁড়াল এক বাঁশের বেড়া। ঐ বেড়া টপ্‌কে কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী ও মণি দত্ত দ্রুত পালিয়ে গেলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শরীর অসুস্থ থাকায় সূর্য্যসেনের পক্ষে আর পালানো সম্ভব হয়ে উঠল না। বেড়া টপকাবার সাথে সাথে পালোয়ান এক নেপালী সিপাহী তাকে জাপটে ধরে বিকট ভাবে উঠল চিৎকার করে, "হুজুর দুশমনকে ধরে ফেলেছি,"। দৈহিক শক্তিতে উক্ত সিপাহী সূর্য্যসেনের চারগুণ। শোনা মাত্র সদম্ভে ওদিকে ধেয়ে গেল শ্বেতাঙ্গ সিপাহীর দল। কিন্তু গিয়ে দেখে— এ কি! প্রশস্ত ললাটের উপরিভাগ কেশ বিরল, খর্ব ও ক্ষীণকায় এই মানুষটি, এরই নাম সূর্যসেন, এই ক্ষুদ্র মানুষটির এত তেজ এত বুদ্ধি ও সংগ্রাম কুশলতা—যার শৌর্য্য ও পরাক্রমে বৃটিশ ভারতের পুর্ব্বাঞ্চল থর থর করে কেঁপে উঠেছে। যাকে ধরবার জন্য গোয়েন্দাদের সর্বত্র ছুটাছুটী, রাত্রিতে শুয়ে চোখে ঘুম নাই, সেকি এই!

শত্রু হলেও তাঁকে দেখে প্রকৃত বীরের শির হল শ্রদ্ধায় অবনত। আর বাকী সব পুঞ্জীভূত আক্রোশে ফেটে পড়ে, খ্যাপা কুকুরের মত ক্ষেপে উঠল।

পরাধীন দেশে স্বাধীনতাকামী মুক্তি সংগ্রামী নেতার ভাগ্যে যেসব উপঢৌকন জোটে এ ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হল না। কেউবা আপ্যায়ন করল বুটের লাথি দিয়ে, কেউবা লাঠির বেদম প্রহারে। তারপর বাহিরের অহেতুক

এই প্রকার পৈশাচিক আক্রমণে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের সর্বদেহ হয়ে উঠল ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত। কিন্তু চারিত্রিক ধৈর্য্যের গুণে মহাবীর স্থির, অবিচল, পাষাণের মত দৃঢ়। তার পর পুলিশ আবেষ্টনীতে অতি সতর্ক ভাবে চট্টগ্রামের জেলখানায় তাঁকে নিয়ে গিয়ে পুরে রাখা হল। পরদিন সারা ভারতবর্ষের দেশীয় কাগজ গুলির প্রথম পাতার সর্বপ্রধান খবর,—"রাহু কবলিত চট্টগ্রামের বিপ্লবী বীর সূর্য্যসেন"।

ঠিক মাত্র চারদিন পরের চমকপ্রদ ঘটনা। নেত্র সেনের দশ হাজার টাকা ঘরে আসার পথ সম্পূর্ণ সুগম, তাই মনের আনন্দে দ্বিপ্রহরে আহারে বসেছে। স্ত্রী ভাত বেড়ে দিয়ে অন্যত্র একটা কাজে গিয়ে ফিরে এসে দেখে, যে কোন এক বিপ্লবী গোপনচারীর সুতীক্ষ্ণ করাল খড়্গে নেত্র সেনের শির দেহচ্যুত হয়ে ভাতের থালায় গড়িয়ে পড়ে আছে; রক্তে সারা ঘর ভেসে গেছে। বিকট আর্ত চীৎকারে পাড়া কাঁপিয়ে তুলে থৈ থৈ ঘরময় রক্তের ভেতরে মুর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়লেন ভদ্রমহিলা। লোকজন ছুটে এসে এই হৃদয় বিদারী দৃশ্য দেখে আতঙ্কে শিউরে উঠলো। কেউ ভাবলে অতি লোভের বিষময় ভয়ঙ্কর পরিণাম।

সূর্যসেন ধরা পড়ে জেলে বন্দী হওয়ার পর, দলের নেতৃত্বভার গ্রহণ করলেন তারকেশ্বর দস্তিদার। অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সূর্য্যসেনকে মুক্ত করে আনার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত হল। কিন্তু জেলকর্তৃপক্ষের অতি সাবধানতায় ও গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় শেষপর্যন্ত তা গেল বানচাল হয়ে। উক্ত ঘটনার সাথে সংযুক্ত মনে করে উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহের পর পুলিশ গ্রেফ্‌তার করল শৈলেশ রায় নামে এক কলেজের ছাত্রকে। এর একদিন মাত্র পরেই পুটিয়া থানার দারোগা মাখন দীক্ষিত বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হল। গোয়েন্দা পুলিশের চোখ এড়াতে তখন তারকেশ্বর দস্তিদার, মনোরঞ্জন দাস ও কল্পনা দত্ত এসে আশ্রয় নিলেন গহিরা নামক গ্রামের পূর্ণ তালুকদারের বাড়ীতে। অতি অল্পদিনের ভেতরেই একথা পুলিশের কর্ণগোচর হয়। তারপর ১৯শে মে আবার মেজর কীন সসৈন্যে এসে পূর্ণতালুকদারের বাড়ী ঘেরাও করে। সে বাড়ীর চারিদিকের পথ অবরুদ্ধ হওয়ায় বাধ্য হয়ে সম্মুখ সমরে সবাই অবতীর্ণ হন। কিছুক্ষণ গুলি বিনিময়ের পর নিহত হন পূর্ণ

তালুকদার ও মনোরঞ্জন দাস। আর গ্রেফ্‌তার হলেন তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত। তাদের ধরে এনে চট্টগ্রাম জেলে রাখা হল। তারপর আবার নূতন করে সাজান হল আর এক দফায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা।

বিচারের জন্য ট্রাইবুনাল গঠিত হল। বিচারক মিস্টার ডব্‌লু. মেসার্প, রজনী ঘোষ ও খোন্দকার আলিতারেফ—বিচারালয় লোক চক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে, গোয়েন্দা কার্য্যালয়ের বিশেষ এক সুরক্ষিত কক্ষ। মামলা পরিচালনার জন্য সরকার পক্ষ থেকে এগিয়ে এলেন পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর নগেন বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীশ রায় চৌধুরী। সূর্য্যসেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তের পক্ষ সমর্থন করলেন কৌঁসুলী জে. ঘোষাল, বিনোদলাল সেন ও রজনী বিশ্বাস।

সরকার পক্ষ থেকে সংগৃহীত হল একশত পঁচিশ জন বটতলার সাক্ষিগোপাল। সব সাক্ষীদের মুখেই, ঠিক এক ধরনের শেখানো বুলি। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জুন থেকে একটানা ছয় মাস ধরে চলল মামলার বিচার। সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রতি হল মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। আর কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। খবর বাইরে আসার সাথে সাথে গুমোট ব্যথায় আবার কেঁদে উঠ্‌ল পরাধীন ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা। পাহাড়তলীর উত্তপ্ত দীর্ঘ শ্বাসে, সর্বত্র যেন এক পরম আত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথা—অন্তরের চাপা কান্না।

চট্টগ্রামের অভ্যুত্থানের ঠিক সমসাময়িক বিরাট আর একটি অভ্যুত্থানের আশংকায় বৃটিশ সরকার আবার বিব্রত ও বিচলিত হয়। নানা অশুভ সংকেতে, সারা দেশ জুড়ে নূতন চক্রান্তের আভাষ পাওয়া মাত্র, হুঁসিয়ার হয়ে সর্বত্র তাঁদের অনুসরণে গোয়েন্দাদের তৎপর হতে বলে।

প্রহরায় রত তন্দ্রালস কয়েক জোড়া চোখকে ফাঁকি দিয়ে, বিভিন্ন সময় হিজলী, বক্সা ও দেউলীর অন্তরীণ বন্দীদের অনেকে বাইরে কেটে পড়েন। তাঁরা পরে একে অপরকে খুঁজে বের করে একত্রে আবার মিলিত হন। এবং সুচতুর রাসবিহারী বসুর কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করে, বারমা মুলুক সহ সারা ভারত জুড়ে নূতন আর এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের শরজাল বিস্তারের চেষ্টায় ব্রতী হন। কর্তৃপক্ষের কানে এ খবর আসা মাত্র তাঁরা এদের ধর পাকড়ের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৩২-এর ২৮ শে ডিসেম্বর গোয়েন্দা পুলিশ প্রথম খুঁজে

বের করে জিতেন গুপ্ত নামে এক পলাতক বিপ্লবীকে। তাঁর কাছ থেকে এক সাংকেতিক চিঠি উদ্ধার হওয়ার পর খুঁজে বের করে প্রভাত চক্রবর্তী, কিশোরী মোহন দাসগুপ্ত, ধীরেন ভট্টাচার্য্য, নরেন ঘোষ, সীতানাথ দে, বিমল ঠাকুর, সুরেন কর চৌধুরী প্রভৃতি এক এক করে মোট আটত্রিশ জন বিপ্লবীকে গ্রেফ্‌তার করে,—তারপর আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র নামে তাদের বিরুদ্ধে আলিপুর কোর্টে এক মামলা রুজু করা হয়। তখনকার সরকারী গোয়েন্দা-চক্রের মতে প্রভাত চক্রবর্তী মশাই ছিলেন উক্ত বিপ্লবী চক্রের নেতা। সুদীর্ঘ দুই বৎসর আলিপুর কোর্টে এই মামলা চলে। তারপর বিচারকের দণ্ডাদেশে প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন গুপ্ত, পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, সীতানাথ দে, নরেন ঘোষ ও ধীরেন ঘোষের হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। অপরাধের ওজন বুঝে, অন্যান্য সকলের হল কারোর পাঁচ, কারোর ছয় বৎসরের জন্য কারাদণ্ড।

এই সময় রুশ বিপ্লবের লাল ছাপ মারা বিরাট মীরাট ষড়যন্ত্রের বিপ্লবীদেরও দীর্ঘ তিন বৎসর পরে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী বিচার পর্ব শেষ হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মীরাট ষড়যন্ত্রের মামলা ছিল সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন উক্ত মামলা শুরু। পুরো তিন বৎসর ধরে মীরাটের সেসন জজ শ্বেতাঙ্গ মিস্টার আর. এন. ইয়র্কের কোর্টে চলে এই মামলা। বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে এই মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হন বত্রিশ জন। অপরাধ, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিয়ে দেশের মুক্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত বিপ্লবীদের নামের তালিকা ও দণ্ডাদেশের বিবরণ:—মুজাফ্‌ফার আমেদ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ডাঙ্গে জোগলেকার ও নিম্বকারের দ্বাদশ বৎসরের জন্যে দ্বীপান্তর। দশ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরের আদেশ আরোপিত হল ব্রাউলী, মির্জাফর ও ওসমানের প্রতি। সাত বৎসরের জন্য হল শ্যামসিং, মজিদ ও গোস্বামীর প্রতি। আর অযোধ্যা প্রসাদ, পি. সি. যোশী ও অধিকারীর হল পাঁচ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর। চক্রবর্তী, সামসুল হুদা, সাইগল, গৌরী শঙ্কর প্রভৃতির প্রতি হল পাঁচ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাবাসের দণ্ডাদেশ। ইতিহাস-বিখ্যাত এই মামলায় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের পলাতক নরেন ভট্টাচার্য্য (বিদেশে

মানবেন্দ্র নাথ রায়) এই মামলার নথি-পত্রভুক্ত আর এক জন প্রধান আসামী। দেশে ফিরে আসার পর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে জুলাই সরকার ওয়াইনি হাউসে মানবেন্দ্র রায়কে গ্রেপ্তার করে। বিচারে হয় তাঁর ১২ বৎসরের জন্য কারাদণ্ড।

বাংলা সহ সারা ভারতময় পর পর ব্যাপক এতগুলি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটার পর, বৃটিশ সরকার অস্ত্র আইনের বলে কংগ্রেসের প্রতিটি অহিংস প্রগতি মূলক আন্দোলনের বুকের উপরেও বন্দুক উচিয়ে ধরে তাদের স্তব্ধ করে দেওয়ার সাধ্য মত চেষ্টায় ব্রতী হয়। কংগ্রেসের কার্য্যকারী সমিতি, প্রাদেশিক ও জেলা কার্য্যালয়, সব গুলিকে এক সাথে বেআইনী ঘোষণা করে। আইনের দোহাই দিয়ে বেআইনী ভাবে কংগ্রেসের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। অত্যাচারী পুলিশ বাহিনীর পর্বত প্রমাণ ব্যয়ভার বহন করে উঠতে না পেরে, জাতির সর্বশেষ রক্তটুকু নিঃশেষে শোষণ করার জন্য শান্তিরক্ষার বাণী প্রচার করে। শান্তি স্থাপনের নামে স্থাপন করা হয় পিটুনী ট্যাক্স। ব্যাপকভাবে পাইকারী হারে আদায় করা হয় সর্বত্র জরিমানা। এমন কি স্থানে স্থানে নির্দিষ্ট সময় ছাড়া ছাড়পত্র ব্যতিরেকে সর্বসাধারণকে বাইরে বের হতে নিষেধ করা হয়! এত অপমান নিপীড়ন সহ্য করেও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, কাল-নৃত্যের তালে তালে পা ফেলে সম্মুখে এগিয়ে চলেছে!

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের রক্তপিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে শুরু হল কালের রথে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের পথ পরিক্রমা। পূর্বতোরণের অন্ধকার স্তর ভেদ করে ১২ই জানুয়ারী জালালার ভালে যে সূর্যের উদয় হল, সে যেন আরও গাঢ় রক্তবর্ণ। ঐ দিন রাত্রি বারোটা ছিল সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার নির্দিষ্ট সময়। এর পূর্বে সূর্য সেন ও তারকেশ্বরের প্রতি ট্রাইবুনালের দণ্ডাদেশ পক্ষপাতদুষ্ট বিচার বলে তার উপযুক্ত কারণ বিশ্লেষণ সহ, ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জী হাইকোর্টে আবেদন পেশ করেন। গভীর উৎকণ্ঠায় রইল দেশবাসী ও আত্মীয়স্বজন মৃত্যুদণ্ড বাতিল হওয়ার আশায়। কিন্তু হাইকোর্টের পুনর্বিচারে ট্রাইবুনালের দণ্ডাদেশের কোন পরিবর্তন হল না।

ভোগবিলাসে আসক্ত মানুষের চোখে মৃত্যুর রূপ প্রতি মুহূর্তে অতি ভয়াল। কিন্তু অপরের সেবায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চোখে তার রূপ ভিন্ন। চল্লিশ

কোটী মানুষের শিকলপাশ ভেঙ্গে ফেলার জন্য যে মহাবীর সংসারে সর্ব-ত্যাগী, যে শিব, কণ্ঠে কালকূট ধারণ করে নানা ছন্দে নৃত্যপাগল, মৃত্যুর রূপ তার চোখে আনন্দপারাবারের চিরসত্য অমৃতময়। আবহমান কাল ধরে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে, মহাভারত, বাইবেল, কোরান এর সাক্ষ্য দেয়। সূর্যসেনের মনও মৃত্যুর পূর্বেই মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় দেহের বাঁধন অতিক্রম করে অসীমের বিশালতায় চিরসত্য আনন্দময় ব্রহ্মে বিচরণ করত। মহাভারতের মহাবীর অর্জুনের মত অখণ্ড তাঁর এই বিশ্বরূপ দর্শনের পরিচয় আমরা পাই, তাঁর বৌদির নিকট লিখিত কয়েকখানি পত্রের মাধ্যমে। তার অংশবিশেষের উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া গেল।

"বৌদি, আপনাদের অগাধ স্নেহ আমায় পৃথিবীতে বেঁধে রাখতে পারল না বলে দুঃখ করবেন না। স্নেহ, মমতা, ভালবাসা যতই গভীর হোক, যতই অপরিসীম হোক, তা কখনও মানুষকে চিরদিন সংসারে বেঁধে রাখতে পারবে না। একদিন ভগবানের বিধানে সমস্ত বন্ধন কেটে সে অসীমের পানে ছুটে চলে যাবেই। ইহাই সৃষ্টি-কর্তার বিধান। আমার কোন দুঃখ নেই। আমার মন আজ অসীমকে চায়, ভগবানের সান্নিধ্য চায়। দিন ভালই কাটছে।

চার পাঁচদিন আগে একদিন সন্ধ্যার সময় একদৃষ্টে একমনে আকাশের দিকে চেয়ে ছিলাম। নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় সমস্ত নীল আকাশ ভরে গিয়েছিল, অসংখ্য নক্ষত্র সুন্দর ফুলের মত সারা আকাশে ফুটে রয়েছিল। গাছগুলি নীরবে যেন প্রকৃতির এই শোভা উপভোগ করছিল। দেখতে দেখতে আমার মন প্রকৃতির এই বিমল সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবে গেল—মনে গেল পড়ে তাঁর কথা, যিনি এই সুন্দর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের আনন্দের জন্য প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য-ভাণ্ডার খুলে রেখেছেন। তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে মনে বেশ আনন্দ হল। অনেকক্ষণ এভাবে কেটে গেল। আজকাল প্রায়ই এভাবে অসীমের চিন্তাতেই মন ভরপুর হয়ে থাকে। বৌদি যাই, আমায় আশীর্বাদ করুন।"

ফাঁসির কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বের আর একখানি পত্রের উদ্ধৃতি।

"শ্রীচরণেষু—স্নেহময়ী বৌদি, আজ পথের প্রান্তে আপনাদের অকৃত্রিম স্নেহের আবেষ্টন আমায় এ জগতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আজ আমি

অনন্ত পথের যাত্রী, অসীম আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে, আজ আমি এই পৃথিবীর কেউ নই। তবুও আপনাদের স্নেহের পরশ আমার আধাজাগ্রত অস্পষ্ট স্মৃতির বুকে স্পন্দন জাগিয়ে তুলছে। অসীমের আকুল আহ্বান, স্নেহের সুখস্মৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমার বিদায়ের মুহূর্তকেও মধুময় করে তুলছে। বিদায়ের করুণ রাগিণী স্মৃতির মধুর রাগিণীর পরশে, আনন্দের মূর্ছনা সৃষ্টি করছে। আমার এই পরম-ক্ষণটিতে আপনাদিগকে আমার বলবার বিশেষ কিছুই নেই। কেবল এইটুকুমাত্র বলতে চাই, আমার এই যাওয়া টুকুকে আপনারা পরম পিতার মঙ্গল ইঙ্গিত বলেই গ্রহণ করবেন, তাঁর শুভ আশীষ বলেই উপলব্ধি করবেন। এপারের চলা শেষ হল।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী কনকনে শীতের দিন। সন্ধ্যার পাতলা অন্ধকারাচ্ছন্ন অবগুণ্ঠনতলে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দিনের সূর্য। সারাভারতের আকাশজুড়ে নেমে এল বিষাদের কালো অন্ধকার। জেলখানায় লৌহ কপাটের অন্তরালে বন্দীদশায় ফাঁসীর অপেক্ষায় চট্টগ্রামের বীর সন্তান সূর্যসেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার। নিদ্রার কোলে বিশ্বপ্রকৃতি নিঝুম নিস্তব্ধ, মাথার উপরে অনন্ত আকাশের তারাগুলি ক্ষীণ আলোকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। জেলখানার পেটা ঘড়িটা ঢং ঢং করে বার বার বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝন ঝন করে খুলে গেলো পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের খাঁচার লৌহদ্বার। তিনি ছিলেন তখন গভীর নিদ্রার কোলে নিমগ্ন। খুঁচিয়ে তাঁকে জাগিয়ে তোলা হল। সঙ্গে সঙ্গে উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর ধ্বনিত হল 'বন্দেমাতরম্'। অপর শেলে ঘুম ভেঙ্গে গেল তারকেশ্বরের। তখন দ্বৈতকণ্ঠের মিলিত "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি বার বার প্রতিধ্বনিত হল চতুর্দিকে। থর থর করে কেঁপে উঠলো শহীদের রক্তে লাল ইংরেজের বন্দীশালা। আর, সূর্য সেনের ও তারকেশ্বরের মুখের উপর পড়তে লাগল জেলখানার গোলামদের চড়-চাপড়-ঘুষি। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিকট চিৎকারে এর প্রতিবাদ জানিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন সূর্য সেন। মর্মান্তিক এই দৃশ্য দেখে, মৃত্যুপথ-যাত্রীদের উপর সহানুভূতিতে অশ্রুসজল হয়ে উঠলো কয়েদীদের চোখ। প্রহারে প্রহারে অচেতন হওয়ার পূর্ব্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত মুখে উচ্চারিত হল "বন্দেমাতরম্"। এই দৃশ্য দেখে, এ অবস্থায় তাদের গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিতে জহ্লাদের

হাত কেঁপে উঠলো। আমরণ এই মহাবীরের মানসপটে ভারতবর্ষের [illegible] মানচিত্র অঙ্কিত হয়ে ফুটেছিল, তার ত্রিসীমায় সমুদ্র মেখলা, শীর্ষে হিমাচল আর অন্তরে জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে একই সূত্রে গ্রথিত এক মহাজাতি।

সূর্য সেন ও তারকেশ্বরকে ফাঁসির পূর্বক্ষণে, প্রহারে আধমরা অজ্ঞান করে ফেলার খবর বাকি রাতটুকু পর্যন্তই লোকালয়ে অজ্ঞাত ছিল। আবার সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথে বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে শহরে তা ছড়িয়ে পড়ল। তখন থেকেই এত বড় নৃশংসতার উপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য কয়েকজন বিপ্লবীর মনের আগুন দ্বিগুণ তেজে উঠল জ্বলে। রইল প্রতিনিয়ত তারা উপযুক্ত সুযোগের সন্ধানে। এর দশদিন মাত্র পরে হিমাংশু চক্রবর্তী, হরেন চক্রবর্তী, নৃত্য সেন ও কৃষ্ণ চৌধুরী বোমা ও পিস্তল নিয়ে ছুটে গেলেন খেলার মাঠে। মাঠের নির্দিষ্ট এক পাশে উপস্থিত ছিল শ্বেতাঙ্গ দর্শকেরা। তাদের লক্ষ্য করে পর পর ছুঁড়ে মারলো বোমা। আর উপস্থিত পুলিশ ও ইংরেজ সৈনিকেরা সঙ্গে সঙ্গে চালালো প্রতি আক্রমণ। খেলার মাঠ মুহূর্তে রণভূমিতে পরিণত হল। দর্শকরা দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার পর ধৃত হল সেখানে কৃষ্ণ চৌধুরী ও হিমাংশু চক্রবর্তী। বিচারের পর দুজনের প্রতি হলো ফাঁসীর আদেশ। এরপর, চল্লিশ কোটী মানুষের দাসত্ব মোচনের জন্য ত্যাগের গরিমায় উজ্জ্বল অগ্নিদীপ্ত নাটকের রঙ্গমঞ্চে নেমে এলো কালের কালো যবনিকা। জীবনে দারিদ্র্য দুঃখ, লাঞ্ছনা যতই আসুক, আজ শ্রদ্ধায়, নতশিরে স্বাধীন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে সেইসব তরুণ, কিশোর ও বালকদের স্মরণ করি, যারা—

ফাঁসির মঞ্চে দিল বলিদান মুক্তির গান গেয়ে।
যারা দিল প্রাণ সমরে আহুতি মুক্তির পথে ধেয়ে।

যাঁরা দেশের লাগি সর্ব ত্যাগী, তারাই মহাজন,
সব মানুষের মনের মাঝে পাতা তাঁদের সিংহাসন।
যারা দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে বরণ করে কারা,
উজাড় করে ঢেলে গেল বুকের রুধির ধারা।

শিকল পরে ভাঙলো শিকল, বলির খুনে ফললো ফসল
আগুন হয়ে উঠলো জ্বলে করলো জাতির শাপ মোচন।
তাই সহর গায়ের হাটে মাঠে লোকালয়ের মাঝে
বৈরাগীর প্রাণ একতারাতে তাদেরই গান বাজে—
যারা সাগর সেচে উদ্ধারিল স্বাধীনতা পরম ধন, তারাই মহাজন।

নয়

মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের ফাঁসীর হুকুমের পর বিপ্লবীদের একদল বাংলার শাসনকর্তা অ্যাণ্ডারসন-এর দার্জ্জিলিং-এ উপস্থিতির খবর গোপনে সংগ্রহ করে, সেখানে তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এই দলের মধ্যে ছিলেন বিপ্লবী ভবানী ভট্টাচার্য, রবীন ব্যানার্জী, মধু ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, সুকুমার ঘোষ ও উজ্জ্বলা মজুমদার। দার্জ্জিলিং-এ লেবং-এর ঘোড় দৌড়ের মাঠে গভর্ণরকে লক্ষ্য করে পর পর গুলি ছোড়া হয়। কিন্তু গভর্ণর অক্ষত থাকে। সাথে সাথেই তার দেহরক্ষীসহ পুলিশবাহিনী ও মাঠের চারদিকের জনতার পলায়নের পথ রুদ্ধ করে দেয়। বেড়াজালে একসাথে সব ধরাপড়ার পর, বিচারে ভবানী ভট্টাচার্যের প্রতি হল ফাঁসির হুকুম। আর অন্যান্য সকলের প্রতি কারাদণ্ডাদেশ। এই বৎসরই চট্টগ্রামের বাগুয়াতে এক বড় ডাকাতি হওয়ার পর সন্দেহের বশে অনেক বিপ্লবীকে ধরে, পুলিশ বাগুয়া ষড়যন্ত্র নামে আদালতে এক মামলা রুজু করে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও সন্দেহের বশে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় কয়েকজন বিপ্লবীকে। এদের মধ্যে ছিলেন মোক্ষদা ও প্রিয়দা চক্রবর্তী। এরপর আসে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ। বৎসরের প্রথমেই বাংলার গোয়েন্দাচক্র, বিভিন্ন স্থান হতে সন্দেহের বশে গ্রেফ্‌তার করে বাইশজন যুবককে ও আদালতে রুজু করে দেয় টিটাগড় ষড়যন্ত্র নামে আবার আর এক মামলা। দীর্ঘদিন ধরে চলে এর বিচার। তারপর দণ্ডাদেশে পূর্ণানন্দ দাসের প্রতি আরোপিত হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বাকী সকলের শাস্তি, চৌদ্দ বছর থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে নেমে

চার বৎসর পর্যন্ত জেল। এরপরেও দীর্ঘদিন ধরে বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণাত্মক ঘটনা প্রায় প্রতি জেলাতেই মাঝে মাঝে ঘটতে থাকে।

স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ও বিপ্লবীদের পথ সম্পুর্ণ বিপরীত হলেও, জাতীয়তাবাদ ও সংহতি যেন আত্মকলহে কখনও বিপন্ন না হয়, সেদিকে সর্বদা উভয়ের সর্বত্র ছিল সজাগ দৃষ্টি। বিপ্লবীরা নীতির দোহাই দিয়ে দূরে সরে না থেকে গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আর কংগ্রেসেরও বহু নেতা তাদের জ্বলন্ত দেশপ্রেমের প্রেরণায় বিপ্লববাদকে মুক্ত কণ্ঠে সমর্থন করে কারাবরণ করেছেন,—তার জ্বলন্ত প্রমাণ সুভাষচন্দ্র বসু ও অন্যান্য বহুনেতা। কাজেই পথ ভিন্ন হলেও দেশের মুক্তির পথে হাতে হাত ধরে চলার কখনও বিরাম ছিলনা।

তার পর এই ঐক্যের মেরুদণ্ডে ফাটল ধরাতে ব্রিটিশের প্রকাশ্য সহায়তায় নূতন করে মহম্মদালি জিন্নার নেতৃত্বে বেড়ে উঠেছে সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ। ইংরাজের সুরক্ষিত পক্ষপুটে এদের পোষণ করে সময়মত লেলিয়ে দেওয়ার শেষ পর্যন্ত পাকা বন্দোবস্ত। এছাড়া হিন্দুদের মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা চলছিল। তার উদ্যোগ আয়োজন সময়মত ধরা পড়ায়, তাকে ব্যর্থ করে দিয়েছে মহাত্মা গান্ধীর অনশন ধর্মঘট। তবুও ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখার নানা অপকৌশল। আর এতে ডানে বায়ে ছিল রাজন্যবর্গ ও মুসলিম লীগের পুর্ণ সমর্থন। কায়েমী স্বার্থের খাতিরে দেশীয় রাজন্যবর্গ ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ, জাতির জাগ্রত চেতনায় ফাটল ধরাতে ইংরেজ সরকারের হয়ে ওঠে পরম হিতৈষী বন্ধু। ঠিক এই সময় নূতন সমাজতন্ত্রবাদের প্রবল ঢেউ এসে ব্রিটিশ ভারতের মজবুত বনিয়াদ দেশীয় ঐ রাজ্যগুলির ভিতর আছড়ে ভেঙ্গে পড়েছে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিজামের রাজ্য হায়দ্রাবাদে নিরন্ন সর্ব্বহারা চাষী মজুরদের ভূমিস্বত্ব আদায়ের জন্য এক প্রবল বৈপ্লবিক উত্থান। এই উত্থিত ঝড়ে পুরাতন জীর্ণ তরীর শক্তহাতে হাল ধরার ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের সহায়তা ছাড়া নিজাম সরকারের ছিলনা।

এই সময়েই আবার অসন্তোষের মেঘ দানা বেঁধে ওঠে ইউরোপে। জার্মানীর আকাশে দেখা দেয় নূতন বিদ্যুত ঝলক। সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে ইংরেজ বণিকের হৃদপিণ্ড, পরে সারা পৃথিবীর। জার্মানী চায় প্রথমবিশ্বযুদ্ধে

অপমানিত হয়ে পরাজয় স্বীকারের প্রতিশোধ নিতে। হিটলারের নেতৃত্বে তার চোখের দুটি জ্বলন্ত তারকার একটি ইংল্যাণ্ড ও অপরটি রাশিয়ার দিকে নিবদ্ধ। চায় উভয় শত্রুকেই খতম করে দিয়ে পৃথিবীর উপর সার্বভৌমত্ব। পূর্বের কোন চুক্তিই যখন আর জার্মানীকে দাবিয়ে রাখতে পারলো না। ধূর্ত ইংরাজের তখন শুরু হয়ে গেল গোপন রণপ্রস্তুতি ও প্রকাশ্য দরবারে তোষামোদ। খ্যাপা মহাকাল প্রলয় নৃত্যে সত্যই যদি আবার মেতে ওঠে, ভারতের সাহায্য হবে তখন একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য মুসলিম লীগ ও রাজন্যবর্গের গলার চেন তাদের হাতের মুঠোয় কিন্তু এ ছাড়াও কংগ্রেসের সক্রিয় সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন আছে। সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে—ঠিক এই ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে তখন বিলাতের পার্লামেণ্টে নূতন ভারত শাসন আইন পাশ হয়। তাতে প্রাদেশিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব ছেড়ে দেওয়া হবে। মন্ত্রীদের মাথার উপরে থাকবে সর্বেসর্বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা। কংগ্রেস এ ফাঁদে পা না দিয়ে প্রথমে দূরে সরে থাকে। দাসত্বের নূতন সনদবলে এর মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে পণ্ডিত জওহরলাল এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু মুসলিম লীগ এগিয়ে এসে যে সব প্রদেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই সব প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করে। ভারতের বড় লাট লর্ড লিনলিথগো পরে কংগ্রেস নেতাদের ডেকে আশ্বাস দিলেন, যে মন্ত্রীদের রাজ্য পরিচালনায় রাজ্যের লাটবাহাদুররা কোন হস্তক্ষেপ করবেন না। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ তখন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠনে সম্মত হল এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গঠন করলো মন্ত্রীসভা। কিছুদিন পরে যৌথ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয় আসাম ও সিন্ধু-প্রদেশে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বে স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও অস্ত্রাগারের চাবি থাকবে ইংরাজ প্রভুদেরই করায়ত্ত।

কিন্তু এ দিকে জার্মানীর দিনের পর দিন ক্রমেই আগ্রাসী মনোভাব। বিগত মহাযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত তার পক্ষপুট দ্বিগুণ তেজে প্রতিদ্বন্দ্বী সবগুলি রাষ্ট্রশক্তির উর্দ্ধে তখন উড্ডীয়মান। ভার্সাই-এর অপমানকর সন্ধির শর্তাবলীকে বহু আগেই সে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে। প্রতিহিংসায় তখন সে উন্মত্ত। এরপর বিনারক্তপাতেই চেকোশ্লোভাকিয়া ও অষ্ট্রিয়া অধিকার করে নিল। তারপর

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁবেদারদের সকল যুক্তি অগ্রাহ্য করে উত্তাল রক্তের সমুদ্রে সে ঝাঁপ দিল। সাথে সাথে পৃথিবীর চতুর্দিকে বেজে ওঠলো রণ-দামামা। যুদ্ধ ঘোষিত হওয়ার মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সারা ভারতবর্ষে আরোপিত হোল ভারত রক্ষার আইন। মহাসাগর অতিক্রম করে অপর একটি মহাদেশের যুদ্ধে ধনে প্রাণে ভারতবাসী নূতন করে আবার বিপন্ন হোল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির স্থির সিদ্ধান্ত হোল—যে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদকে সুদৃঢ় করতে ভারতীয় জনগন ইংরাজের সঙ্গে আর সহযোগিতা করবে না। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হোল প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীকে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করতে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই জাতীয় কংগ্রেস ইংরাজ সরকারের কাছে এক প্রস্তাব পেশ করলেন, যে তারা যদি ভারতের শাসন কর্তৃত্ব ত্যাগকরে ভারতকে সম্পুর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে, তাহলে এই যুদ্ধে ভারত ইংল্যাণ্ডকে সাধ্যমত সাহায্য করতে প্রস্তুত। বড়লার্ট লর্ড লিনলিথগো কংগ্রেসের এই প্রস্তাব অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত প্রত্যাখ্যাণ করেন। এর পর সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পুর্ণ স্বাধীনতা আদায়ের উদ্দেশ্যে অহিংস সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে জনসাধারণকে আহ্বান জানান ও প্রদেশগুলিতে সত্যাগ্রহীদের দিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। সরকার তখন ক্ষেপে গিয়ে এর পাল্টা জবাবে চারদিকে শুরু করে দিল ধরপাকড়। কয়েক সহস্র সত্যাগ্রহী সহ গ্রেফ্তার করল জহরলাল নেহেরুকে।

এল ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ। সাথে সাথে সারা পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলি উত্তাল রণতাণ্ডবে মেতে উঠলো। জার্মানীর মিত্র শক্তি ইউরোপের ইটালী ও পূর্ব এশিয়ার জাপান। বৃটিশ আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তারাও সম্পুর্ণ প্রস্তুত। অথচ ভারতে ইংরাজের রাজত্ব। ভীত হয়ে উঠল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ও জনসাধারণ। যুদ্ধের প্রবল ঢেউ অতি শীঘ্রই ভারতের উপকূলে এসে আছড়ে পড়বে। ভারতের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে একমাত্র ইংরেজ সরকারের জন্য যুদ্ধে তাকে জড়িয়ে পড়া ছাড়া, আর কোন গত্যন্তর ছিল না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিপ্‌স মিশনের সহিত আলোচনার সর্বশেষ পর্যায়ে এসে, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ঠিক চার বৎসর পূর্বে এই প্রস্তাবের

অনুরূপ প্রস্তাব হরিপুরা কংগ্রেসে এনেছিলেন সুভাষচন্দ্র। এবারে এখন এই মহানায়কের কথায় একবার ফিরে আসি। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল ইংরাজকে ভারত থেকে তাড়াবার ঠিক এই অনুকূল উপযুক্ত সময়। আর দেশ এর জন্য এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কংগ্রেসের হাতে তখন অধিকাংশ প্রদেশগুলির পরিচালনার ভার। লর্ড লিন্‌লিথগোর সাথে তার নূতন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত। সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব তাই অধিকাংশ দক্ষিণ-পন্থীদের ভোটে অগ্রাহ্য হোল। লবণ সত্যাগ্রহ স্তিমিত হওয়ার পরে কংগ্রেসের এগিয়ে চলার গতিবেগ ছিল মন্থর।

আর ঠিক ঐ সময়তেই বারবার কারাক্লেশে রোগাক্রান্ত হয়ে সুভাষচন্দ্রের শরীর অত্যন্ত ভেঙে পড়ে। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য শর্ত্তাধীনে ডাক্তারদের পরামর্শে চলে যেতে হোল তাঁকে ভিয়েনায়। কিছুদিন পরে সেখান থেকে সুইজারল্যাণ্ডে। ইংরেজ সরকারের বিনা অনুমতিতে তাঁর পুনরায় ভারতে প্রবেশে নিষেধ ছিল। প্রবাসে দীর্ঘদিন এভাবে কাটাবার সময় তাঁর পিতা ৺জানকীনাথ পরলোক গমন করেন। এই সময় তাঁর পিতার পারলৌকিক কার্যের জন্য কয়েক সপ্তাহের জন্যমাত্র দেশে ফিরে এলেন। পিতৃ শ্রাদ্ধের পর যথাস্থানে আবার ফিরে গেলেন। আরোগ্য লাভের পর সারা ইউরোপ ভ্রমণ করে বহু মনীষীর সঙ্গে ভারতের মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে হয় তাঁর বহু আলোচনা। আলোচনা হোল ভারতের স্বাধীনতার কথা নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক মহানায়ক ডি-ভ্যালেরার সঙ্গে। অবশেষে ইংরেজ জাতির আভ্যন্তরীণ শক্তির অনেক গোপন তথ্য সংগ্রহ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াবার ঠিক এ অনুকূল উপযুক্ত সময়। আর এ কাজে ভারতের মানসিক ক্ষেত্র এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দীর্ঘদিন সেখানে এক টানা কেটে যাওয়ার পর মন তার হাঁপিয়ে উঠলো। ফেরার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিকট এর জন্য আবেদন হলো নামঞ্জুর। শেষে তাদের আদেশ অগ্রাহ্য করে ভারতের পথে যাত্রা করলেন ইটালীর এক জাহাজে। সুভাষচন্দ্রের জাহাজে ফিরে আসার খবর বোম্বাইতে জাহাজ ভেড়ার পূর্বেই হাওয়ায় হাওয়ায় সর্বত্র প্রচারিত হয়ে গেল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল জাহাজ বন্দরে ভেড়ার সাথে সাথেই হাজার হাজার মানুষ কংগ্রেস পতাকা নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত। কিন্তু অবতরণের সাথে সাথেই পুলিশ তাঁকে

গ্রেপ্তার করে সটান নিয়ে চলে গেল পুনার যারবেদা জেলে। প্রতিবাদে সারা ভারতময় সভা ও শোভাযাত্রা করে জনতার মুখে ধ্বনিত হোল "সুভাষচন্দ্রের অবিলম্বে মুক্তি চাই"। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে ভ্রুক্ষেপ করল না। জেলে সুভায়চন্দ্রের স্বাস্থ্য আবার ভেঙে পড়ায় তাঁর দাদা শরৎচন্দ্রের কার্শিয়ং-এর বাড়ীতে এনে তাঁকে রাখা হোল। কিন্তু সেখানে রোগের কিছুই আরাম হোল না। সরকার ভীত হয়ে তখন তাঁকে বিনা সর্তে মুক্তি দিল। তারপর পাঞ্জাবের ডালহৌসী পাহাড়ে কিছুদিন কাটিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। এবারে স্বাধীনভাবে আবার ইউরোপের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি খবর পেলেন যে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের হরিপুরা কংগ্রেসের তিনি নির্ব্বাচিত সভাপতি। মাত্র কয়েক দিন পরেই ইংল্যাণ্ডের বিমান তাঁকে বয়ে নিয়ে এসে স্পর্শ করলো ভারতের মাটি। করাচী বিমান বন্দরে তিনি অবতরণ করলেন। পেলেন বিপুল অভ্যর্থনা। হরিপুরা কংগ্রেস মহাসভার সভাপতির আসন থেকে তিনি প্রস্তাব আনলেন সংগ্রামের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করার সময় এখন সম্পুর্ণ ভারতের অনুকূলে। ভারতের প্রদেশে প্রদেশে তখন কংগ্রেস রাজত্ব। দক্ষিণপন্থীদের ভোটের বলে তাঁর প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য হোল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তবুও শক্ত হাতে কংগ্রেসের হাল ধরে রইলেন। অপেক্ষায় রইলেন পরবর্তী বৎসরের। এবার ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মাজীর মনোনীত প্রার্থী পট্টভী সীতারামিয়াকে ভোটে পরাজিত করে দেশের মুক্তির জন্য নিজের নীতি ও সংকল্পে অটল থেকে, আর এক বৎসরের জন্য গ্রহণ করলেন কংগ্রেসের সভাপতিত্ব। কিন্তু ওয়াকিং কমিটি গঠন করার সময় দক্ষিণপন্থীদের প্রতিক্রিয়ায় শেষ পর্যন্ত পরাভব স্বীকার করে নেতৃত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করে কংগ্রেসের আগে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়ার জন্য গঠিত হোল এক নূতন দল। নাম "ফরওয়ার্ড ব্লক"। সাথে সাথে প্রবল এক আন্দোলনের ঝড় তুলে, সত্যাগ্রহের মাধ্যমে ইংরাজ সরকারকে বাধ্য করলেন ভারতবর্ষের ওপর আরোপিত মিথ্যার কলঙ্ক ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর পশ্চিম কোণে পথের ওপর অবস্থিত হলওয়েল মনুমেণ্ট' অপসারিত করতে। তারপর কলিকাতায় মহম্মদ আলী পার্কে এক আগুন ঢালা বক্তৃতার অপরাধে, তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। জেলে

বসে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' কাগজের জন্য দীর্ঘ এক প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধের নাম "হিসাব নিকাশের দিন"। তার প্রতিটি ছত্রের ভাষা ছিল অগ্নিক্ষরা, আকাশের বিত্যুৎ ঝলকের মত। এর পর জেলে যে কোন লোকের তাঁর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দেওয়া হল। প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র অনশন শুরু করলেন। প্রথমে অনুরোধ ও পরে তাঁকে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা ব্যর্থ হল। অবশেষে নিরুপায় বোধে ইংরাজ সরকার ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হল। তখন অনশন ত্যাগ করে অ্যামবুলেন্সে এলগিন রোডের বাড়ীতে এসে উঠলেন সুভাষচন্দ্র। বাড়ীর দুয়ারে ইংরাজ সরকার দিনরাত্র পুলিশ প্রহরা মোতায়েন করল। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের হল অবসান। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে জানুয়ারী সারা ভারতের মানুষ খবরের কাগজের মাধ্যমে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে অবগত হল যে, এলগিন রোডের বাড়ীর খাঁচা শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। আর তার ভিতরের পাখী স্বাধীনতার উন্মত্ত প্রেরণায় বাইরের প্রলয় ঝড়-ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে উধাও হয়েছে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর এ্যাংলো-আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে। ২৫ শে ডিসেম্বর হংকং জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তারপর ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশের দুর্ভেদ্য নৌঘাঁটি সিঙ্গাপুরের পতন, আর ৭ই মার্চ্চ পতন হয় রেঙ্গুনের। এই ভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপগুলি একটি একটি করে জাপানের করায়ত্ত। যুদ্ধের গতিবেগ ভয়ালমূর্তিতে পূর্বদিগন্ত অতিক্রম করে ভারতের দিকে ধাবমান। ভারতের সর্বত্র তখন এ্যাংলো-আমেরিকার যুদ্ধের অসংখ্য ঘাঁটি। অথচ কিছু বেতন ভোগী পল্টন ছাড়া, সারাভারতের সঙ্গে এর কোন আন্তরিক যোগসূত্র ছিলনা। ভারত ব্রিটিশ শাসনের অধীনস্থ, তাই তার বুকের ওপর চেপে বসা এই রণসম্ভার। ভারতের আন্তরিক সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে তখন শাসন সংস্কারের এক নূতন প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেসের সাথে বোঝাপড়ার জন্য ছুটে এলেন বিলাতের স্বনামধন্য আইনজীবী স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্। তাঁর প্রস্তাবিত দানপত্রের সারমর্ম হ'ল, এদেশের রাজনৈতিক দলগুলি সহ দেশীয় রাজন্যবর্গ যে যা চায় সব দেব, কিন্তু এখন নয়—বিপদের শঙ্কা একেবারে কেটে যাওয়ার পর। সংকটের সময় বলে এখন সব কিছুই আমাদের করায়ত্ত থাকবে।

আপনারা আপনাদের দেশরক্ষার জন্য বন্ধুভাবে আমাদের সাহায্য করুন, এ সময় আমরা আপনাদের লাগাম শক্ত হাতে ধরে না থাকলে বাইরের শত্রুর আক্রমণে ও আত্মকলহে সব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু আর কি ন্যাড়া বেলতলায় যায়! প্রথম মহাযুদ্ধের শিক্ষা মজ্জাগত হয়ে আছে ভারতবাসীর। আর যুদ্ধের পর ভারত ত্যাগ করে ইংরাজ চলে গেলেও আত্মকলহে শতধা হয়ে যাওয়ার ধ্বংসাত্মক বীজাণুর ব্যাপক হারে ছিল এর ভেতরে অনুপ্রবেশ। প্রস্তাব অগ্রাহ্য হ'ল ক্রিপস্ মিশন ব্যর্থকাম হয়ে হতাশায় ফিরে গেল, মহাত্মাগান্ধী "পোষ্ট ডেটেড চেক" বলে এই বিলের ব্যাখ্যা করলেন।

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট। বোম্বাই নগরীতে বসেছে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। ঐ সভায় মহাত্মাজীর নেতৃত্বে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের। তবুও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বে মহাত্মাজী শান্তির পথে আলোচনার মাধ্যমে ভারতকে মুক্ত করা যায় কিনা—এর সর্বশেষ চেষ্টার জন্য ভারত সরকারকে পত্র দিতে কার্যকরী সমিতিতে এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। কার্যকরী সমিতি এ প্রস্তাব সমর্থন করেন। সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবারে চিঠির মাধ্যমে প্রস্তাব পেশ করা হল। কিন্তু ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পরই সারা দেশের কংগ্রেস নেতাদের গ্রেফ্তারের জন্য সরকারের তরফ থেকে চলছিল ব্যাপক প্রস্তুতি। চিঠি পৌঁছানোর অপেক্ষায় সরকার আর না থেকে, ৯ই আগষ্ট সূর্যোদয়ের পূর্বে, রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাইতে যে যেখানে ছিল, সকলকে ভারতরক্ষা আইনে গ্রেফ্তার করে মহাত্মাজী ভোর চার ঘটিকায় গীতা হাতে বাইরে এলেন। এসে দেখেন পুলিসের গাড়ী তাঁর অপেক্ষায় দণ্ডায়মান। গাড়ীর মধ্যে পুলিশ কমিশনার। তার হাতে ওয়ারেণ্ট—মহাত্মাগান্ধী, মীরা বেন ও মহাদেব দেশাইকে গ্রেফ্তার করার জন্য। একে একে তাঁরা গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেআইনী ঘোষণা করা হল কংগ্রেস সহ অন্যান্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলিকেও। জাতীয় সংবাদ পত্রের উপরও আরোপিত হল নিষেধাজ্ঞা। 'ভারত ছাড়'—দুটি মাত্র কথা; কিন্তু এর অন্তরের সারমর্ম—এক দুর্বার প্রতিজ্ঞা। হয় এবার আমরা তোমাদের ভারত ছাড়াবো, নয়ত অহিংস সংগ্রামে তোমাদের অস্ত্রের মুখে প্রাণ দেবো।

গান্ধীজী ও নেতৃবৃন্দের গ্রেফ্‌তারের খবর সারাভারতময় বাতাসের ভরে দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে জনচিত্তে স্বতঃস্ফূর্ত ধ্বনিত হয়ে উঠলো তাঁদের শপথের মর্মবাণী। "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে"—হয় দেশকে স্বাধীন করবো, নয়তো প্রাণ দেবো। বিক্ষুব্ধ গণসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে, শক্তহাতে হাল ধরতে এগিয়ে এলেন সোসালিষ্ট পার্টির জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুৎ পটবর্ধন, অরুণা আসফ আলি ও রাম মনোহর লোহিয়া। আর অপর পক্ষ তখন প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে, মারণাস্ত্র সহ লেলিয়ে দিল তাদের বিরুদ্ধে পুলিস ও সিপাহী বাহিনী। ওরা গিয়ে রক্তপিপাসু নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল অস্ত্রহীন জনতার উপর। সারাভারতের শহরে ও গ্রামে—যেখানেই যখন আন্দোলন, ইংরেজ সরকারের গোলাগুলিতে সেইখানেই প্রবল রক্তের ঢেউ। সর্বত্র সংবাদ সরবরাহের জন্য স্থাপিত হল দুটি স্বাধীন বেতার কেন্দ্র। তার একটি বোম্বাইতে আর একটি কলিকাতায়। বোম্বাই-এর সাতারায়, আসাম ও উড়িষ্যার স্থানে স্থানে, যুক্তপ্রদেশের বালিয়ায়, বিহারের ভাগলপুরে, চম্পারণে ও বাংলাদেশের মেদিনীপুরে, আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের যে অভূতপূর্ব্ব ইতিহাস রচিত হয়েছে, শ্রদ্ধায় নত মস্তকে ভারতবাসী চিরকাল তা, স্মরণ করবে। এর স্থানে স্থানে ইংরেজ শাসন বিলুপ্ত হয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হয়েছিল। কলিকাতার বুকে বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেল পার্শি বাগান, আহিরীটোলা ও বিডন ষ্ট্রীটের পোষ্ট অফিস। কলিকাতায় আগুন জ্বলতে শুরু হয় ১৪ই আগষ্ট থেকে। এরপর সরকারের নানা অফিসে ঘুরে ঘুরে বিপ্লবীরা আগুন জ্বালাতে শুরু করে। ধ্বংস করে ফেলে আবগারী দোকানগুলি। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল ট্রাম গাড়ী ও রেল ষ্টেশন গুলিতে। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে উত্তেজিত জনতার বুকের রক্তে কলিকাতার রাজপথে ঢেউ বয়ে গেল। কলিকাতার এই আন্দোলনে প্রথম শহীদ হলেন দিলীপ ঘোষ। সঙ্গে সঙ্গেই এই বিপ্লবাগ্নি বাংলার সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মেদিনীপুরে কিন্তু আকাশচুম্বী এর শিখা, পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খরা, দুর্ভিক্ষ, অনাহার—কিছুতে ভ্রূক্ষেপ না করে মেদিনীপুরের প্রতিটি মানুষ বিয়াল্লিশের এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এখানে নিরস্ত্র জনতা অকাতরে

পুলিস ও মিলিটারীর বন্দুকের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেভাবে পতঙ্গের মত প্রাণ দিয়েছে, জগতে তার দৃষ্টান্ত বিরল। একদিকে স্বাধীনতার প্রেরণায় উৎপীড়িত জনগণ—অপরদিকে তাদের রক্তপিপাসু, প্রতিহিংসায় উন্মত্ত দলে দলে সিপাহী বাহিনী। এর সর্ব্বাধিক ব্যাপকতা ছিল সারা কাঁথি ও তমলুক মহকুমা জুড়ে। জাপানের আক্রমণ ভয়ে সশঙ্কিত ইংরেজ সরকার এই দুই স্থানকেই জাপানের আক্রমণের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করে সমুদ্র পথে অতর্কিতে এসে তারা যদি কাঁথি ও তমলুক আক্রমণ করে. এই ভয়ে ওখানকার স্থানীয় ট্রাক, মোটর গাড়ী এমন কি গরুর গাড়ী সহ স্থলযানগুলি নিজেদের অধিকারে রেখে, নৌকাগুলিকে দিল নদীর অথই জলে ডুবিয়ে উক্ত ঘটনা ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের। এইভাবে তখনকার ইংরেজ সরকার মেদিনীপুরের দরিদ্র জনসাধারণের উপার্জনের রাস্তা দিল সম্পূর্ণ বন্ধ করে নিরুপায় জনসাধারণ তখন সংঘবদ্ধ হয়ে সূতাহাটা ও মহিষাদল থানায় গঠন করে দুটি স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী—বিদ্যুৎ বাহিনী নামে তারা পরিচিত। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের নিয়েও একটি শিবির গড়ে ওঠে। মেয়েদের শিবিরের নাম দেওয়া হোল "ভগিনী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী"। সরকারী কর্মচারীদের চোখের উপর দিয়ে কয়েকজন বাইরের ব্যবসায়ীর যোগসাজসে শুরু হয়ে গেল তখন জিলার বাইরে চালের চোরাচালান। টের পাওয়া মাত্র মেদিনীপুরের নেতারা চোরা পথে চালান বন্ধ করার জন্য এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে মুখর হয়ে উঠলেন নালিশ পেশ করলেন সরকারের দরবারে। কিন্তু সরকার এসব কথা কানে তুলল না। রইল বোবা সেজে। তারপর প্রতিবাদ যখন সোচ্চার হয়ে উঠল, কয়েকজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মীর উপর আরোপিত হোল কঠোর কারাদণ্ড। নিজেদের ক্ষুধার অন্ন রক্ষা করতে গিয়ে দণ্ডভোগ। তাই এর প্রতিবাদে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট প্রায় আড়াই হাজার গ্রামবাসী চালের কল থেকে চাল রপ্তানীতে বাধা দিল। সাথে সাথে নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস্র পুলিশ বাহিনী। তাঁদের বেপরোয়া গুলি চালানোর ফলে জনতার বুকের রক্তে পথঘাট উঠলো লাল হয়ে।

চারদিক হতে জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হল,—প্রতিটি থানার অধিকার বুকের রক্তের বিনিময়ে ইংরেজ সরকারের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া চাই। সকলের

মিলিত সভায় ঘোষিত হল, জমির খাজনা ও চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধের প্রতিজ্ঞাপত্র। চৌকিদার, দফাদারদের উর্দিগুলি ওখানে আগুনে ফেলে করা হল বহ্নি-উৎসব। বড় বড় গাছ উপড়ে, বন্ধ করে দেওয়া হল পুলিস বাহিনী ও সরকারী লরি ট্রাক চলাচলের রাস্তাগুলি। টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে, থামগুলিকে উপড়ে ফেলা হল। তারপর শুরু হল পুলগুলোকে ধ্বংস করার কাজ। ২৯শে সেপ্টেম্বরের এক সভায় সর্ববাদীসম্মত এক প্রস্তাব গৃহীত হলো—যত রক্তক্ষয়ই হোক—একসাথে চারদিকে অভিযান চালিয়ে, থানা ও সরকারী অফিসগুলিকে অধিকার করতেই হবে। পুলিশের গোলা-গুলি উপেক্ষা করে 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র শপথ গ্রহণে, অংশ গ্রহণ করলেন এক সাথে লক্ষাধিক তমলুক বাসী।

ঠিক হলো, চারদিকের চার সড়ক ধরে তারা শহরে প্রবেশ করবে। মারণাস্ত্র উপেক্ষা করে দখল করে নেবে শহরের সরকারী অফিস ঘর ও থানাগুলি। তাদের শীর্ষে উড়িয়ে দেবে কংগ্রেস পতাকা। কিন্তু এসব তথ্য সংগ্রহ করে, পথগুলি অবরোধ করে আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য পুলিস ও সিপাহী বাহিনী। পশ্চিমদিকের পথ ধরে এগিয়ে এলো, আট হাজার নরনারীর বিরাট এক মিছিল। পুলিস তাদের বাধা দিল। কিন্তু তারা তা মানলো না। নির্ভয়ে এগিয়ে চলল শহরের দিকে। শুরু হল তারপর তাদের উপর মুষলধারে শিলা বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ। জনতা যখন ছত্রভঙ্গ, রক্তের জোয়ারে সারা পথ তখন ভেসে গেছে। আর শেষ পর্য্যন্ত আহত অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল সেখানে রামচন্দ্র বেরা। চেতনা ফিরে আসার পর চেয়ে দেখে পথ জনশূন্য, -ছড়িয়ে আছে শুধু মানুষের রক্ত। আর তারই মধ্যে পড়ে আছে সে একা। নিজের দেহও রক্তাক্ত—গুলিবিদ্ধ। তবুও হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল একটু একটু করে থানার দিকে। থানায় পৌছে 'বন্দে মাতরম্' বলে উচ্চকণ্ঠে উঠলো চিৎকার করে—"ভাই সব আমি থানায় এসে গেছি। এরপর আর একবার 'বন্দে মাতরম্' বলে ওঠার সাথে সাথে তার কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল। আর ধ্বনি তার বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে আন্দোলিত হল ভারতের দিকদিগন্তে। দক্ষিণ দিক ধরে যারা এলো, তারাও পুলিসের বেপরোয়া গুলিতে চলার পথে ক্ষতবিক্ষত হলো। অগ্রগামী দলনেতা আহত হয়ে পড়ে

গেলে, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এগিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ তাকে তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তীজন পতাকা হাতে এগিয়ে চলে। শিলাবৃষ্টির মত বন্দুকের গুলিতে ক্ষতবিক্ষত জনতা শেষ পর্য্যন্ত ছত্রভঙ্গ হতে বাধ্য হয়। এখানেও শেষপর্য্যন্ত মৃত অবস্থায় পড়ে থাকে একজন কিশোর বালক আর একজন তরুণ যুবক। উত্তর দিক থেকেও হাজার হাজার মানুষের এক মিছিল এগিয়ে আসে তিয়াত্তর বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরার নেতৃত্বে। পথে একটুখানি এগিয়ে আসার পরই তিনি পুলিশের সম্মুখীন। তার বক্ষের জীর্ণ পঞ্জর লক্ষ্য করে এক পুলিস অফিসারের বন্দুকের নল। অরণ্যের শার্দুলের মত জ্বলন্ত তার দুটি অক্ষি-গোলক—মুখে বজ্রের হুঙ্কার—"খবরদার, এক পা আর এগিয়োনা বলছি—তাহলেই গুলি করবো"। উত্তরে মাতঙ্গিনী বললেন—"বুক পেতে দিয়েই এগিয়ে চলেছি। কিন্তু কেন? মরতে যারা আজ এগিয়ে এলো, কেন এল? ঐ ইংরেজ সরকার জাপানী জুজুর ভয়ে, আগেই এদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে, অন্যত্র চোরাপথে চালান করেছে। খেটে দুমুঠো খাওয়ার রাস্তা বন্ধ করেছে যানবাহন গুলো সব কেড়ে নিয়ে। ভাতে মরার ভয়ে ইংরেজ সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে, ঢেলে দিয়েছে সেদিন ক্ষুধার্তের দল বন্দুকের গুলিতে তাদের বুকের রক্ত। আজও না হয় তাই দেবে।

তোমরা তো ভাই দেশেরই মানুষ। এই যে পিছনে হাজার হাজার মানুষ, হয়ত তাদের ভিতরে আছে, তোমাদেরই রক্তের সম্পর্কের কেউ না কেউ আছে হয়ত তোমাদের মায়ের পেটের ভাই। ভাই সব, তাদের বুকের রক্ত আর না নিয়ে, তাদের সাথে চলে এসো। এক সাথে মিলে গিয়ে, ঐ ইংরাজ দুশমনদের তাড়াও"। এ কথার উত্তরে একটি গুলি ছুটে এসে ভেঙ্গে দিল তাঁর ডানহাতখানিকে। মাতঙ্গিনী বামহাতে পতাকা ধরে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে এগিয়ে চললেন থানার দিকে। তখন আর একটা গুলি এসে ভেঙ্গে দিল তাঁর বাম হাত। তবুও চলার তাঁর বিরাম নাই। এবার আর একটা গুলি এসে তাঁর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে দিল। 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' বলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মহিষাদল থানায় এইমত অভিযানে আহতের সংখ্যা তেতাল্লিশ, নিহত হন দশজন বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবক। বিপ্লবের জ্বলন্ত আগুনে ধ্বংস হয়ে যায় সুতাহাটা থানা সহ রেজেষ্ট্রী অফিস ও ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস

এর উপর ১৬ই অক্টোবর এলো সমুদ্রের প্রলয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস। কাঁথি ও তমলুক মহকুমাকে একসাথে ডুবিয়ে দিয়ে সে শান্ত হল। ঘরবাড়ি প্রায়ই নিশ্চিহ্ন হলো। অথৈ জলের উপর ভেসে রইল শেষপর্য্যন্ত অসংখ্য মানুষ ও পশুর মৃতদেহ। কিন্তু ইংরেজ সরকার এদিকে ফিরেও তাকালো না। বিপ্লবীরা তখন অনন্যোপায় হয়ে বিপন্নদেব উদ্ধার ও সেবার কাজে এগিয়ে এলো। তখন তমলুক ও কাঁথির প্রতিটি থানায় প্রতিষ্ঠিত হল জাতীয় সরকার, পূর্বোক্ত বিদ্যুৎ বাহিনীই হল জাতীয় বাহিনী। জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করে পর পর তাতে নেতার আসন গ্রহণ করলেন সতীশ সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র সাহু, বরোদা কুইতি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ।

তারপর তমলুক ও কাঁথি মহকুমার গ্রামগুলির ঘরে ঘরে অনধিকার প্রবেশ করে, শুরু হয় সিপাহিবাহিনীর পৈশাচিক তাণ্ডব। পুরুষদের ধরে ধরে বেপরোয়া লাঠির প্রহার ও মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার। দল বেঁধে বাধা দিতে এলে, সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালনা। মেয়ে ও শিশুদের আর্তচিৎকারে মেদিনীপুরের মেদিনী তখন থর থর করে কেঁপে উঠলো। এই ভাবে গুলি চালিয়ে মহিষাদল, নন্দীগ্রাম ও তমলুকে সিপাহীরা চুয়াল্লিশ জনকে হত্যা করে। আর গুরুতররূপে আহত হন নিরানব্বই জন। আগুন জ্বালিয়ে দেয় পর পর একশ চব্বিশটি বাসগৃহে। পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয় এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা।

কাঁথি মহকুমায় সিপাহীদের নিষ্ঠুর কার্যকলাপে বাধা দিতে গিয়ে তাদের বন্দুকের গুলিতে নিহত হন তিরিশ জন। গুরুতররূপে আহতের সংখ্যা একশ পঁচাত্তর। ধর্ষিতা হন দু'শ আঠাশ জন নারী। আর আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় নয়শপঁয়ষট্টিটি বাসগৃহ। দুই সহস্রের উপর গৃহের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। এত অত্যাচার করার পরেও গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সরকার পাইকারী জরিমানা আদায় করে তিরিশ হাজার টাকা।

* * * *

মেদিনীপুরের হাটে, মাঠে, বাটে বুক ফাটা হাহাকার,
হানা দিয়ে ঘরে, মেয়েদের 'পরে পশুর অত্যাচার।
বিপ্লব ঘোরে গ্রামে ও শহরে রক্তের ছড়াছড়ি,
পুরুষ ও নারী পশ্চাৎ পথে কেহ রহিল না পড়ি।
ভয় নাহি পায়, গুলি লেগে গায় কেহ যদি ঢলে পড়ে,
পশ্চাৎ হতে বিশাল বাহিনী তারে আসি ঘিরে ধরে।
কাঁথি তমলুকে প্রতিদিন চলে এইমত সংগ্রাম,
"জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য" মেতে ওঠে সারা গ্রাম।
মাতঙ্গিনীর কীর্তি কাহিনী মুছিবেনা কোন কালে,
উদ্বেল মহামরণের কোলে ঝাঁপ দিল অবহেলে।
বুলেটের ঘায়ে, হাত ভেঙ্গে যায়, পতাকা আকড়ি বলে,
ঢলে পড়ে শেষে শেষ-নিশ্বাসে 'জয় গান্ধীজীর' বলে।
ফেরুপাল শেষে, ভয় সন্ত্রাসে পালায়েছে দলে দলে,
তমলুক-বাসী শাসন ক্ষমতা ছিনায়ে নিয়েছে বলে।

বাংলার সব জেলাগুলিতেই বিয়াল্লিশের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। তমলুকের পর, এর ব্যাপকতা ও আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি, সর্বাধিক ছিল দিনাজপুরের বালুরঘাটে। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র শপথ বাক্য উচ্চারণে সংঘবদ্ধ জনতা প্রতিদিন ওখানে বিপ্লবের আগুনে ঝাঁপ দেয়। আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে ওখানকার ট্রেজারী, আদালত ও রেজেষ্ট্রী অফিস। ধ্বংস স্তূপের উপর উড়িয়ে দেয় পরে জাতীয় পতাকা। বাইরের থেকে সিপাহী শেষে ওখানে এসে ষাট থেকে সত্তর বারের মত জনতার উপর গুলী চালায়। রক্তে কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে বালুরঘাটের ধুলা-মাটী। এরপর চলে বেপরোয়া লুঠতরাজ। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হতে জোর করে পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয় ৭৫ হাজার টাকা।

একই সময় আসাম, বিহার ও উড়িষ্যাতেও সংগ্রাম উদ্দাম গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। বিয়াল্লিশের সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলার মাতাঙ্গনী হাজরার মত চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন আসামের কনকলতা।

গোয়ালপাড়ার একটি ছাত্রমিছিলের উপর সর্বপ্রথম পুলিস বেপরোয়া গুলী চালায়। তার ফলে গুরুতররূপে আহত হয় নয়জন ছাত্র। এর প্রতিবাদের উত্তরে, জোরহাট জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিসের একদিন বেপরোয়া লাঠি চলে। তাতে আহত হয় এক সাথে একশ জন বন্দী। বাইরে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে জনতা সংঘবদ্ধ ভাবে দরং জিলার গোপুর, বেহালি ও ঢেকিয়া থানা আক্রমণ করে। অবিশ্রান্ত পুলিসের গুলী তাদের উপর বর্ষিত হয়। কিন্তু উত্তেজিত জনতা একটুও তাতে ভীত হয় না। পথে দলে দলে মৃত্যু বরণ করেও শেষপর্য্যন্ত থানা দখল করে। তারপর ২০শে সেপ্টেম্বর করে গোপুর থানা আক্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে বালক, বৃদ্ধ, মহিলাদের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় "কুইট্ ইণ্ডিয়া", "ইংরাজ, ভারত ছাড়"। এই মিছিলেরই পরিচালিকা এক তরুণী—নাম কনকলতা। সকলের পুরোভাগে এই বীরাঙ্গনা নারী। তার দিকে রাইফেলের তাক্ করে চিৎকার করে বলে উঠলো সম্মুখের এক সিপাহী,—"খবরদার, এক পা আর এগোলেই গুলি করবো"। ভ্রুক্ষেপ না করে সম্মুখে এগিয়ে চললেন কনকলতা। তন্মুহুর্তেই বিপক্ষের একগুলি এসে তাঁর বক্ষস্থল বিদীর্ণ করে। 'বন্দে মাতরম্' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন কনকলতা। তাঁর হাতের পতাকা তুলে নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে চলেন তখন মুকুন্দ কাউটি। গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে মুহূর্তে তাঁরও প্রাণহীন দেহ। একের পর এক পতাকা তুলে নিয়ে মিছিল থানার দিকে এগিয়ে যায়। বেপরোয়া গুলি চালনার আর শেষ পর্য্যন্ত সাধ্য হল না মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করার। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে তারা থানা দখল করে। এরপর ২০ হাজার নরনারীর এক মিছিল দখল করে নিল ঢেকিয়াজুলি নামে আর একটি থানা। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত সিপাহী বাহিনী তখন পাইকারী ভাবে এর প্রতিশোধ নিতে গ্রামে গ্রামে চড়াও হয়ে ঘর জ্বালাতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে চলে নারীধর্ষণ। পথের উপর বালক বৃদ্ধ বিচার না করে যাকে যেখানে পেলো তার উপরেই চালালো নির্দয় লাঠির প্রহার। আর তাদের নারকীয় কার্যকলাপের প্রতিবাদ করলে তৎক্ষণাৎ তার উপর বন্দুকের গুলি।

—উড়িষ্যার কোরাপুট জেলখানা বিপ্লবীদের রক্তে লাল হয়ে ওঠে। পাটনা শহরের পরিষদ ভবনে জাতীয় পতাকা তুলতে গিয়ে নয়জন বিপ্লবী

পুলিসের গুলিতে এক সাথে প্রাণ দেয়। বিহারের বিভিন্ন জেলায় প্রায় একই সময় তারপর বিপ্লবের আগুন জ্বলে ওঠে। স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় সরকার। ধেয়ে আসে চারদিক থেকে শেষে মিলিটারী। বিপ্লবীদের রক্তে তখন বিহারের মাটিও ওঠে লাল হয়ে। অনেককে ধরে বিচারের শেষে ফাঁসির দড়িতে ঝুলানো হয়।

বিয়াল্লিশের সংগ্রামে শ্রদ্ধায় স্মরণ করি, মহারাষ্ট্রের বীর শিবাজীর পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত বিপ্লবের পীঠস্থান সাতারার অধিবাসীদের। সেখানেও তমলুকের বিদ্যুৎ বাহিনীর মত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য গঠিত হয়েছিল তুফান সেনা। সেখানেও বিপ্লবীরা মৃত্যুর পরোয়া না করে, বার বার ধ্বংসাত্মক আক্রমণের মাধ্যমে বৃটিশ শাসন যন্ত্রকে সম্পূর্ণ অচল করে রেখেছিল। নানা পাতিলের নেতৃত্বে ১৯৪২ থেকে ৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দীর্ঘ দিন একটানা চলেছিল সংগ্রাম। পরে যুদ্ধ পরিস্থিতি ইংরাজের অনুকূল হওয়ায়, সেখানেও শুরু হয় ব্যাপক ভাবে জনতার উপর পাশবিক উপায়ে প্রতিহিংসা গ্রহণ।

এর পরে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ জাপানের করায়ত্ত হওয়ার পর ওখানকার ভারতীয়রা পায়ে হেঁটে বিপদসঙ্কুল পার্বত্যপথ অতিক্রম করে দলে দলে আসাম ও বাংলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ঠিক তার দুদিন পর কলিকাতায় প্রথম জাপানীদের বোমা বর্ষণ। আবার তখন কলিকাতার ভীতত্রস্ত জনস্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে চলে অন্যত্র আশ্রয়ের উদ্দেশে। শিয়ালদহ ও হাওড়া ষ্টেশনের গাড়ীতে আর যখন স্থান সঙ্কুলান হয় না, পায়ে হেঁটে তখন নদীর ঢেউয়ের মত এগিয়ে চলে উত্তর-দক্ষিণ পুর্ব-পশ্চিমে যে দিকে যার গ্রাম। আর ইংরাজ সরকার তখন জাপানীদের হাতে রসদ পড়ার ভয়ে সারা বাংলাদেশের শস্যবাহী নৌকাগুলির ঘটায় সলিল সমাধি। বাংলার লাটবাহাদুর জন হার্বার্টের চক্রান্তে তখন, চার কোটী টাকা মূল্যের খাদ্য-শস্য চোরা-সুরঙ্গ পথে আত্মগোপন করে কালা-বাজারের অন্ধকারে। সাধারণ কোটি কোটি মানুষ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের মত অনাহারে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। ইংরাজের রাজনীতির অপকৌশলে সৃষ্টি হয়ে বিকট করাল দংষ্ট্রে আবার আবির্ভূত হল বাংলায় এসে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী। সারা বাংলাদেশ জুড়ে বিকট হা করে তার তখন রক্তলোলুপ রসনার বিস্তার। প্রতিটি শহরে ও গ্রামের দোরে দোরে ভাত

চাই না, ফেলে দেওয়া ফ্যানটুকু দিয়ে আমাদের বাঁচাও'—এই বলে কোথাও বা বিকট আর্তনাদ, কোথাও বা করুণ মিনতি। মাত্র এর কয়েকদিন পরে পথে ঘাটে প্রতিদিন দেখা গেল কঙ্কালসার শত শত মানুষের মৃত দেহ। তাদের কোন কোনটা বা শিয়াল শকুনের ভুক্তাবশেষ। শহরে ও গ্রামে গ্রামে বোর্ডের মাধ্যমে গঠিত হল ফুড কমিটি। তাদের সহায়তায় গড়ে উঠলো লঙ্গরখানা। আর এই মরশুমে সেবার নামে শহরে ও গ্রামে গ্রামে আধমরাদের উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে ভিক্ষায় পাওয়া রসদের অর্ধেক লুটে খেলো ঐ সব ফুড কমিটির কর্তারা।

* * * *

পঞ্চাশের মন্বন্তরে, গেল ভাইরে এদেশ ভেসে—
পড়ে ঘাটে পথে বাসী মড়া, কাক শকুনে খেলো হেসে।
আধ পেটা ভাত পেটে দিয়ে, যারা বাঁচলো কালের কামড় সয়ে,
তাদের ঘাড় ভাঙ্গিল দেশের কালো বাজারী
তারা কেউ বাঁচলো না আর এদেশে।

পাটের চট আর তুলার কম্বল
দুখীজনের শীতের সম্বল—
তাও ফুড কমিটির মেম্বারগণে মিলে
দশগুণেতে বেচলো শেষে।

ঐ ঘাতকেরা তখন থেকেই শিখে নিয়েছে টাকার লোভে মানুষ মারার নূতন এই কৌশল। শিখে নিয়েছে চোরা কারবারের চোরা প্যাঁচে চির দরিদ্র মানুষ গুলিকে সর্বস্বান্ত করে, নয়তো বা একেবারে মেরে ফেলে টাকার পাহাড় কিভাবে গড়ে তুলতে হয়। মহামারীর জীবাণুর মত জাতীয় প্রগতির মেরুপথে এদের নিরাপদ অবস্থিতি। সমূলে এই চোরা কারবার উচ্ছেদ না হলে, উৎপাদন ও সম্পদ যতই বাড়ুক, দেশের সর্বস্তরের মানুষের দারিদ্র্য দূর করা কোন উপায়েই সম্ভব নয়।

দশ

'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'র শপথ বাক্য উচ্চারণে ভারতে আবার বিপ্লব সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সংগ্রামকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানিয়ে বেতারে প্রায়ই ভেসে আসতো মহাসমুদ্রের অপর প্রান্তের এক জোরালো কণ্ঠস্বর। কিন্তু কে এ! কার কণ্ঠস্বর—

কার কণ্ঠস্বর সাগর-তরঙ্গ দোল অতিক্রম করি
রাত্রিদিন ভারতের কানে ভেসে আসে।
কার অশ্বক্ষুরে পর্বতের ধূলি ওড়ে
প্রতিদিন আকাশে বাতাসে।
কার কণ্ঠে বেজে ওঠে ঘন ঘন রণতূর্যধ্বনি।
মুক্তির সংগ্রামে ঢালি বুকের রুধির
ঐ ছুটে আসে কার বিশাল বাহিনী
কালের পঞ্জর টুটি।
দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করি—
কার ভেরী বেজে ওঠে নিনাদ করালে।

"কদম্ কদম্ বাঢ়ায়ে জা
খুসীকে গীত্ গায়ে যা,
যহ জিন্দ্গী হৈ কৌম্ কী—
তো কৌম্ পর লুটায়ে জা।

"চলো দিল্লী" পুকারকে
ফৌজী-নিশান সমহল্কে
লাল কিল্লে পর গাড়কে
লহ্রায়ে জা লহ্রায়ে জা।"

পূর্বে একথা বলা হয়েছে—সুভাষচন্দ্র আর স্বগৃহে অন্তরীণ নেই। পিঞ্জর দ্বার অবরুদ্ধ, অথচ পাখী ফাঁকি দিয়ে অন্যত্র উধাও। ব্রিটিশ গোয়েন্দার ধরা ছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে। এমন কি কাবুলের বিপদ সীমার শেষ রেখাটুকুও অতিক্রান্ত। উপস্থিত হয়েছেন এসে ইটালীর সীমানার দ্বারপ্রান্তে। ঐখানেই অপেক্ষায় থেকে ইটালীর রাষ্ট্রদূতের নিকট নিজ পরিচয় ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। সংগ্রহ করলেন রাশিয়া ও জার্মানীতে অবাধ বিচরণের ছাড়পত্র। মস্কো হয়ে উপস্থিত হলেন বার্লিনে। বহু সাধ্য সাধনার পর সাক্ষাৎ মিলল সেখানে হিটলারের। দুজনেই ইংরাজের ঘোর শত্রু। তাই সুরে সুর মিলে গিয়ে ঐকতানে বেজে উঠলো অন্তরের ভেরির গুরু গম্ভীর নিনাদ। জার্মানীর সাহচর্যে অক্ষ শক্তির স্বীকৃতিতে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে তখন প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে গড়ে উঠলো ইউরোপে এক নূতন বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান, নাম আজাদ্ হিন্দ্ সংঘ। জার্মানী ও ইটালীর যুদ্ধবন্দী ভারতীয় ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানের প্রবাসী ভারতীয়দের নিয়ে, জয় হিন্দ্ মন্ত্র উচ্চারণে, ঐ আজাদ্ হিন্দ্ সংঘের প্রথম সভা বসে ১৯৪১ সালের ২রা নভেম্বর। সভার নির্বাচিত নেতা সুভাষচন্দ্র।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে এ সময় দিনের পর দিন ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির সামরিক পরাজয়। সিঙ্গাপুরের পতন, জাপানের হাতে হাজার হাজার ভারতীয় সৈন্যদের তুলে দিল।

জাপানের সান্নিধ্যে থেকে ২০ বছর পূর্বের বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু জাপান সরকারের তখন হিতৈষী বন্ধু। ভারতের মুক্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় এই সুযোগকে আর তিনি হাত ছাড়া হতে দিলেন না। তাঁর যুক্তি ও বুদ্ধির প্রভাবে ভারতীয় ঐ জোয়ানরা স্বাধীনতার জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সম্মত হল। তখন জাপান সরকারের অনুমতি লাভ করে তিনি প্রায় লক্ষাধিক ভারতীয় বন্দী ও তাদের রণসম্ভার নিজের আয়ত্তে আনলেন।

এই বিপুল বাহিনীর পরিচালনার ভার অর্পণ করলেন মোহন সিং এর উপর, রাসবিহারী রইলেন তার পুরোভাগে, তিনি তখন বৃদ্ধ। কিন্তু প্রমাণ হল যে মোহন সিং এ দায়িত্ব ভার বহনের উপযুক্ত নহেন, তখন জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এই গুরুভার অর্পণের জন্য ডাক দিয়ে অপেক্ষায় রইলেন সুভাষচন্দ্রের। এই ডাকে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিয়ে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের

৮ই ফেব্রুয়ারী মুক্তিপাগল সুভাষচন্দ্র বিপদসঙ্কুল অথৈ সমুদ্র সাবমেরিনে পাড়ি দিয়ে, উপস্থিত হলেন সুমাত্রায়। ১৩ই জুন ওখান থেকে বিমানযোগে এলেন টোকিওতে। ভারতের মুক্তি সাধনায় আজীবন উৎসর্গিত দুই মহাপ্রাণ ও মহানায়কের হল মহামিলন। উপস্থিত ভারতীয়দের মিলিতকণ্ঠের জয় হিন্দ্ ধ্বনিতে তখন মুখরিত হয়ে উঠলো ওখানকার আকাশ বাতাস।

এর পর ২রা জুলাই সুভাষচন্দ্র ও রাসবিহারী এসে উপস্থিত হলেন সিঙ্গাপুরে। স্থানীয় ক্যাথে বিল্ডিং হলে হলো বিরাট সভার আয়োজন। অত্যুৎসাহে সে সভায় এসে যোগ দিয়েছেন মালয়বাসী ভারতীয়েরা—আর দলে দলে ইংরাজ পরিত্যক্ত ঐ অঞ্চলের সৈন্য বাহিনী। ৪ঠা জুলাই রাসবিহারী সুভাষচন্দ্রের হাতে তুলে দিলেন আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজের সমগ্র দায়িত্ব। ৩০ লক্ষ প্রবাসী ভারতীয়দের মিলিত কণ্ঠে আবার বার বার ধ্বনিত হতে লাগল 'জয় হিন্দ্! নেতাজী কি জয়।' সভায় দাঁড়িয়ে নেতাজী ঘোষণা করলেন, স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করার সংকল্প। ঘোষণা করলেন—"ছায়ার মত সর্বদা আপদে বিপদে আমি তোমাদের সাথী।" পর দিন গ্রহণ করলেন সৈনিকদের অভিবাদন। বললেন,—"চলুক, এখন থেকে তোমাদের দিল্লীর পথে এগিয়ে চলার আয়োজন।" ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল আজাদ্ হিন্দ্ সরকার। সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। স্বীকৃতি পেলো ইটালী, জার্মানী, বার্মা, থাইল্যাণ্ড, চীন, ফিলিপাইন ও মাঞ্চুরিয়ার। সর্বোপরি পরামর্শ দাতা রাসবিহারী বসু। আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা এ. এন. সরকার। অন্যান্য বিষয়ের পরামর্শদাতারা হলেন দেবনাথ দাস, করিম গনি, ডি এন. খান, এ. ইয়ালাপ্পা এবং সর্দার ঈশ্বর সিং।

বিভাগীয় মন্ত্রী মণ্ডলী ঃ মিস্ লক্ষ্মী স্বামীনাথন—নারী বাহিনীর অধিনেত্রী, এস. এ. আয়েঙ্গার—প্রচার মন্ত্রী, কর্ণেল এ সি. চ্যাটার্জ্জী—অর্থমন্ত্রী। আর সেনা বাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন কর্ণেল সা নওয়াজ। সভা মঞ্চে উঠে নেতাজী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—আমি আমার মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। ভারতের প্রতিটি মানুষের কল্যাণ সাধন হোক আমার ও আপনাদের সকলের জীবনের বৃহত্তম ধর্ম। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের মনে নেতাজীর অগ্নিক্ষরা

বাণী এনে দিল নূতন বিশ্বাস, নূতন চেতনা, নূতন উন্মাদনা, মরণকে তুচ্ছ করে অভিযানের দৃঢ় সংকল্প। সেখানে ছিল না জাতের নামে বজ্জাতি, সাম্প্রদায়িকতার বিষোদগার। ছিলনা কোন মন্ত্রগুপ্তি অথবা গোপন চুক্তি। প্রতিজ্ঞা ছিল শক্তি প্রয়োগে শত্রুর হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে দেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করার। কিন্তু একাজে বিপুল অর্থ ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রয়োজন। তারও অভাব হল না। নেতাজীর প্রাণের ডাকে সাড়া দিয়ে ভারতীয়রা যে যেখানে ছিল তাদের সঞ্চিত অর্থে পূর্ণ করে দিল নেতাজীর অর্থ ভাণ্ডার। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর আজাদ্-হিন্দ্ সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে করল যুদ্ধ ঘোষণা। 'নেতাজী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আবার মুখরিত হয়ে উঠলো মালয় সমুদ্রের কূল উপকূল। সর্বাধিনায়কের বেশে নেতাজী এসে দাঁড়ালেন সেই বিশাল জনতার সম্মুখে। বিউগ্‌ল বেজে উঠল। সৈন্যেরা সাথে সাথে উঁচিয়ে ধরল হাতের বন্দুক। তখন আর একবার উদাত্ত কণ্ঠে সংকল্প বাক্য পাঠ করার পর আবেগ ভরা কণ্ঠে নেতাজী বলে উঠলেন— ভাইসব, আমাদের মুক্তির পথ দিল্লীর পথ—এবার ঐ পথে এগিয়ে যেতে হবে।' সাথে সাথে বিউগ্‌ল বেজে উঠলো—"কদম্ কদম্ বাঢ়ায়ে জা।"

টোকিয়োতে বসেছে এই সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্মেলন। যোগ দিতে সিঙ্গাপুর থেকে নেতাজী টোকিওতে উপস্থিত হলেন। বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ জাপানের প্রধান মন্ত্রী তোজো নেতাজীকে দান করলেন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। পরে প্রতিষ্ঠিত হল সেখানে আজাদ্-হিন্দ্ সরকার। শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন জেনারেল লোকনাথন। পরবর্তীকালে কর্ণেল চ্যাটার্জ্জী নিযুক্ত হয়েছিলেন শত্রু মুক্ত ভারত ভূখণ্ডের প্রধান শাসনকর্তা। নেতাজী আন্দামানে গেলেন ডিসেম্বর মাসে। আন্দামানবাসীরা নেতাজীকে সর্বান্তঃকরণে জানালেন বিপুল অভ্যর্থনা। তারপর আন্দামান থেকে ব্যাঙ্কক হয়ে রেঙ্গুনের মাটিতে যখন পদার্পণ করলেন কালচক্র তখন ঘুরে এসে ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে পদার্পণ করেছে।

রেঙ্গুনেই হলো তখন আজাদ্-হিন্দ্ সরকার ও ফৌজের হেড কোয়ার্টার। আর ঐ খানেই গড়ে উঠলো সেনাবাহিনীর সর্বপ্রধান ঘাঁটি। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বার্মার আরাকান পার্বত্য পথ ধরে ভারতের দিকে ঐ দিন

হতেই শুরু হলো ঐতিহাসিক অভিযান। আর সামরিক বাহিনীগুলি নেতাজীর হুকুমের অপেক্ষায় একে একে সারিবদ্ধ হয়ে দণ্ডায়মান।

কর্ণেল সা নওয়াজের নেতৃত্বে ছয়হাজার দুই শত জন সৈন্য নিয়ে গঠিত 'সুভাষ বিগ্রেড'। কর্ণেল ইয়ানাৎ কয়ানীর নেতৃত্বে দুই হাজার আটশ জন সৈন্য নিয়ে 'গান্ধী ব্রিগেড'। ধীলনের নেতৃত্বে তিন হাজার সিপাহী নিয়ে 'নেহেরু-ব্রিগেড'। বিশাল এই সিপাহী বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নেতাজী উচ্চারণ করলেন "জয় হিন্দ।" অগণিত সৈনিকের মুখে তার প্রতিধ্বনি বার বার কাঁপিয়ে তুললো পার্বত্য অঞ্চলের আকাশ বাতাস। যাত্রার পূর্বে নেতাজী সৈনিকদের সম্মুখে ঘোষণা করলেন—ভাই সব, তোমরা ঢেলে দেবে বুকের রক্ত। বিনিময়ে আমি এনে দেবো দেশের স্বাধীনতা। কান পেতে শোন, ঐ সমুদ্রোত্থিত প্রবল তরঙ্গোচ্ছাসে ভেসে আসে মায়ের কাতর ডাক। ভেসে আসে পরাধীন ভারতের নিরন্ন জনতার আর্ত চিৎকার। ডাকছে রাজধানী দিল্লী। আমরা ঐ রাজধানী দিল্লী দখল করবো। নিজেদের হাতে খুলে দেবো বন্দিনী মায়ের শিকল। আর যদি তা না পারি—তাহলে করবো শহীদের মৃত্যু বরণ। এবারে সম্মুখে এগিয়ে চল। কদম্ কদম্ বাঢ়ায়ে জা।

* * * *

জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্,
গাহি হিন্দের জয়গান।
ছোটে উত্তাল তালে রণতরঙ্গ
ওঠে অম্বরে কলতান।
কে বলে তোমারে দুর্বল
তুমি কে বলে শক্তি হীন॥
তব দুর্গম পথে দুর্বার বাধা
ধূলি-সম হবে লীন।
যে জীবন তব জনম ভূমির
তুমি তারে তাহা করো দান।
গাহি মহামানবের মহাভারতের
মুক্তির জয়গান।

তুমি ভারতের শের, আগে ছুটে চলো
তুমি মহা বলবান।
লাল কেল্লার শিরে উড়াও তোমার
জাতির জয় নিশান।
মহাবীর ছুটে দিল্লীর পথে চলো—
ঐ আসমান হতে তোমারে আশিস
জানাইছে ভগবান।

নেতাজীর নেতৃত্বে, আজাদ্-হিন্দ বাহিনীর ভারতের উদ্দেশ্যে পার্বত্য পথে অভিযান, এ ঘটনাকে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর চোখকে ধোঁকা দিয়ে অন্ধকারের কালিমায় বেমালুম ঢেকে রাখলো। প্রকৃত ঘটনাকে অতি বিকৃত কুৎসিত ভাবে চিত্রিত করে ও সুভাষচন্দ্রের চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে, ভারতের কিছু সংখ্যক লোককে বিভ্রান্ত করতেও কিছুটা সক্ষম হল। নেতাজী ভারতবাসীর মন থেকে এই ভ্রান্তি অপসারণের জন্য ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মার্চ মহাত্মা গান্ধী ও দেশবাসীর উদ্দেশে নিবেদন করেন ঐতিহাসিক এক বেতার ভাষণ। নিম্নে সংক্ষেপে তার সারমর্ম।

—শ্রদ্ধেয় মহাত্মাজী, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আপনার অহিংস সংগ্রামকে প্রতিটি ভারতীয় সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছে। আপনার অহিংস সংগ্রামের আমিও ছিলাম একজন প্রধান সৈনিক। কিন্তু কেবলমাত্র অহিংসার পথে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করে, ঐ ধূর্ত বিদেশী বণিকদের বিতাড়িত করা, আমার মনে হয় কিছুতেই সম্ভব হবেনা। আর আমার মত এ বিশ্বাস দেশ এবং বিদেশের অগণিত ভারতবাসীর। তাই লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর বাইরের পার্বত্য পথ ধরে বুকের রক্তের বিনিময়ে এই আক্রমণ ও অভিযান। আমাদের উদ্দেশ্য দেশকে স্বাধীন করা—তা যে পথেই আসবে, দেশের মানুষ সে পথকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করবে। দেশের সর্বত্র আমার বিরুদ্ধে ঐ শ্বেতাঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্য প্রণোদিত সব মিথ্যা কথাগুলি আমার কানে এসে পৌছায়। আপনার এবং দেশবাসীর অবগতির জন্য মুক্ত কণ্ঠে আমি ঘোষণা করছি,—দেশের মুক্তির পর আজাদ সরকার ও তার সৈন্য বাহিনীর পৃথক আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। স্বাধীন ভারতে মানুষের স্বাধীন মতামত তখন নির্বাচন করবে

ভারতের নূতন সরকার। দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও আপনার আশীর্বাদপ্রার্থী সুভাষচন্দ্র বসু।

বর্ষার অরণ্য পাহাড় অতিক্রম করে দিনের পর দিন, ভারতের দিকে এগিয়ে এলো আজাদ-হিন্দ বাহিনী। রাত্রিতে একটু বিশ্রামের অবকাশ। সূর্যোদয়ের সাথে সাথে দুর্গম পার্বত্য পথে আবার পথ চলার শুরু। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মার্চ একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। আজাদ-হিন্দ বাহিনী ঐ দিন ইংরাজ সৈন্যদের পরাজিত করে সম্মুখে এগিয়ে এসে প্রথম স্পর্শ করলো ভারতের মাটি। কোহিমার মাটিতে প্রোথিত হল আজাদ-হিন্দ সরকারের বিজয় নিশান। তারপর তারা ইম্‌ফলের দিকে বিজয় গর্বে এগিয়ে চলেছে।

* * * *

গাহি হিন্দের জয় উড়াল নিশান কোহিমা ও মণিপুর।
তাহা সারা দুনিয়ায় ধ্বনিয়া উঠিল—
শুধু রুদ্ধ ভারত কানে শুনিলনা তার বিচিত্র সুর।

এরপর আজাদ-হিন্দ বাহিনী যখন প্যালেলের বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ চালায়, লণ্ডন থেকে সত্রাসে তখন মিঃ চার্চিলের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার হাই কম্যাণ্ডকে কড়া নির্দেশ, "যেমন করে পার এদের এগিয়ে আসা বন্ধ কর। আরও বিমান, ট্যাঙ্ক ও মেসিনগান নিয়ে এদেরে বিধ্বস্ত কর। নিষ্প্রদীপ অন্ধকারের অন্তরালে এমন বিভ্রান্তির ইন্দ্রজাল রচনা কর, যে ভারতীয়রা কোন প্রকারেই যেন সন্দেহ না করে, যে ওরা ভারতীয় সৈন্য।

তার পর বৃটিশ বিমান থেকে অবিশ্রান্ত তাদের তাঁবুতে বোমা বর্ষণ, যার নীচে ট্যাঙ্কের সাথে আজাদ হিন্দ বাহিনীর একমাত্র রাইফেল হাতে সম্মুখ যুদ্ধ। প্রাকৃতিক নিয়মে জোর কদমে ধেয়ে এল তখন বর্ষার জল প্লাবন। বিপদ সঙ্কুল হয়ে উঠলো রসদ চলাচলের সংকীর্ণ পথ। বর্ষার জল আর সৈনিকদের বুকের রক্তে, পাহাড়ের পথ দিনের পর দিন হয়ে উঠলো পিচ্ছিল কর্দমাক্ত তাই দুর্গম। রসদের অভাবে খাওয়ার বরাদ্দ হল প্রতিটি সৈনিকের দুবেলা দুখানা করে রুটি। তবুও স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায়, কামান ও ট্যাঙ্কের মুখে উন্মত্ত রণতাণ্ডবে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সম্মুখে চলার পথ শেষে হল সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। প্রান্তরের পথে পথে প্রত্যহ

পড়ে থাকে শত শত সৈনিকের মৃতদেহ। অবস্থার গুরুতর এই পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত তাদের আবার বার্মার পথে ফিরে আসার হুকুম দেওয়া হল।

শুরু হল এ সময় জাপানের ভাগ্যবিপর্যয়। তাদের হাত থেকে ব্রিটিশ সৈন্য ছিনিয়ে নিল মান্দালয়। তার পর ব্রিটিশ বাহিনীর রেঙ্গুনের দিকে অগ্রগতি। তাতে বাধা দেওয়া আর জাপানের পক্ষে সম্ভব হল না। এই রূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল জাপানীদের চলল রেঙ্গুন ত্যাগের উদ্যোগ আয়োজন। নেতাজী তখন রেঙ্গুনের হেড কোয়ার্টারে। ছুটে এলেন তার কাছে জাপানের এক সেনানায়ক। অনুরোধ জানালেন নেতাজীকে তাদের সঙ্গে রেঙ্গুন ত্যাগ করতে। নেতাজীর প্রাণ রক্ষার জন্য সকলের অন্তরে তখন গুরুতর দুর্ভাবনা। ছুটে এলেন তাঁর কাছে ক্যাপটেন ভোঁসলে, কিরাণী ও আয়েঙ্গার। বিনীত ভাবে জানালেন—'নেতাজী, মুহূর্তমাত্র আর আপনার এখানে থাকা চলবে না। আমরা ওদের হাতে যুদ্ধবন্দী হব, কিন্তু আপনাকে পেলে ওরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।'

কিন্তু নেতাজী তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় বীর সৈনিকদের বিপদের মুখে রেখে কোথাও যেতে অসম্মত। সবচেয়ে দুর্ভাবনা তাঁর ঝাঁসীর রাণী বাহিনী ও সেবিকা মেয়েদের কথা মনে করে। শত্রুর হাতে পড়লে, এদের চরম লাঞ্ছনার এক নারকীয় চিত্র তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তবু সকলের অনুরোধে শেষ পর্য্যন্ত রেঙ্গুন ত্যাগের ব্যবস্থা তিনি মেনে নিলেন। কিন্তু তার পূর্বে স্থানীয় মহিলা কর্মীদের সৈনিকদের সতর্ক প্রহরায় তাদের আত্মীয়দের কাছে পৌঁছে দেওয়া হল। কোন মহিলাকেই তিনি বিপদের মুখে রেখে যাবেন না। যারা দূরের, তাদের সকলেরই শেষে তাঁর সাথে হাওয়াই জাহাজে সিঙ্গাপুর পাড়ি দেওয়ার হলো পাকা বন্দোবস্ত।

বিগত ইতিহাসের সে দিনটি ছিল ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। শুক্ল পক্ষের চাঁদ আকাশের হাল্কা মেঘের অন্তরালে ডুবে গেছে। সারা রেঙ্গুনের বুকে নেমে এসেছে ম্লান বিষাদের কালো ছায়া। যাত্রার পূর্বে কর্ণেল লোকনাথনের নেতৃত্বাধীনে ওখানকার সৈনিকদের হাতে স্থানীয় ভারতীয়দের ধন, প্রাণ, মান রক্ষার ভার অর্পণ করলেন। তারপর 'জয় হিন্দ' বলে সকলকে যখন জানালেন বিদায় সম্ভাষণ, তখন এই আত্মার পরমাত্মীয়কে বিদায়

দিতে সকলের চোখই হল অশ্রুসিক্ত। সৈনিকদের অনেকেই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। চতুর্দিক হতে ঘনিয়ে এলো তারপর ঘোরতর ম্লান বিষাদের অন্ধকার। জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো। জাপানের আত্মসমর্পণের ফলে রেঙ্গুনের আজাদ-হিন্দ বাহিনীকেও করতে হল শত্রু ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ। সৈনিকদের অস্ত্রত্যাগের পর সামরিক আদালতে তাদের বিচারের জন্য নিয়ে আসা হল দিল্লীতে। বিজয়ীর বেশে দিল্লী আসা আর তাদের পক্ষে সম্ভব হল না। যদি তা সম্ভব হত, তাহলে ভারতের প্রায় সর্বত্র তখনও শিখা বিস্তার করে অপেক্ষায় ছিল আগষ্ট বিপ্লবের আগুন। বম্বের উপকূলবর্তী সামরিক জাহাজগুলিতে নাবিকদের চাপা অসন্তোষ যে কোনও সময় ফেটে পড়ার অপেক্ষায়। এমত পরিস্থিতিতে যদি তারা ঘুণাক্ষরেও টের পেতো—ভারতের মাটিতে পদার্পণকারীরা আজাদ-হিন্দ বাহিনী, তাহলে তারাই এগিয়ে এসে এদের দিল্লীর লাল কেল্লায় পৌঁছে দিত। ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক ও মেসিন গানের সাধ্য হত না তখন তাদের পথ রোধ করার। সৃষ্টি হতে পারতো না সাম্প্রদায়িকতার খড়্গে দেশ খণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যায়। সে শক্তির কাছে ভেদ-বিবাদ সত্রাসে মাথা নত করত। দাঙ্গায় বিধ্বস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের ধন-মান-প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে তাহলে তৃণখণ্ডের মত ভেসে যেতেন না জাতির পিতা স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী।

এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর, ক্যাপটেন ধীলনের লাল কেল্লায় বিচারের সময়। প্রবল জলোচ্ছাসের মত জনসমুদ্রের হয়েছিল তখন এক বিরাট আলোড়ন। দেখে স্তম্ভিত হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার।

বিজয়ীর বেশে তারা আসেনি। এসেছে তারা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপরাধে অপরাধী হয়ে। তাদের মুক্তির দাবিতে ২৬শে নভেম্বর ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে আসে বিরাট এক ছাত্র মিছিল। মিছিল পুলিসের বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলে। জনতা নিরস্ত্র। তবু তাদের উপর গুলী চালিয়ে পুলিস তখন হত্যা করে রামেশ্বর ব্যানার্জী সহ আরও দুজন ছাত্রকে। প্রতিবাদে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে তখন রুখে দাঁড়ায়। এর উত্তরে গুলি চালিয়ে আবার ক'জনকে হত্যা করা হয়। শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন শ্যামাপ্রসাদ, কিরণ শংকর রায়, রাধাবিনোদ পাল ও বাংলার গভর্ণর কেশী স্বয়ং। এসে দেখেন,

রাজপথ জনতার রক্তে ভেসে গেছে। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে মিঃ কেশী পুলিস বাহিনীকে ঐ স্থান ত্যাগ করতে বলেন। নেতাদের অনুরোধে তারপর ছাত্রেরা যে যার ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু পরদিন আবার দল বেঁধে তারা পথে বেরিয়ে পড়ে। সেদিনও তাদের উপর গুলি। ভারতের জনগণ এসময় আজাদ-হিন্দ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কাহিনী আর নেতাজীর অবদানের কথা জানতে পেরে, স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। সারা ভারতে তখন এরূপ উত্তেজনা লক্ষ্য করে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হল শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ সৈন্যদের বিচারের প্রহসন বন্ধ করতে।

এদিকে ব্যাঙ্ককে পৌঁছেই নেতাজী সংবাদ পেলেন জার্মাণীর পরাজয় ঘটেছে—তারা আত্মসমর্পণ করেছে। সেখান থেকে সিঙ্গাপুরেও গিয়ে দেখলেন জাপানী সেনারা দলে দলে সিঙ্গাপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। জাপ শক্তির মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য ওদিকে আমেরিকা জাপানের নাগাসিকো ও হিরোসিমায় আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে আন্তর্জাতিক সামরিক আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে এক ঘৃণ্যতম বর্বরোচিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

জাপান আত্মসমর্পণে বাধ্য হলেও, নেতাজী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণে রাজী হলেন না। অ্যাংলো আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে তিনি অটল। ঘটনার এইরূপ পরিস্থিতিতে আজাদহিন্দ সরকার ও তার সেনাবাহিনীর দৃঢ় অভিমত, প্রাণ থাকতেও তারা নেতাজীকে শত্রুর হাতে যেতে দেবেন না। তারপর জাপানীদের একখানি বিমানে তিনি টোকিয়োর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট জাপ নিউজ এজেন্সীর একটি ঘোষণা—অত্যন্ত দুঃখের সংবাদ যে, সিঙ্গাপুর হতে টোকিও আসার পথে তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় আহত হয়ে, ১৯শে আগষ্ট স্থানীয় হাসপাতালে নেতাজী পরলোক গমন করেছেন। পরবর্তী কালে সরকারী বে-সরকারী বহু অনুসন্ধান সত্ত্বেও এত বড় একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। অন্ধকারের অতল গভীরে আজও রহস্য জালে এ কাহিনী জড়িয়ে আছে।

তাই আজও এই উপমহাদেশের অগণিত হিন্দু-মুসলমানের দৃঢ় বিশ্বাস—নেতাজী বেঁচে আছেন এবং যুদ্ধের শেষ পরিণতিতে আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। আবার আমাদের মাঝে তিনি ফিরে আসবেন।

আবার তখন জয়হিন্দ মন্ত্রের তূর্য্যনিনাদে ভরে উঠবে সারা ভারতের আকাশ বাতাস। আর তারই ফলে একটা ঝড়ের রুদ্রতাণ্ডব আকাশ ফেড়ে তখন উড়ে বেরিয়ে এসে, গুড়িয়ে দিয়ে যাবে যত রকম ভেদ বিবাদ প্রভৃত বাধা নিষেধের প্রাচীর গুলিকে। জাপান আত্মসমর্পণ করার পর—ব্রিটিশ আর আমেরিকার ইনটেলিজেন্স, তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করলো নেতাজীর। কিন্তু ব্যর্থ হল তাদের সব প্রচেষ্টা। জাপ রেডিও থেকে ১৯শে আগষ্টের বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ ২৩শে আগষ্ট ঘোষণার পেছনে যে রহস্য, আজও তা অন্ধকারেই ঢাকা পড়ে রইল। ব্রিটিশ আর আমেরিকান ইনটেলিজেন্স তারাও কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলনা বিমান দুর্ঘটনার ওই কাহিনীকে। জেনারেল অচিনলেক তাঁর ডাইরীর পাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখলেন এই মন্তব্যটি, "সুভাষচন্দ্রকে আমরা এবারেও ধরতে পারলাম না, আবার তিনি আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছেন"।

এদিকে জার্মাণী ও জাপানের পরাজয়ের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান। কিন্তুযুদ্ধে জয়ীহয়েও শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ সরকার অর্থ নৈতিক কারণে হয়ে উঠলো দেউলিয়া। ফাঁপা অন্তঃসার শূন্য বিপুলায়তন পুরাতন সাম্রাজ্যবাদের জরাজীর্ণ শিকলজাল আঘাতে আঘাতে হয়েছে ছিন্নভিন্ন। তাকে ধরে রাখার বিন্দুমাত্র সামর্থ্যও তার আর অবশিষ্ট ছিলনা। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় সেনা বাহিনীর মাঝে রাজানুগত্যের যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে, তা সম্যক উপলব্ধি করে আতঙ্কিত হয়ে অবশেষে তারা ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে বাধ্য হল।

এই সময়েই আবার সাম্রাজ্যের সামরিক বিভাগগুলিতে শুরু হয়ে গেল ব্যাপক ছাঁটাই। আপদকালে ভবিষ্যতের নানা প্রলোভন দেখিয়ে যাদেরই টেনে আনা হয়েছিল যুদ্ধের পর অপ্রয়োজনে তাদের ব্যাপক হারে ছাঁটাইয়ের বন্দোবস্ত। বুড়ো নেকড়ের গলায় আটকে যাওয়া অস্থিখণ্ড যারা টেনে বের করে দিয়েছিল, বিপদ মুক্তির পর চুক্তিমত তাদের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য করে, কথায় কথায় চোখ লাল করে শেষে কেবল হুমকি। তাদের অনেকেই এখন ঘাড়ের উপর বোঝার ভার। ব্যাপক হারে দেওয়া হল তাই ছাঁটাইয়ের নোটিশ। এ ছাড়া খাদ্যের তালিকায় পূর্ব থেকেই ছিল ঘোরতর তারতম্য। একই চাকরীতে একজন শ্বেতাঙ্গের বেতন একজন ভারতীয়ের বেতনের প্রায় দ্বিগুণ। বোম্বের

নৌঘাঁটির "তলোয়ার" জাহাজের শ্বেতাঙ্গ কম্যাণ্ডারের অভ্যাস ছিল নৌশিক্ষার্থীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দেওয়ার। নানা ধরনের এইরূপ কুৎসিত আচরণে বোম্বে উপকূলের নৌবাহিনীর বহুদিনের চাপা অসন্তোষ, শেষে অন্যায় ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আক্রোশে একদিন ফেটে পড়ে।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী "তলোয়ারের" এগারশত জাহাজকর্মী একসাথে করে ধর্ম্মঘট। ১৯শে ফেব্রুয়ারী তলোয়ারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নাসিক, কলাবতী, আউথ ও নীলা নামে আরও চারখানা জাহাজ। ধর্মঘটীদের সংখ্যা শেষপর্য্যন্ত দাঁড়ায় ১১শত থেকে ২০ হাজারে। জাহাজগুলির শীর্ষের ইউনিয়ন জ্যাক ফেলে দিয়ে, বিদ্রোহীরা উড়িয়ে দিয়েছে তখন তেরঙ্গা পতাকা। ক্যাটেল ব্যারাকের অভ্যন্তরে তারা ঘাঁটি গেড়ে, সেখানকার অস্ত্রাগার অধিকার করে নিয়েছে। বিদ্রোহীদের তখন কড়া প্রহরায় রাখার জন্য বিভিন্ন বন্দরের অনেকগুলি জাহাজ ছুটে এসে বিদ্রোহীদের অধিকৃত জাহাজগুলিকে চারিদিক থেকে ঘিরে রইল। আকাশে উড়ে, বোমারু বিমানগুলির পুনঃ পুনঃ অবস্থা পর্যবেক্ষণ, তারপর ব্রিটিশ নৌসেনাপতি হুকুম দিলেন—"বিনা শর্তে এখনই আত্মসমর্পণ কর"। উত্তরে বিদ্রোহীদের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হল "ইংরাজ ভারত ছাড়— কুইট ইণ্ডিয়া"। শেষ পর্য্যন্ত শুরু হল দুপক্ষের কামানের অগ্নিউদ্গীরণ। নৌবিভাগের সৈন্য ও অন্যান্য কর্ম্মচারী-দের সাথে এসে যোগ দিয়েছে স্থানীয় শ্রমিক ও ছাত্রদল। পথে পথে তাদের মিছিলের গতিরোধ করে তৎক্ষণাৎ এসে দাঁড়িয়েছে পুলিশবাহিনী। গতিবেগ রুদ্ধ না হওয়ায় শেষপর্যন্ত শুরু হোল বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। প্রত্যুত্তরে চল্লিশটি সামরিক ভ্যান বিপ্লবীদের আগুনে শেষপর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এরপর বিদ্রোহের আগুন ক্রমে যখন কলিকাতা, মাদ্রাজ ও করাচীতে ছড়িয়ে পড়ে, কর্তৃপক্ষ নিরুপায়বোধে তখন ভারতীয় নেতৃবৃন্দের শরণাপন্ন। সেই চরম বিপদের মুহূর্তে বল্লভভাই প্যাটেল ও পুরুষোত্তম দাসের হস্তক্ষেপে বিদ্রোহীরা শেষপর্য্যন্ত অধিকৃত জাহাজগুলি সহ ইংরেজ সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ইংরেজ সরকারও তখন তাদের দাবীগুলি মেনে নিতে সম্পূর্ণ সম্মত হয়।

এরপর ভারতকে স্বাধীনতা দিতে এ্যাটলি মন্ত্রীসভা যখন সম্পূর্ণ কৃতসংকল্প,

ঠিক তার পূর্ব থেকেই দেশের মধ্যে ব্যবধান রচনার জন্য মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগের ভাগ বাঁটোয়ারার দাবী শেষপর্য্যন্ত জয়হিন্দ মহামন্ত্রে গড়ে ওঠা ঐক্যের মূলে ফাটল ধরাতে সমর্থ হোল। কংগ্রেসনীতির চিরকালই তারা বিপরীত পন্থী। দেশের বুকে গড়ে ওঠা ঐক্যের মূলে কুঠার মেরে ইংরাজের পক্ষপুটের আশ্রয়ে থেকে মুসলিম প্রাধান্য গড়ে তুলে, ব্রিটিশের অবর্ত্তমানে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা তাদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি। আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভাষ্য নিম্নরূপ—যেহেতু হিন্দু কংগ্রেস ও বিপ্লবীরা চিরকাল ইংরাজের শত্রু আর মুসলিম লীগ বন্ধুভাবাপন্ন। ভারত পূর্বে ছিল মুসলিম সাম্রাজ্যাধীনে। মুসলমানদের হাত থেকেই ইংরাজ সাম্রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছে। সুতরাং তাদের হাতেই উহা ফিরিয়ে দিতে হবে। এই যুক্তিতে কায়েদে আজম জিন্না ও তার মুসলিম লীগ ভারতে সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন মদিরায় বিভোর। অকাট্য যুক্তি অগ্রাহ্য হওয়ায় শুরু হয় ক্রমবর্ধমান ভাগ বাঁটোয়ারার দাবী। অবশেষে সর্বশেষ দাবী, ভারতের বুকে পাকিস্থান নামে অপর একটি সাম্প্রদায়িক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। দাবী আদায়ের জন্য আজাদ পত্রিকার তখন ঘন ঘন রণহুঙ্কার। মুসলিম চেলা-চামুণ্ডাদের 'লড়কে লেঙ্গে" উন্মত্ত চীৎকারে শহর গ্রাম সন্ত্রস্ত। বাংলায় তখন মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভা।

এরপর ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট কলকাতার বুকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে তারা ঝাপিয়ে পড়ে। পর পর তিন দিন তাদের নৃশংস তাণ্ডব নৃত্যে কলকাতা শহর রক্তে ভেসে গেল। দ্বিতীয় দফায় তাদের জেহাদের স্থান নির্বাচিত হল নোয়াখালি। সেদিন ছিল ১০ই অক্টোবর। প্রায় বিশ সহস্র লোক একত্রিত হয়ে—গ্রামে গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে, সেই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে শত শত মানুষকে পুড়িয়ে মারে। লক্ষ লক্ষ আরোও মানুষের শির লক্ষ্য করে তখন অত্যাচারীর উত্থিত খড়্গ কৃপাণ। মেয়েদের উপর চলল অকথ্য পাশবিক অত্যাচার। "কে কোথায় আছো ছুটে এস, আমাদের বাঁচাও"—পরিত্রাহি আর্ত্তচীৎকারে ভারতের আকাশ বাতাস সহসা মুখরিত। মহাত্মা গান্ধী তখন দিল্লীতে। কানে শোনামাত্র তাঁর সবরকম কর্মসূচী বাতিল করে দিয়ে, ছুটে গেলেন নোয়াখালি।

বিপন্ন মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে ভারতের নানাস্থানের ও কলিকাতার স্বেচ্ছাসেবক দল. দলে দলে হোল গান্ধীজীর সহগামী। গান্ধীজী গিয়ে বিপন্ন গ্রামগুলিতে ঘুরে ঘুরে, নিয়মিত প্রার্থনা সভায় গীতা পাঠের সঙ্গে কোরানের সাম্য ও মৈত্রীর বাণীগুলি দিনের পর দিন শুনিয়ে মুসলমান ভাইদের মনের সত্যই একটা পরিবর্ত্তন ঘটাতে সমর্থ হলেন। মুসলমান মেয়েরাও প্রত্যহ তাঁর প্রার্থনা সভায় যোগ দিত। শান্তি অনেকটা ফিরে আসার পর, একত্রে মিলে মিশে সকলকে বাস করার উপদেশ দিয়ে, নোয়াখালি ছেড়ে আসার সময় অনেক মুসলমান ভাইবোনদেরও চক্ষু হোল অশ্রুসজল।

* * * * *

বাংলার ভাঙা দেউলে পূজারী আবার আসিও ফিরে।
বুক ভরে লয়ে বেদনার ভারে ভিজিয়া অশ্রুনীরে।
দুঃসহ ব্যথা বুকে লয়ে আজও অপমান জ্বালা সহি
দুর্বল সবে কাঁদিছে নীরবে তব পথপানে চাহি।
এস সত্যের তরে বুকের পাঁজরে জ্বালাইতে হোমানল।
শাপমুক্তির তরে সঁপিতে আহুতি হৃদয় পদ্মদল
এস বাজাতে প্রেমের মিলন বাঁশরী বিষাদ সিন্ধুতীরে।

শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশে, দিল্লীতে এ সময়ের পূর্বেই উপস্থিত ক্যাবিনেট মিশন। কংগ্রেস ও লীগ সহ সকল দলের ও রাজন্যবর্গের সাথে পৃথক পৃথক ভাবে সর্বপ্রথম চলে তাদের আলোচনা। কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের সর্ব্ববাদী সম্মত কোন পথেরই সন্ধান পাওয়া গেল না। বড় দল কংগ্রেস চায় অখণ্ড ভারত; মুসলিম লীগের দাবী স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র। এ সব উপেক্ষা করে স্বয়ংমিশনের সকলের সম্মুখে সর্বশেষে এক নূতন প্রস্তাব—ভারত অখণ্ড যুক্তরাষ্ট্রই থাকবে—কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ঠতার বলে প্রদেশ গুলি হিন্দু প্রধান ও মুসলমান প্রধান বলে গন্য হবে। পূর্ব সীমান্তের বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত হবে একটি স্বতন্ত্ররাজ্য। রাজ্যগুলির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা সংবিধান রচনার জন্য গঠন করবেন গণপরিষদ। গণপরিষদের রচিত সংবিধানের নির্দেশে গণভোটের মাধ্যমে রাজ্যগুলিতে ও কেন্দ্রে নির্বাচিত হবেন দুই সভার সভাসদ ও পরে মন্ত্রীমণ্ডলী।

রাজন্যবর্গ-শাসিত সব রাজ্যগুলি থাকবে যুক্ত রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে। কিন্তু স্বেচ্ছায় যে কোন রাজ্যেরই অধিকার থাকবে কেন্দ্রীয় শাসনের বাইরে বেরিয়ে আসার। যে পর্য্যন্ত সংবিধান রচিত না হয়, সাময়িক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সকলের সহযোগিতায় গঠিত হবে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রস্তাবগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে শেষ পর্যন্ত সকলেই মেনে নেওয়ার পর গণপরিষদ গঠিত হল। কংগ্রেস গণপরিষদে থেকেও, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে সম্মত হলনা। লীগের অন্তরে এতে খুশীর আমেজ। লর্ড ওয়াভেলকে সরকার গঠনের জন্য সর্বাগ্রে তাদের নিমন্ত্রণের জন্য তখন আবেদন নিবেদন। কিন্তু বড় দল কংগ্রেস যোগ না দিলে বড়লাটের সরকার গঠনে আপত্তি। শোনামাত্র মুসলিম লীগ ক্রোধে অগ্নিশর্মা। আর সংগে সংগে গণপরিষদ বর্জন করার হুমকি। এর পরেই ১৪ই আগষ্ট কলিকাতায় পূর্বোক্ত প্রথম প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। লাট্ সাহেবের বিশেষ অনুরোধে পণ্ডিত নেহেরু তখন সরকার গঠনে এগিয়ে আসেন। মুসলিম লীগ তারপর স্বেচ্ছায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণে সম্মত হন। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের সভাপতিত্বে ৯ই সেপ্টেম্বর (১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) সর্বপ্রথম বসে গণপরিষদের বৈঠক। কিন্তু এ বৈঠক মুসলিম লীগ বর্জন করে। কংগ্রেসের তখন দাবী,—যে দল গণপরিষদ বর্জন করে, মন্ত্রীত্বের গদীতে আসীন থাকার তার আর কোন অধিকার নেই। এর পূর্বে প্রায় প্রত্যেক সভাতেই পরস্পর দুপক্ষের হত প্রবল বাক্-যুদ্ধ। এ হেন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লণ্ডন থেকে ব্রিটিশ সরকারের তখন ঘোষণা, মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলিম বর্জিত গণপরিষদ কখনও কার্যকরী হবেনা। ক্ষমতা ত্যাগের পূর্বে উক্ত ঘোষণার মধ্যেই মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রদানের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি। এরপরেই মুসলিম মোল্লাতন্ত্রের নির্দেশে নোয়াখালির প্রজ্বলিত নরকাগ্নি, সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত হাওয়ায় ভর করে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে প্রায় দেশের সর্বত্র। কলিকাতার দাঙ্গার পর হিন্দুরাও তলে তলে দলে দলে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু পরে নোয়াখালির নৃশংসতায় প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে নিরীহ মুসলমানদের উপরও ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগুন জ্বলে ওঠে বিহারের ছাপড়া জেলায়, বোম্বাইতে, আমেদাবাদে। শেষ পর্য্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বত্র। কত শিশু ও নারী যে অকালে এই নরকাগ্নির শিকার হয়েছে, আর তাদের উদ্ধার করতে চেয়ে কত

যে সহৃদয় হিন্দু-মুসলমান এই নরকাগ্নিতে অকাতরে ঝাঁপদিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন—তার প্রকৃত তথ্য নিরূপণ কখনও সম্ভব হবেনা। তার হিসাব নিকাশ চিরকাল ডুবে থাকবে, অতীতের সেই নরকের অন্ধকারে। দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পটভূমিকার বিষাক্ত পরিবেশে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মিলিত সংগ্রামের ঐতিহ্য, দেশের মানুষের মন থেকে একেবারে যেন মুছে গেল। দেশের মানুষ ভুলে গেল, নেতাজীর জয় হিন্দ অগ্নিমন্ত্রে আজাদ বাহিনীর হিন্দুমুসলমানের দেশের মুক্তির জন্য শপথ গ্রহণের কথা ;—"আমরা দেশের মুক্তির জন্য দেহের শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দেবো। ওঠো জাগো, প্রস্তুত হও, এগিয়ে চলো।"

এসময় কংগ্রেস ও লীগের হাতে ক্ষমতা অর্পণের জন্য শাসনকর্তা হয়ে এলেন মাউণ্টব্যাটেন। তখন ক্রমাগত দুই সপ্তাহ ধরে জিন্নার সাথে মহাত্মাজী বৈঠকে মিলিত হলেন। প্রস্তাব রাখলেন, মিলিত হয়ে ইংরাজের হাত থেকে স্বাধীনতা গ্রহণ করার। যুক্তি দেখালেন,—ভারতের মুসলমান প্রায় সকলেই ধর্মান্তরিত। বর্তমান যুগের প্রত্যেকের তাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ। আমরা ধর্মান্তরিত হয়েছি, কেউবা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচার উৎপীড়নে, কেউবা ভূতপূর্ব নবাব বাদশাহের পাশে উচ্চাসনের প্রলোভনে। তাতে এ কথা প্রমাণিত হয়না যে সবাই একজাতি নয়। রক্তের সম্পর্কে চিরকাল আমরা ভাই ভাই। আপনাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ আছেন, আমি জানি, দুই এক পুরুষ আগেও তারা ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু। এমনকি আপনার পূর্বপুরুষও ছিলেন হিন্দু। তাহলে তারা একজাতি নয়, কোন যুক্তিতে প্রমাণ হল ? সর্বশেষে তাঁর বড় ছেলে হীরালালের দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন।—হীরালাল ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সেজন্য সে যে আমার পুত্র—এ কথা অস্বীকার করতে পারিনা।" চকচকে তলোয়ারের মত বাঁকা হাসিতে, প্রতিবারই কায়েদে আজমের সাফ জবাব,—"কংগ্রেসের হিন্দু রাজ্যে মুসলমান কখনও নিশ্চিন্তে বাস করতে পারেনা। তাই তারজন্য চাই পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান। সর্বশেষ বৈঠকের পর বিদায়ের ক্ষণে গান্ধীজীর স্বভাবসুলভ মধুর হাসির অন্তরালে লুকানো ছিল বিষাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ; হায় হায়! আত্মঘাতী এই প্রতিহিংসা, ইংরাজের হাতের কূটনীতির খড়্গে ভারতকে খণ্ডিত না করা পর্য্যন্ত শান্ত হবেনা।

জিন্না সাহেবের এই যে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত বিভাজন—শুধু মাত্র ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতি তত্ত্বের ব্যাখ্যায় "পাকিস্থান" নামক ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা—এর উদ্ভাবক ছিলেন রহমৎ আলি নামে একজন ছাত্র। লণ্ডনে থেকে সে পড়াশোনা করছিল। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তার উর্বর মস্তিষ্কে এই পরিকল্পনাটি দানা বেঁধে ওঠে।

লণ্ডনের ওয়ালডরফ হোটেলে তিনি এক খানাপিনা পার্টির আয়োজন করেন। সেখানে জিন্নাও হন আমন্ত্রিত অতিথি। রহমত আলি তাঁর পরিকল্পনাটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ভারতবর্ষের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করা দরকার। সে রাষ্ট্রটি হবে পঞ্জাব, কাশ্মীর আর সিন্ধুপ্রদেশকে নিয়ে। পাঞ্জাবের P, কাশ্মীরের K, সিন্ধুর S,—প্রদেশগুলির আদ্যক্ষর নিয়ে এর নাম হবে পাকিস্থান। রহমৎ আলির ওই পরিকল্পনা শুনে তিনি সেদিন হেসে উঠেছিলেন, বলেছিলেন—এ এক আজগুবি অবাস্তব স্বপ্ন। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কায়েদে আজম মহম্মদ আলি জিন্না ঐতিহাসিক এ সহজ সত্য ভাল করেই জানতেন যে, সমুদ্র মেখলা ও পর্বতমালা বেষ্টিত এই ভারতবর্ষে ধনরত্নের লোভে চিরকাল ধারায় ধারায় নানা দেশের নানা জাতির লোক এসে, নিজেদের পূর্বের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ফেলে, ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির প্রভাবে শেষ পর্যন্ত এক মহাজাতিতে পরিণত।

কিন্তু হায়! মানুষের দুর্দমনীয় ক্ষমতার লোভ বিজ্ঞান ও বিবেক সম্মত সত্যকেও নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করে। সেদিন জিন্না ছিলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের অন্যতম প্রবক্তা। আর ভারতীয় কংগ্রেসের ও তার রাজনীতির একজন নিষ্ঠাবান সমর্থক তাই লণ্ডনে অধ্যয়নরত ছাত্র রহমৎ আলির ওই পরিকল্পনাটির কথা শুনে তিনি ওটাকে অবাস্তব স্বপ্ন বলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম লীগের কায়েমী প্রভুত্বের মোহ তাকে পেয়ে বসলো। ঐক্যের প্রবক্তা জিন্না অতঃপর মুসলিম লীগএ যোগ দিলেন।

এদিকে ক্রমাগত দাঙার পর, সুরাবর্দ্দী সাহেব যখন আত্মঘাতী বাঙালীর এত রক্ত দেখে দুর্ভাবনা ও ভয়ে বিচলিত, তখন তার ও গান্ধীজীর সাহায্যে পুনরায় বঙ্গভঙ্গ রোধ করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন

নেতাজীর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়—এর কুফল যে ভবিষ্যতে আরও কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা বাংলাদেশের তখনকার ঐ একটিমাত্র প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তির দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়নি।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রমাণ দেখতে পাই পরবর্তীকালে—যেদিন আজাদ-হিন্দ ফৌজের রসিদ আলির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল ইংরাজ সরকার। তার প্রতিবাদে কলকাতার হিন্দু-মুসলিম জনতা গর্জে উঠে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে নেমে পড়েছিল। আজও মনে পড়ে রসিদ আলি দিবসের সেই স্মরণীয় ঐতিহাসিক দিনটির কথা। কিন্তু তার পরের ঘটনা, ইংরাজের কূটনীতি অতি ভয়াবহ ভ্রাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিম সংহতিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল, পাকিস্থানের প্রবক্তা মহম্মদ আলি জিন্নাকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে।

* * * *

"সাম্প্রদায়িকতা পাপ কপট শকুনি,
ঝড় তুলি ছুটে আসে পাখার ঝাপটে।
রক্তচক্ষু হতে তার ঝরে পড়ে গরল অনল!
সাঁই সাঁই কম্পিত নিশ্বাসে—
        সৃষ্টি ত্রাসে করে টলমল।
সংহারের তালে তালে
        এক সাথে দিয়ে করতালি,
নেচে ওঠে রক্তপায়ী পিশাচের দল।
হাসে খল খল ঘোর অট্টহাসি।

একাদশ

মহম্মদ আলি জিন্নার ওই পাকিস্তান দাবী অবশেষে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ী পথে আরও ভয়াল মূর্তি ধারণ করলো।

এদিকে ১৯৪৭ সাল ১৯৪৬ এর দাঙ্গাবিধ্বস্ত রক্ত-পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। মাউণ্টব্যাটেন সাহেবের দুপক্ষের নেতাদের ডেকে প্রায় প্রতি দিনই দিল্লীতে বৈঠক। অথচ দিনের পর দিন আত্মঘাতী দাঙ্গার ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক ভয়াল মূর্তি দেখে প্রতিটি জেলার হিন্দু মুসলমানেরা প্রতিটি মুহূর্তে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষের ধন, মান, প্রাণ রক্ষার জন্য তখন আর ভারত ভাগ ছাড়া কোনও গত্যন্তর থাকে না। যে পাঞ্জাবের বীরকেশরীরা ও বাংলার হাজার হাজার যুবক, কিশোর, নারী ও শিশু স্বাধীনতার সংগ্রামে পাহাড় জঙ্গলের পথে, হাটে, মাঠে, শহরে বন্দরে ও জেলখানার ফাঁসির মঞ্চে অকপটে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে, সেই পাঞ্জাব ও বাংলা খণ্ডিত হয়ে তার বৃহৎ অংশ সহ সিন্ধুপ্রদেশ ও বেলুচিস্থান নিয়ে গঠিত হল সাম্প্রদায়িক মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান। আর বাকী সব রাজ্যগুলি যুক্ত ভারতের অন্তর্ভুক্ত। ১৪ই আগষ্টের মধ্য রাত্রি বারটা বাজার সাথে সাথে দুপক্ষের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হল! অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে, যে বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে, ইংরাজের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকায় ক্রমে সোচ্চার হয়ে অগ্নিযুগের আবির্ভাব, সেই বঙ্গভঙ্গ ও ভাই-ভাই বিচ্ছেদের ভিতর দিয়েই স্বাধীনতার পদক্ষেপ। তা সত্বেও ভারতের প্রতিটি মানুষ সব দুঃখকষ্ট ও প্রতিহিংসা ভুলে, আনন্দের আতিশয্যে দিনটিকে বরণ করে নিল।

কিন্তু তারপর—পাঞ্জাব ও বাংলার খণ্ডিত দেহের রক্তধারা, লক্ষ লক্ষ নিরুপায় মানুষকে তার প্রবল স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল—খণ্ডিত দুই রাজ্যের এপার থেকে ওপারে আর ওপার থেকে এপারে। আর তাদেরই উদ্ধার করতে চেয়ে ৭৯ বছরের বৃদ্ধ গান্ধীজীর অবিশ্রাম দিল্লী ও বাংলায় ছোটাছুটি।

এল ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী। দিল্লীর প্রার্থনা সভায় সহসা ঐদিন নাথুরাম গড্‌সে নামক এক হিন্দু যুবকের অতর্কিত আক্রমণে বক্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে 'হা রাম'—শুধু এই দুটিকথা উচ্চারণ করে মাটিতে তিনি লুটিয়ে

পড়লেন। সাথে সাথে ভারতাত্মার বুকফাটা আর্তনাদে প্রকম্পিত হয়ে উঠল সারা বিশ্বের আকাশ বাতাস। আপোসের মাধ্যমে স্বাধীনতা আসায়, আত্মঘাতী সংগ্রামে ভারত খণ্ডিত হলো। নিহত হলেন জাতির পিতা। স্বাধীনতার আগে পরে হাজার হাজার মানুষের ধনমান ও প্রাণ রক্তের স্রোতে ভেসে গেল। ওপারের বিপন্ন মানুষের প্রত্যহের বিরামহীন সমাগমে ভরে উঠল এপারের শহর বন্দরের ষ্টেসন্, উদ্যান ও রাজপথগুলি। দেখা দিল লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষগুলির পুনর্বাসনের গুরুতর সংকট ও সমস্যা। যারা বিত্তবান, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, নিজেরাই তারা পরিত্রাণের পথ খুঁজে পেল। যারা দরিদ্র, সহায়হীন, অক্ষম—তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হোল তাদের জন্য নির্মিত আশ্রয় শিবির গুলিতে। দুঃখ ও বেদনার ভারে অবনত, খাঁচায় পোষা বন্য পশুপক্ষীর মত কর্মহীন অলস জীবন যাপন করতে, অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তারা বাধ্য হোল। সুপরিকল্পিত কর্মময় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ ইহজন্মে আর তারা অনেকেই ফিরে পেল না। বিনা দোষে হাজার হাজার অসহায় লোকের দণ্ড ভোগের এইরূপ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। সংগ্রামের পথে স্বাধীনতা এলে সৈনিকের রক্তক্ষয় হত কিন্তু এতবড় সর্বনাশ হত না।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর দেশের জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তখনকার নেতৃবৃন্দের মুখ হতে আবার পুনরায় শোনাগেল পূর্বের বহু বিঘোষিত প্রতিশ্রুতি,—ভারতের প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ প্রতিটি নাগরিক হবে পক্ষপাতশূন্য, সমান সুখসুবিধার অধিকারী। জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন, খাদ্য বাসস্থান, চিকিৎসা, ও প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হবেনা।

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী হতে কার্যকরী হোল। পূর্বের স্বাধীনতাদিবস ২৬শে জানুয়ারী এই সময় হতে প্রজাতন্ত্রদিবসরূপে প্রতি বৎসর উদ্‌যাপিত। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হোল দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সাধারণ মানুষের চিরদারিদ্র্যের অভিশাপ মোচনের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। রাজ্যগুলির স্থানে স্থানে গড়ে উঠল বড় বড় ইস্পাত, জাহাজ, রেলগাড়ী ও সার উৎপাদনের কারখানা। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের জল সংরক্ষণের জন্য দামোদর, ময়ূরাক্ষী,

ভবানী, ভাকরানাঙ্গাল প্রভৃতি নদীগুলির বড় বড় বাঁধ। আর এর সবগুলিকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠল নানাবিধ ছোট বড় শিল্প কারখানা ও শহর। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে পূর্বের বড় বড় শহরগুলি আরও বিশাল আয়তন নগরীতে পরিণত হোল। এতে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত জনসমাজের এক অংশের বেকার জীবনেরও অবসান ঘটল। আর এই সুযোগে দেশের ধনী সমাজ নানা উপায়ে তাদের ধন সম্পদ আরও শতগুণ বাড়িয়ে তোলার জন্য অতি লোভে মেতে উঠল।

কিন্তু এর পূর্বে, নয়ত এর সঙ্গে সঙ্গেই নেতৃবৃন্দের করণীয় ছিল পূর্বোক্ত প্রতিশ্রুতি পালনে এগিয়ে আসা। উচিত ছিল আদিম পুরাতন ভূমি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে, কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের মানুষের শতকরা আশী জন কৃষিজীবীকে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবার সহায়তা করা। কারণ তাদের অধিকাংশই হয় ভাগচাষী, নয়ত বা না খেতে পাওয়া অতি দরিদ্র অক্ষর জ্ঞানহীন দিনমজুর। আর সঙ্গে সঙ্গে তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষগুলির উৎপাদনের জন্য গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট কল-কারখানা গড়ে তোলা। তাহলে অতি লোভী ব্যবসায়ীদের মানুষমারা চোরাকারবার সারাদেশ আজ ছেয়ে ফেলতে পারত না। আজ যখন দেখি, শহরগুলিতে গড়ে ওঠা টাকার পাহাড়ের তলায় গ্রাম ছেড়ে চলে আসা লক্ষ লক্ষ ভিখারী ও বেকার মানুষের ভীড়,—মনে সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন জাগে—এরা কারা? এরা আর এক নতুন পর্যায়ের সর্বহারা ও ভিখারী। অন্নবস্ত্রের দাম দশগুণ বৃদ্ধির ফলে যার যা' ছিল সর্বস্ব বেচে খেয়ে, ভিখারী হয়ে শহরের রাজ প্রাসাদের পায়ের তলার এরা আজ নিঃস্ব সর্বরিক্ত অধিবাসী। এর উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক কুৎসিত ব্যবধান আরও বেড়ে চলেছে।

আজ প্রতিটি গ্রামের তোমরা যারা শিক্ষিত যুবসমাজ, তোমাদের পূর্বসুরী মুক্তিসংগ্রামীদের নিষ্কাম সেবা ও দেশের জন্য আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হও। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ গ্রামের যারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞ জনসাধারণ, হাজার হাজার বছর ধরে সমাজের তাচ্ছল্যের লাথি খেয়ে অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকারে আজও ডুবে আছে, তাদের পাশে এসে দাঁড়াও। সর্বাগ্রে অক্ষর জ্ঞানের সহিত তাদের পরিচয় ঘটাও। অশিক্ষার অন্ধকার দূর

হলে স্বাধীন নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে এরা সবাই তখন সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠবে। সচেতন হয়ে উঠবে, অধিকার ও ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবনের দায় দায়িত্ব সম্পর্কে। স্বার্থান্বেষী কোনও দুষ্টচক্রের দ্বারা আর তারা তখন প্রভাবিত হবেনা। ক্ষেত খামারে এবং সমবায়ের মাধ্যমে গড়ে ওঠা কুটির শিল্প প্রস্তুতের জন্য ছোট ছোট কারখানায় কাজ করে এদের বেঁচে থাকার পথ সুগম হলে, এদেরই দ্বারা পরে সাধিত হবে কৃষি বিপ্লব। এদেরই হাড় ভাঙা কঠোর পরিশ্রমের ফলে, লাঙ্গলের ফলা, হাতের কোদাল, ও হাতুরীর ভিতর থেকে নূতন করে বেরিয়ে আসবে স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধীজী ও নেতাজীর পরিকল্পিত ও ধ্যানের ভারতবর্ষ। ত্যাগ ও সাম্যের আদর্শ সম্মুখে রেখে, সকলের মুক্তির জন্য নিষ্কাম সেবা ও কর্মের পথ ধরে সম্মুখে এগিয়ে চলো। এই পথেই একদিন ঘুচবে মানুষের সাথে মানুষের ব্যবধান, ভরে উঠবে "সবার পরশে পবিত্র করা" মায়ের মঙ্গল ঘট।

* * * *

"প্রতিজ্ঞা কর, প্রতিবেশীজন কেহ রহিবে না দীন।
মানুষ যে হবে তারে রাখিব না অক্ষরজ্ঞান-হীন॥
একটি মানুষ একটি গ্রামেও রহিবে না উপবাসী।
আমি যাহা চাই তাহা যেন পায় প্রত্যেক দেশবাসী॥"

আজ স্বাধীন দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায়, অবনত মস্তকে প্রণাম জানাই মহাত্মা গান্ধীর মহান আত্মার উদ্দেশে, সমুদ্র মন্থনে উত্থিত গরল আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠ সেজে অবশেষে যিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। স্মরণ করি ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, বাঘা যতীন, সত্যেন বসু, গোপীনাথ সাহা, সূর্য সেনকে। স্মরণ করি মঙ্গল পাণ্ডে, উধম সিং, ভগৎ সিং, সুখদেও রাজগুরু, শিবরাম, যতীনদাস, রামপ্রসাদ, আশফাক উল্লা, রোশেন সিং, রাজেন লাহিড়ী, তারিণী মজুমদার ও নলিনী বাগচীকে। নাম না জানা সারা ভারতের শহীদদের উদ্দেশে জানাই আমার প্রণাম। প্রণাম জানাই দেশের মুক্তি পাগল মহানায়ক রাসবিহারী বসুকে স্মরণ করে, যাঁর বুদ্ধিমত্তা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতা জার্মানী থেকে সুভাষচন্দ্রকে ডেকে এনে, তাঁর সাহচর্য ও পরাক্রমে এশিয়ার সাম্রাজ্যবাদের বুনিয়াদকে বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হয়েছে। সর্বশেষে ভারতের জাতীয়

ঐক্যের প্রতীক 'জয় হিন্দ' মহামন্ত্রের স্রষ্টা মহানায়ক সুভাষচন্দ্রকে স্মরণ করে নিবেদন করি আমার প্রাণের ভক্তি অর্ঘ্য।

* * * *

হে পথিক, চুপি চুপি একি আয়োজন যাত্রার,
দেখনাকি চেয়ে, দিক্ দিগন্তে পুঞ্জিত মেঘভার ?
আকাশের বুকে বিদ্যুৎ—ভয়ে বাতাস শিহরে চমকি,
বজ্র তোমার সন্ধান লয়ে আঁধারে দাঁড়ায় থমকি।
ধেয়ে আসে কাল মত্ত মাতাল, ওঠে রোল হাহাকার।
হে পথিক, তবু চুপি চুপি, একি আয়োজন যাত্রার ?
কত রক্তের রেখা অঙ্কিত বুকে
রাগিণী হৃদয়ে সাধা,
কঠিন নিগড়ে নিপীড়িত প্রাণ
মানিল না ভয় বাধা।
ছিল নিজবাসে বন্দী নিবাসে
প্রহরী জেগেছে দ্বারে ;
শৃঙ্খল ভেঙ্গে বাহিরিল বীর
পথ রুধিল না তারে।

ফিরে পশ্চাতে নাহি চায়,
তার নয়নের তারা বিদ্যুৎ ঝরা
পথ আলোকিয়া যায়।
পথে বাধা আসে যত দুর্বার
সব ভেঙ্গে হয়ে যায় চুরমার
যত নদীনদ মরুপর্বত
সম্ভ্রমে সরে যায়।
কেটেছে বিপদ ঘোর—
লংঘি এসেছ পর্বত মালা
রাত্রি হয়েছে ভোর।

আবার কিসের ভয়,
হে পথিক, তব যাত্রার হলো জয়
—হলো মহাজয়।
পশ্চিমে ভেসে শেষে ডুবে রয় মিলায় রক্ত রেখা ;
পূর্ব গোলকে নূতন আলোকে আবার সে দেয় দেখা।

পথিক ডাকিয়া কয়,
মার কোল ছাড়া সন্তান তোরা আছো সবে কে কোথায় ?
ওরে, মহামিলনের মহাবোধনের লগন বহিয়া যায়।
বাজে কালের বিষাণ নাচিছে তুফান বাধা বন্ধন হারা।
তরী ভাসমান, আছো কে জোয়ান এখনো দিবেনা সাড়া ?
আজ সর্বভুকের নিবাইতে ক্ষুধা খাণ্ডবসম পুড়ে,
জাতির রক্ত ধোঁয়া হয়ে যায় আকাশের পথে উড়ে।
মেরুদেশে তার মড়কের রথ চালায়েছে অভিযান,
তোমার জাতির কংকাল দেখে কেঁপে ওঠে ভগবান।

তার সংগীতে শাপমুক্তির বাণী
দিকে দিকে ওঠে ধ্বনিয়া,
ইঙ্গিতে ওঠে বিদ্রোহ জেগে
বিপ্লব আসে ঘনিয়া।
তার ভ্রূভঙ্গে বেগে মহাকাল –
ছোটে আরো জোরে রণরণিয়া।

সৈনিক প্রাণ মাতায়ে তুলিল মুক্তির অভিযানে,
রক্তের ধারা নাচিয়া উঠিল হিন্দের জয়গানে।
যার যাহা ছিল, ধন মন প্রাণ,
পথিকেরে করে নিঃশেষে দান—
সবার উপরে তাহার আসন, ওঠে তার জয়গান।
—ছোটে তার রথ উড়ায়ে নিশান, ভারতের পানে চাহি,
পশ্চাতে চলে বিশাল বাহিনী মুক্তির গান গাহি।

ঐ দূরে যায় দেখা, তটভূমি রেখা—অনন্ত জলধির,
দুকূলে শোভিছে পর্ব্বত, মাঝে ঘন নীল বনানীর।
ঐ ভারতের মাটি—
ডাকে হোথা হতে অগণিত জনমন,
শহীদের ডাক রক্তের পথে জানায় আমন্ত্রণ।
ও পথে মিলিবে বিচ্ছেদ ব্যথা সন্তাপ অনশন,
দগ্ধ শরীরে বুক ফাটা তৃষা যন্ত্রণা আমরণ—
তবু ঢেলে দিতে হবে—বুকের রক্ত ;
সৈনিক, তুমি মৃত্যু করেছ পণ।
যারা ফাঁসির মঞ্চে গেল বলিদান মুক্তির গান গেয়ে,
যারা দিল প্রাণ সমরে আহুতি মুক্তির পথে ধেয়ে,
তাহাদের খুনে রঞ্জিত ধূলি দিল্লী তোরণে উড়ে—
দেখাইছে পথ উড়াতে নিশান দিল্লীর লাল গড়ে।
যুগ যুগ ধরি, ভারতলক্ষ্মী বন্দিনী ঐ গড়ে,
সন্তান তোরা, দেখে হীনবল নয়নে অশ্রু ঝরে।
তার বুকের চিতার শিখা লেলিহান—
পাগল করেছে মোরে—
সৈনিক, তুমি বুকের রক্তে নিবাতে তাহারে
ছুটে চল আরো জোরে।
আরো জোরে, আরো জোরে, আরো জোরে।
চালাও কদম পথ দুর্গম পর্ব্বত যাক টুটি,
ঐ, ব্যাঘ্রকে হেরি সম্মুখে—
ফেরু পশ্চাতে ফেরে ছুটি।
কত সৈনিক প্রাণ গেল বলিদান দুর্গম পথে বনে,
বদ্ধ গুহার তিমিরের তলে নিভৃতে নির্জ্জনে।
অনশনে রহি, তৃষ্ণায় দহি তবু যুঝি প্রাণপণে
শত্রুর ব্যূহ ভাঙ্গে তরঙ্গ মণিপুর প্রাঙ্গণে।
বাজায়ে বিষাণ উড়াল নিশান, কোহিমা ও মণিপুর।

তাহা সারা দুনিয়ায় ধ্বনিয়া উঠিল,—
শুধু রুদ্ধ ভারত কানে শুনিলনা সেই বিচিত্র সুর।
শেষে শত্রু বিমান উড়ি সেই পথে—
আগুন দিয়েছে ঢালি,
যুঝি ট্যাংকের সাথে
এক সাথে গেল অগণিত প্রাণ বলি।
গাহি নেতাজীর জয়,—
হিন্দের খুন ধমনীর বাঁধ টুটে—
ভারতের মাটি ঢেউয়ে ঢেউয়ে লুটি,
—দিল্লীর পথে ছোটে।
কর্দমে পরে ভরে গিরিপথ আকাশের জল নামি,
নেতাজীর চোখ দেখে ছলছল সঙ্গীত এল থামি।
শত্রু তাঁহার সন্ধানে ফেরে তিন দিক হতে ঘিরে—
পরিষদ তারে দিয়াছে বিদায় ভাসিয়া অশ্রুনীরে।
তবু ডেকে কয়, না—না—না,
পরাজয় কভু মানিবনা নতশিরে,
ভাই সব—আমি ভারতের পথে, মুক্তির পথে
আবার আসিব ফিরে।
তারপর, তার দুর্গম পথে কাল যবনিকা
নেমে এল ধীরে ধীরে !

নাহি কণ্টক আর, মুক্ত দুয়ার, সবাই হয়েছে পার।
মহাভারতের সে মহাপথিক কেন দেখা নাই তার ?
মোর বুকের বাঁশরী বড় বেদনায়, কেঁদে ওঠে বারে বারে
মোর জাতির বিধাতা রহিলে কোথায় মিলায়ে অন্ধকারে ॥

"জয় হিন্দ"

সমাপ্ত